পপুলিজম

ভারতে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান

সম্পাদক ঃ শিবাজীপ্রতিম বসু ও রজত রায়
বিশেষ ভূমিকা ঃ রণবীর সমাদ্দার

পপুলিজম

ভারতে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান

পপুলিজম

ভারতে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান

সম্পাদক ঃ শিবাজীপ্রতিম বসু ও রজত রায়
বিশেষ ভূমিকা ঃ রণবীর সমাদ্দার

ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ

Published by:
Mahanirban Calcutta Research Group
IA 48, Sector III,
Ground Floor,
Salt Lake City,
Kolkata – 700 097
West Bengal, India
Website: http://www.mcrg.ac.in

Printed by:
SAMPARK, P34 Kalindi Housing Scheme, Kolkata - 700089

Year of publication : December 2019

Organized by:
Calcutta Research Group

In collaboration with:
Rosa Luxemburg Stiftung

Gefördert durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung e. V. aus Mitteln des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland. Sponsored by the Rosa Luxemburg Foundation e. V with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany.

The Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) is a Germany based foundation working in South Asia and other parts of the world on the subjects of critical social analysis and civic education. It promotes a sovereign, socialist, secular, and democratic social order, and aims at present members of society and decision-makers with alternative approaches to such an order. Research organizations, groups working for self-emancipation, and social activists are supported in their initiatives to develop models that have the potential to deliver social and economic justice. The work of Rosa Luxemburg Stiftung, South Asia, can be accessed at www.rosalux.in.

সূচিপত্র

বিশেষ ভূমিকা - রণবীর সমাদ্দার ৭

মুখবন্ধ ১১

উদারনৈতিক রাজনীতির সঙ্কটের দর্পণে জনপ্রিয়তাবাদ :
ভারতের নীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে কিছু কথা - অমিত প্রকাশ ২৭

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র এবং পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় লোকবাদের প্রকৃতি ৪৬
- মইদুল ইসলাম

রাজনৈতিক পন্থা হিসেবে 'জনপ্রিয়তাবাদ' :
হিন্দি বলয়ে জাত এবং সামাজিক ন্যায়ের একটি নিরীক্ষা - মনীশ ঝা ৭২

সমসাময়িক ভারতে রাজনৈতিক দল এবং জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি:
আম আদমি পার্টি - সুমনা দাশগুপ্ত ৯৩

প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্রের আবহে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি
সমীক্ষায় ছত্তীশগঢ় - রজত রায় ১১৩

গোর্খা পরিচয় রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থী হস্তক্ষেপ - কপিল তামাং ১৩৭

মা, মাটি, মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তাবাদী
রাজনীতির অভ্যন্তরে - শিবাজীপ্রতিম বসু ১৫০

কন্যাশ্রী প্রকল্প: জনপ্রিয়তাবাদ ও সরকারকেন্দ্রিক নারীবাদ - রিয়া দে ১৭১

লেখক পরিচিতি ১৮৩

বিশেষ ভূমিকা

রণবীর সমাদ্দার

দেশের বর্তমান রাজনীতির গতিপ্রকৃতির দিকে তাকালে বোঝা যায়, দীর্ঘদিনের প্রচলিত উদারপন্থী চিন্তাধারা এখন রীতিমতো কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। যে রাজনীতি এখন ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছে, তা একদিকে নয়াউদারনৈতিক সংস্কারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, অন্যদিকে, সমাজ থেকে 'অবাঞ্ছিত' মানুষদের (যেমন অভিবাসী শ্রমিক) ছেঁকে বাদ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই 'অবাঞ্ছিত'দের, এবং সেই সঙ্গে উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক ('রোড ব্লক' কথাটা প্রধানমন্ত্রী ব্যবহার করেছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয়তাবাদী মুখ্যমন্ত্রীকে মাথায় রেখে) সরানোর দাবিতে এই রাজনীতি সোচ্চার। মনে রাখা দরকার, এই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির সামাজিক ভিত্তি অসংখ্য অসংগঠিত 'অবাঞ্ছিত' শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উৎপাদকের সমাহারে তৈরি। এদের সমাজের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেই ২০১৯ সালের নির্বাচনী প্রচারের মূল সুর বাঁধা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এরা শুধুই সমাজের শত্রু নয়, এরা অপরাধী, তাই এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা দরকার। সমাজের এক অংশের বিরুদ্ধে অন্য অংশের এই যুদ্ধঘোষণায় এদের 'গণশত্রু' হিসাবে চিহ্নিত করার সঙ্গেই একটা নৈতিকতার প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা হয় ক্ষমতাসীন রাজনীতির তরফে। ভাবনাটা এইরকম, যেন শয়তান এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছে, তাই দেশ এখনও পিছিয়ে রয়েছে। জনপ্রিয়তাবাদই এই শয়তান, কারণ তা সমাজে যাবতীয় 'অবাঞ্ছিত'দের আশ্রয় দেয়।

এই নতুন রাজনৈতিক আধিপত্যবাদ একইসঙ্গে নতুন নতুন আইনী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যক্তি এবং সমাজের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে আগ্রহী। সে জন্য মাওবাদীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ার সন্দেহে বেছে বেছে লোকজনকে গ্রেফতার করা, দেশের জনসমষ্টির উপর নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা এবং পুঁজির ঝুঁকি কমাতে অজানা মালিকানার কাছে সম্পত্তি হাতবদল ঠেকানোর মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ কীভাবে তার বিকাশের প্রতিটি স্তরে এক নৈতিক শৃঙ্খলা দাবি করে, তা পরিস্ফুট হয়। সেই সঙ্গে এটাও স্পষ্ট হয় যে ক্ষমতাসীন এই নয়া শক্তি অর্থনৈতিক সংস্কার চাপিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর, শ্রমআইন সংস্কার করে শ্রমিকদের কাজের নিরাপত্তা তুলে দিয়ে এক বিশাল মজুত শ্রমিকবাহিনী তৈরি করতে আগ্রহী। পাশাপাশি, পরিকাঠামো ও পণ্য পরিবহনের সম্প্রসারণের পথের সব রকম

বাধা ও জটিলতা দূর করে, পুঁজির যথেচ্ছ আগমন ও নির্গমনের পথ পরিষ্কার করে এক অভিন্ন বাজার তৈরিতে আগ্রহী। এই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে দেশের রাজনীতিকে অর্থনৈতিক ইস্যু থেকে মুক্ত করতে হবে। বাস্তবিক, বিগত কয় বছরের রাজনীতিতে, বিশেষ করে নির্বাচনের সময় দেখা গিয়েছে, মানুষ আর্থিক সমস্যার কথা ভুলে তাদের মনে দীর্ঘদিন লালিত আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার আশায় ভোট দিয়েছে। ভোট দিয়েছে সংখ্যালঘু ও অভিবাসী মানুষদের প্রতি দীর্ঘদিন লালিত ঘৃণায় ভর করে। পরিণতিতে, কোনও অভ্যুত্থান ছাড়াই, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমেই বর্তমান রাজনৈতিক শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিয়েছে।

এই আবহে সমাজের কাছে অভিবাসীরা কী ধরণের বিপদ হিসাবে হাজির হয়? আসলে সমাজের দৃষ্টিতে অভিবাসীরা বেআইনী অবস্থানের প্রতীক, তারা তাদের কায়িক শ্রমকে বেআইনী ও অনৈতিকভাবে ব্যবহার করে থাকে। কাজেই তাদের নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। প্রয়োজনে সমাজ থেকে বহিষ্কার করা দরকার। এক কথায়, সমাজের কাছে অভিবাসীরা অনভিপ্রেত। নয়াউদারনৈতিক অর্থনীতি এই অভিবাসী শ্রমিকদের শ্রমকে কাজে লাগাতে চায়, কিন্তু লাগাম নিজেদের হাতে রেখে। পুঁজির লাগামহীন সঞ্চয় চলবে, পুঁজির অবাধ যাতায়াত চলবে, কিন্তু অভিবাসী শ্রমিকদের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের আগেই নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে, তাদের নিয়ে আর মাথাব্যাথা নেই। কিন্তু অভিবাসী, কর্মহীন বেকার শ্রমিক, ছোট ছোট ব্যবসায়ী এবং ভবঘুরে কৃষকদের বিশাল বাহিনীই এখন পুঁজির শ্রীবৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর বিরুদ্ধে উদারবাদী ও বামপন্থীদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়েছে। একমাত্র জনপ্রিয়তাবাদী শক্তি লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছে। জনপ্রিয়তাবাদীরা যেহেতু জনকল্যাণ ও জনগণকে সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে তাদের রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, এবং নির্দিষ্ট মতাদর্শের শিকলে নিজেদের সংগঠনকে বেঁধে রাখার বদলে আলগা বন্ধনের মধ্য দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাই তারাই এই নতুন রাজশক্তির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারে। কিন্তু যেখানে তাদের গঠনপ্রক্রিয়ার মধ্যেই অন্তর্নিহিত দুর্বলতার সুযোগ নয়া আধিপত্যবাদীরা নির্মমভাবে কাজে লাগাতে পারে, সেখানে তারা কতদিন এই প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে পারবে ?

বর্তমানের এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে স্বৈরাচারী রাজশক্তি দেশ, রাষ্ট্র এবং জনগণকে একাকার করে দেখতে এবং দেখাতে চাইছে, তারা সমাজের জাতপাতের সমস্যা, ভাষাগত বিভেদজনিত সমস্যাকে অস্বীকার করে, এবং সমাজের নিচুতলার একাংশের কথাকেই সমাজের নিচুতলার সমষ্টিগত কণ্ঠস্বর হিসাবে তুলে ধরার সঙ্গেই দাবি করছে, 'জনগণ' তাদের সঙ্গে রয়েছে। আর জনপ্রিয়তাবাদীরাই সমাজের উন্নয়ন, প্রগতি ইত্যাদির শত্রু। এক কথায়, জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ককে উল্টে দিয়ে জনগণের বিপ্রতীপে বসানো হচ্ছে জনপ্রিয়তাবাদীদের। এ ভাবেই আমেরিকায় ট্রাম্প হয়ে

ওঠে জনগণের প্রতিনিধি, আর বার্নি স্যান্ডার্স শত্রু। আমাদের দেশেও মোদি হন জনগণের প্রতিনিধি, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন হল্লাবাজ জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিক। নয়া উদারনৈতিক রাজনীতির এই কৌশলী প্রচারের বিরুদ্ধে মমতার মতো জনপ্রিয়তাবাদী নেত্রীরা তেমন কোনও জুতসই পাল্টা কৌশল নিতে পারেননি।

আরও একটি সমস্যা, সমাজে 'অবাঞ্ছিত' মানুষদের যাবতীয় 'বেআইনী' কার্যকলাপকে যে ভাবে নৈতিকতার মানদন্ডে মাপা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে জনপ্রিয়তাবাদীরা প্রায়শই নিরুত্তর হয়ে পড়েন। দেখাই যাচ্ছে, এ ধরনের বেআইনী কার্যকলাপের (যেমন, টাকা তোলা, পুঁজি সংগ্রহ করা, বেআইনী অভিবাসীদের উপস্থিতি মেনে নেওয়া, এমনকি জল ও বিদ্যুতের নিখরচায় ব্যবহারকে মেনে নেওয়া ইত্যাদি) সপক্ষে জোরালো যুক্তি হাজির করার মতো বৌদ্ধিক, আইনী, আত্মিক ও সামাজিক রসদ তাদের হাতে নেই। ফলে, এই বেআইনী কাজ করতে গিয়ে মানুষ প্রায়ই আইনের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। অথচ, এই সমাজে বুর্জোয়ারা প্রতিনিয়ত অনেক বেআইনী কাজ করে চলে, তাদের পুঁজির বেশিরভাগটাই বেআইনীভাবে আহরিত। রাদিয়া টেপ (যাতে টাটাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের গোপন আঁতাতের কথা, আদানিদের কয়লাখনি লিজের প্রসঙ্গ রয়েছে), বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের হাজার হাজার কোটি টাকা লুঠের সুবাদে আম্বানিদের শিল্পসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, কর্নাটকের বেল্লারির খনি থেকে বেআইনীভাবে লৌহ আকরিক উত্তোলন থেকে শুরু করে শ্রমিকদের আইনী অধিকারের বাইরে রাখা, সবটাই পুঁজিবাদের আইনী ও বেআইনী কার্যকলাপের ইতিহাস। এ সবই জানা ইতিহাস। কিন্তু এ সব মনে রেখেও জনপ্রিয়তাবাদীদেরই তাদের 'বেআইনী' কার্যকলাপের জন্য পুঁজির বৃদ্ধির প্রধান প্রতিবন্ধক ও সমাজের শত্রু বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

Rafael Sanchez তাঁর *Dancing Jacobins: A Venezuelan Genealogy of Latin American Populism* বইয়ে সে দেশের জনপ্রিয়তাবাদী নেতাদের যাবতীয় উৎসবের প্রতি আকর্ষণ ও প্রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে যে কোনও ছুতোতেই নেতারা নাচের আসর বসান, কার্নিভাল করেন, মূর্তি স্থাপন করেন। এ সবই করেন জনগণের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে। পশ্চিমবঙ্গেও জনপ্রিয়তাবাদী নেত্রী উৎসবে মেতে উঠতে ভালোবাসেন। সে জন্য প্রচলিত উৎসবের সঙ্গে নতুন নতুন উৎসবের সূচনা করেন। এই ঘন ঘন উৎসবের ভাবনার পিছনে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় করার প্রয়াস রয়েছে। সমালোচকরা বলেন, এরা সরকারি অর্থ নষ্ট করছেন, তাই এরা 'সমাজের শত্রু'। সমস্যা হল, গণতন্ত্র ও অর্থনীতি সম্পর্কে জনপ্রিয়তাবাদীদের কিছু ছেলেমানুষী ধারণা থাকলেও তাঁরা এই 'সামাজিক যুদ্ধ'এর বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন নন। সমাজ ও রাজনীতির পরিসরে এই দীর্ঘ প্রলম্বিত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে ধরণের কৌশল প্রয়োজন, তা তাঁরা উদ্ভাবন করার কথা না ভেবে একবগ্গা হয়ে লড়াই করতে গিয়ে ক্রমশই কোনঠাসা হয়ে পড়ছেন। তাঁদের বিপদ বাড়ছে। তা সত্ত্বেও এ কথা বলতেই হবে যে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে এখনই শেষ কথা বলার সময় আসেনি।

মুখবন্ধ

বিশ্বজুড়েই এখন জনপ্রিয়তাবাদী (Populist) রাজনীতির দাপট। ধনী দরিদ্র দেশ নির্বিশেষেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি এতটাই মাথা তুলেছে যে খুব শীঘ্রই তা প্রচলিত উদারনৈতিক ও সাংবিধানিক রাজনীতিকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিতে চলেছে। ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়াও তার ব্যাতিক্রম নয়। তাই রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে জনপ্রিয়তাবাদকে খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। অথচ, ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ায় জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি নিয়ে তাত্ত্বিক চর্চার নজির কমই। বিশেষ করে বাংলায় তা একেবারেই বিরল। অথচ, জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির এই জোরালো উপস্থিতি এ নিয়ে বিস্তারিত চর্চার দাবি রাখে। এই শূণ্যতা পূরণ করতে ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ (সি আর জি)-র ভারতে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণালব্ধ আলোচনার ফসল এই বইটির গুরুত্ব রয়েছে। জনপ্রিয়তাবাদ নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার সবে সূত্রপাত। শেষকথা বলার অধিকারী কেউই নই। এ বিষয়ে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক চলতেই থাকবে, এবং সেটাই কাঙ্খিত। বর্তমান বই যদি সেই আলোচনাকে কিছুটা উসকে দিতে পারে, তা হলেই বইটি সার্থক।

জনপ্রিয়তবাদের সংজ্ঞা কী হওয়া উচিত, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে মতৈক্য তৈরি হয়নি ঠিকই, তবে এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা যে সব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা থেকে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করা যেতে পারে। মনে রাখা যেতে পারে যে জনপ্রিয়তাবাদ (Populism) কথাটি লাতিন Populus কথা থেকে এসেছে, যার মূল অর্থ সাধারণ মানুষ (common people)। রাশিয়ায় জারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটি ধারায় কৃষি সমস্যাকে ভিত্তি করে যে জনপ্রিয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার প্রতি কার্ল মার্ক্সেরও দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল। মার্ক্স ওই জনপ্রিয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা সোশ্যাল রেভলিউশনারি দলের নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে পত্রবিনিময় করতেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপে আর এক ধরণের 'জনপ্রিয়তাবাদী' আন্দোলনেরও অস্তিত্ব ছিল, যা বুর্জোয়া উদারনৈতিক চিন্তাধারাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে চাইত। তবে ১৮৯১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি রাজনৈতিক দলকে নিজেদের নামেই প্রথম 'পপুলিস্ট' কথাটি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

তারা বাণিজ্যের উপর সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিরুদ্ধে ও নিজেদের রুপোর টাকা তৈরির অধিকারের দাবিতে আন্দোলন করত। কিছুটা নৈরাজ্যবাদী ধাঁচে জনপ্রিয়তাবাদী আন্দোলনের ছোঁয়া পূর্ব ইউরোপের কিছু এলাকাতেও দেখা গিয়েছিল। অন্যদিকে, লাতিন আমেরিকায় সাইমন বলিভার থেকে শুরু করে হুয়ান পেরন পর্যন্ত নেতাদের আন্দোলনে জনপ্রিয়তাবাদেরই জয়জয়কার।

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই দেশে দেশে বিভিন্ন সময়ে এই জনপ্রিয়তাবাদী আন্দোলন মাথা তুললেও বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে তা নিয়ে সামান্যই চর্চা হয়েছে। রাজনীতির ইতিহাসের ওই চর্চায় 'জনগণ'কে কিছুটা আইনী অর্থে যারা 'নাগরিক' ও 'ভোটদানের অধিকারী-হিসাবেই দেখা হয়েছে। রাজনীতির ওই তাত্ত্বিক চর্চায় জনপ্রিয়তাবাদী চিন্তাধারা যে তেমন আমল পায়নি, তার কারণ বোধহয় এটাই যে জনপ্রিয়তাবাদী চিন্তাধারাকে কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা বা ধারণার মধ্যে ধরা কঠিন। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে জনপ্রিয়তাবাদ সম্পর্কে মানুষের ধারণাও ভিন্ন ভিন্ন আকার নিচ্ছে। জনপ্রিয়তাবাদী চিন্তার যে বৈশিষ্ট্যটি মোটামুটিভাবে সর্বজনগ্রাহ্য, তা হল সমাজের ক্ষমতাভোগী উচ্চকোটির মানুষদের বা এলিটশ্রেণীর উপর সাধারণ মানুষের সামগ্রিক ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিতে হবে। একইসঙ্গে জনপ্রিয়তাবাদী চিন্তায় রাষ্ট্র ও জনগণের মাঝখানে কোনও মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা স্বীকার্য নয়। বরং তার দাবি এটাই যে রাষ্ট্রের পরিচালকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সরাসরি যোগাযোগের সম্পর্ক গড়ে তোলার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এই তত্ত্বে বিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা থাকতে পারে না। যদিও নিজেদের পছন্দসই কিছু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে দেখা যায়, যেমন, কোনও দেশে সেনাবাহিনী বা কোনও একটি রাজনৈতিক দল। তাই এটি একটি সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকান্ড হিসাবেই স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে, রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে নয়।

জনপ্রিয়তাবাদী দৃষ্টিতে জনগন বা সাধারণ মানুষের পরিচয়কেন্দ্রিক ধারণাটি তাৎপর্যপর্ণ কারণ এই পরিচয় দেশ, ভাষা, জাতি, জাতিগোষ্ঠী বা ধর্ম ইত্যাদিকে ভিত্তি করে হতে পারে। এ ভাবে নমনীয়ভাবে 'জনগণ'এর ধারণা নির্মাণের প্রক্রিয়ায় জনগণ'য়ে অন্তর্ভুক্ত সমাজের বিভিন্ন অংশের নানা ধরণের মানুষকে একটি একীভূত পরিচয়চেতনার অংশীদার করে তোলা হয়। এর উদ্দেশ্য একটাই, সমাজের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশের মানুষকে কোনও একটি দাবির অভিমুখে জড়ো করে 'জনগণ'য়ে পরিণত করা। যেহেতু এই 'জনগণ'য়ের নির্মাণ প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট নমনীয়তা থাকে, তাই বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী, উভয় রাজনৈতিক আন্দোলনেই জনপ্রিয়তাবাদী 'জনগণ'য়ের উপস্থিতি দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ, জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি বাম বা ডান, যে কোনও বর্ণই ধারণ করতে পারে। একইসঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হয় যে বিশ্বায়ন ও নয়াউদারনৈতিক চিন্তাধারার আগ্রাসী উপস্থিতির প্রেক্ষিতে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিকে ক্রমশই বেশি বেশি করে এর ক্ষতিকারক দিকের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে প্রতিবাদে সামিল করার চেষ্টা করতে দেখা যাচ্ছে। জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিকে ব্যবহার করে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াকে সামলানোর চেষ্টা করলেও

দক্ষিণপন্থীদের কাজটা তত সহজ হচ্ছে না। ব্রিটেনে ব্রেক্সিটকে ঘিরে আন্দোলন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। তুলনায় লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে বামপন্থীরা বেশি বেশি করে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একুশ শতকের প্রথম দশকে Occupy Wall Street (ওয়াল স্ট্রিট দখল করো) আন্দোলনের সময়ই দেখা গেল 'আমরা ৯৯ শতাংশ', 'ওরা ১ শতাংশ'-- এ ভাবে জনগণও এলিটকে বিভাজিত করে দেখার প্রয়াস। এ ক্ষেত্রে সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, উভয় এলিট শ্রেণীকেই আক্রমণের লক্ষ্য করা হচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ও বার্নি স্যান্ডার্স পরস্পরের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করলেও দুজনের নির্বাচনী প্রচারের মধ্যেই একটা প্রতিষ্ঠানবিরোধী জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির লক্ষণ দেখা যায়। সেই বিরোধিতা তাঁদের নিজের নিজের দল রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাটদের আভ্যন্তরীণ প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে। মধ্য প্রাচ্যে মিশর ও টিউনিশিয়ার ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির প্রকাশ সেই সেই দেশের শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে ফেলে। কিন্তু পরবর্তী উত্তাল বছরগুলিতে দেখা গেল, জনপ্রিয়তাবাদী আন্দোলন সাফল্য পেলেও 'জনগণ' আর অটুট ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারছে না, বহুবিভক্ত হয়ে পড়ছে। একমাত্র লাতিন আমেরিকাতেই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি সবচেয়ে জনপ্রিয় ও স্থায়ী হতে পেরেছে। ১৯২৯ সালে আমেরিকায় শুরু হওয়া ভয়ঙ্কর মন্দা (Great Depression)-র সময় এই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান হয়ে তা পরবর্তী বেশ কয়েক দশক ধরে স্থায়ী হয়। ব্রাজিলে গেতুলিও ভার্গাস, আর্জেন্টিনায় হুয়ান পেরন, ইকুয়েডরে হোসেমারিয়া ভেলাসকো ইবারা এই 'জনগণ'-এর কথা বলেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তীকালের জনপ্রিয়তাবাদী আন্দোলনের ঊর্দ্ধে ওঠে মার্কিনী আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় ভর করে, ভেনেজুয়েলায় উগো চাভেজ, বলিভিয়ায় এভো মোরালেস, ইকুয়েডরে রাফায়েল কোরিয়া এবং নিকারাগুয়াতে ড্যানিয়েল ওর্তেগা প্রমুখের নেতৃত্বে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ঔপনিবেশিকতার অবসানের পর বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলিতে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। গোড়ায় অবশ্য সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির নেতারা পুরনো ঔপনিবেশিক শক্তির শাসনব্যবস্থা, বিশেষ করে পশ্চিমী প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের পথে পা ফেলা শুরু করেছিল। কিন্তু দু-এক দশক পার না হতেই সেই ব্যবস্থায় ফাটল ধরতে শুরু করে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, 'সরকার পরিচালনার সঙ্কট' দেখা দিতে শুরু করে। এই প্রেক্ষিতকে মাথায় রাখলে এটা বলা যেতে পারে যে প্রচলিত শাসনব্যবস্থায় যখন জনগণের সমস্যা সমাধান করা যায় না, তখন তা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার মধ্য দিয়েই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান ঘটে।

ভারত ও দক্ষিণ এশিয়া

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা যে নানা চরিত্রের জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির আত্মপ্রকাশ ঘটতে দেখি, তাদের চিন্তায় ও কাজে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক সমাজের

ধারণায় ভিন্নতা, সমাজের কোন অংশ জনগণের অংশ হবে, কোন অংশকে শত্রু বলে আক্রমণ শানানো হবে, তা নিয়েও ঐকমত্য চোখে পড়ে না।

ভারতে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরণের জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। ১৯৬০ এর দশকের কৃষককেন্দ্রিক জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি সব শ্রেণীপার্থক্য অস্বীকার করে নাগরিক সমাজ ও গ্রামীন সমাজের মধ্যে বিভাজন ঘটাতে চেষ্টা করে। ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালের দুই দুইটি যুদ্ধ জন্ম দেয় একাধিক যুদ্ধকেন্দ্রিক জনপ্রিয়তাবাদী স্লোগান, তার মধ্যে ১৯৬৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর 'জয় জওয়ান, জয় কিষান' খুবই জনপ্রিয় হয়। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ষাটের দশকের শেষভাগ থেকে শুরু করে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে কংগ্রেস এই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির স্পিরিট ধরে রাখে। 'গরিবি হঠাও' স্লোগান দিয়ে, ব্যাঙ্ক এবং কয়লাখনি জাতীয়করণ, এবং দেশীয় রাজাদের বংশধরদের জন্য বরাদ্দ রাজন্যভাতার বিলোপ করে কংগ্রেস বামপন্থীদেরও তাদের পাশে টানতে সমর্থ হয়। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরে ইন্দিরা গান্ধী দেশে গরিবদের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প করেন, যা বিশ দফা কর্মসূচি নামে পরিচিতি পায়। তাঁর এই সব বামঘেঁষা কর্মকান্ডের সঙ্গে ''ইন্দিরাই ভারত, ভারতই ইন্দিরা'' স্লোগান অচিরেই ইন্দিরাকে ভারতে 'সমাজতন্ত্রী মুখ' হিসাবে পরিচিতি দেয়। এই প্রথম ভারতের মাটিতে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান পিছনে সরকার এবং তার নীতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিয়ে হাজির হয়। জনপ্রিয়তাবাদের অন্তর্নিহিত স্বৈরতান্ত্রিক ঝোঁক পরে ''সব কা সাথ, সব কা বিকাশ'' স্লোগানের জন্ম দেবে, যেখানে সবার কথা বলা হলেও তাদের মধ্য থেকে সযত্নে মুসলমান, খ্রিষ্টান, দলিত প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন অংশকে দূরে ঠেলা হবে, এবং ভাষা, আঞ্চলিকতা ও জাতপাতভিত্তিক পরিচয়কে ছাপিয়ে একটি 'অখন্ড হিন্দু' পরিচয়কে তুলে ধরার চেষ্টা হবে।

উপমহাদেশের অন্যত্র, যেমন পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টোর কথাই ধরা যাক। পিপলস পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ভুট্টোর স্লোগান ছিল ''আমাদের ধর্ম ইসলাম, কিন্তু অর্থনীতি হবে সমাজতান্ত্রিক।'' অথচ তাঁর আমলে পাকিস্তানে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন নিয়মিত নির্যাতিত হয়, তেমনই তিনি ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করার ডাকও দেন। ''আবার দেশের অর্থনীতিকে সাধারণ মানুষের স্বার্থে দ্রুত চাঙ্গা করার অভীপ্সায় স্লোগান দেন ''রোটি কপড়া অউর মকান''। এই উপমহাদেশে বাংলাদেশেই (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) প্রথম রাষ্ট্র যেখানে কৃষক আন্দোলনের নেতা মৌলানা ভাসানী এবং দেশের প্রতিষ্ঠাতা মুজিবুর রহমানের মতো ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে। দুই নেতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কাজকর্মের ধারায় যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ভাসানীর রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে প্রধানত কৃষকদের সমস্যাকেন্দ্রিক আন্দোলনের মধ্যে, অন্যদিকে, মুজিব তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কাজের ধারায় জনপ্রিয়তাবাদী নেতা হলেও সেই অর্থে গণতন্ত্রী ছিলেন না।

ভারতে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি এসেছে নির্বাচন ও সংসদীয় রাজনীতি, জনকল্যাণকেন্দ্রিক রাজনীতি, বিশ্বায়নের বিরোধিতা; এ সবেরই সংমিশ্রণে, যা অবধারিতভাবে কর্পোরেট দুনিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে। আর এভাবেই তা নয়াউদারবাদী যুগে দেশের রাজনীতির মধ্যে এতদিন প্রচলিত বাম ও দক্ষিণপন্থী মেরুকরণকে অগ্রাহ্য করে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এই রাজনীতির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মুখ্যত গরিব মানুষকে 'জনগণ' হিসাবে গ্রহণ করে, যার চরিত্র স্থানিক, অর্থাৎ, রাজ্য বা অঞ্চলে সীমিত, গোটা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে উদগ্রীব নয়। এই ধরণের আন্দোলন সাধারণত একজন বলিষ্ঠ নেতার নেতৃত্বে, সংগঠিত দলের বদলে অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিক, খেটে খাওয়া ছোট ব্যবসায়ী, গরিব ও মধ্যচাষী, সমাজের অন্যান্য দুর্বল অংশের মানুষ প্রভৃতিকে অবিন্যস্তভাবেই একজায়গায় জড়ো করে মাথা তুলে থাকে। ছোট ছোট শহর ও বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল এই আন্দোলনের চারণভূমি। জনগণের উপর নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির যে ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ছে, তা ঠেকানোর আশ্বাসের ভিত্তিতেই তৈরি হয়ে যায় আন্দোলনের অভিমুখ।

তামিলনাড়ুর জয়ললিতা এই ব্যাক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাম্প্রতিক ক'দশকে (অধুনা প্রয়াতা) জয়ললিতার জনপ্রিয়তা তাকে তামিলনাড়ুতে 'আম্মা' (মা) নামে খ্যাত করে তোলে। কয়েক দফা মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি অন্তত ১৮টি জনপ্রিয় প্রকল্পের সূচনা করেন। তার মধ্যে রাজ্যে কন্যাভ্রূণ হত্যা আটকাতে 'দোলনাশিশু'প্রকল্প ছাড়াও ভর্তুকিযুক্ত সুলভ মূল্যের খাবার (আম্মা ক্যান্টিন, যেখানে এক টাকার বিনিময়ে পেটভরা খাবার মেলে), আম্মা ল্যাপটপ (স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য) ইত্যাদি ছিল। লক্ষ্যণীয়, তাঁর বেশিরভাগ প্রকল্পের অভিমুখই নারীকল্যাণে নিবেদিত। বিহারে সামাজিক ন্যায়কে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা রাজনীতি ওই রাজ্য এবং রাজ্যবাসীকে আলাদা পরিচয় দিলেও সেখানকার রাজনীতিতে জাতপাতকেন্দ্রিক চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি উপেক্ষা করা যায় না। তবে বিহারের এই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির শিকড় ছিল জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে পরিচালিত 'সম্পূর্ণ ক্রান্তি' আন্দোলনের মধ্যে।

ভারতেরই কোনও কোনও অঞ্চলে এবং উপমহাদেশের কোথাও কোথাও ভিন জায়গা (দেশ, রাজ্য বা এলাকা) থেকে আসা মানুষদের বিরুদ্ধে চরম অসহিষ্ণুতার আবেগকে ভিত্তি করে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি মাথা তুলতে দেখা যাচ্ছে, কোথাও বা তা মাথা তুলছে পৃথক হোমল্যান্ডের দাবিকে কেন্দ্র করে। আবার এই রাজনীতিই কিছুটা বৈপ্লবিক চরিত্র পেয়ে যায় যখন তা রাষ্ট্রের কাছে গরিবের ন্যায্য পাওনা আদায়ের দাবিতে বা স্বশাসনের দাবির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

তবে ভারতের বুকে সবচেয়ে বেশি করে জনপ্রিয়তাবাদী আন্দোলনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি মজুত পশ্চিমবঙ্গে। এখানকার প্রতিষ্ঠানবিরোধী আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস, কৃষি আন্দোলনের পুরনো ঐতিহ্য, বামপন্থীদের গণআন্দোলন, নির্বাচনের কালে হিংসার রেওয়াজ, গ্রামস্তরে ক্ষমতায় বসার জন্য প্রবল লড়াইয়ের ঐতিহ্য, শক্তিশালী

ব্যক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত রাজনৈতিক দল, বামপন্থীদের সামাজিক ও রাষ্ট্রবিপ্লবের স্লোগান, জনগণের কাছে বিপ্লবের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আগ্রহ, ছোট ও মাঝারি মাপের শহরের মহিলাদের মধ্যে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিতে আগ্রহ, সর্বোপরি বিপুল সংখ্যক অসংগঠিত শ্রমিকের জনতা—এ সবই জনপ্রিয়তাবাদকে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান রাজনীতির শক্তিশালী ধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এই প্রসঙ্গে মমতা ব্যানার্জির গত আট বছরের শাসনকালের দিকেও তাকানো যায়। 'দিদি' হিসাবে জনপ্রিয় মমতা পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনের পরে তাদের নির্বাচনে পরাজিত করে ক্ষমতায় আসেন। নিজের রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, ''আমরা মার্ক্সবাদী নই, ক্যাপিটালিস্টও নই। আমরা গরিব মানুষের পক্ষে। ''তিনি আরও বলেন, ''আমাদের নীতি খুবই স্পষ্ট, মানুষের জন্য যে নীতি কাজে লাগবে, পরিস্থিতি বুঝে যে নীতি কার্যকর হবে, সেটাই আমার সরকারের নীতি হবে।'' মমতা তাঁর রাজনীতিকে ''মা, মাটি ও মানুষদকে উৎসর্গ করতে আগ্রহী।''

এই আট বছরে মমতা একগুচ্ছ জনপ্রিয়তাবাদী ও জনকল্যাণকারী প্রকল্প শুরু করেছেন। তার মধ্যে 'কন্যাশ্রী' (মেয়েদের স্কুলছুট রুখতে উৎসাহভাতা) সবচেয়ে জনপ্রিয়। এ ছাড়া 'সবুজসাথী'(ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল বিতর'), দু'টাকা কিলো দরে রেশনে চাল, গরিব কৃষক, হস্তশিল্পী, মৎস্যজীবি, লোকশিল্পীদের সাহায্যের জন্য নানান প্রকল্প রয়েছে। সেই সঙ্গে 'মাটি উৎসব'এর মতো বিভিন্ন উৎসব পালন, রাজ্যজুড়ে পাড়ায় পাড়ায় ক্লাবকে নিয়মিত বার্ষিক অর্থসাহায্য, বারোয়ারি দুর্গোৎসব কমিটিকে এবং রাজ্যের সমস্ত ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে নিয়মিত অর্থসাহায্য করার মতো বহু উদ্যোগ নিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। প্রচুর প্রবাদ ও মহাপুরুষদের বাণী, কবিতার উদ্ধৃতি সম্বলিত মমতার নিজস্ব বক্তৃতার শৈলী নিয়ে এলিট ভদ্রলোক সমাজে ব্যঙ্গরসিকতা করা হলেও সমাজের নিচুতলার গরিব মানুষদের কাছে কিন্তু দিদির বক্তৃতা খুবই জনপ্রিয়। মমতার কথায় ও কাজে সমাজের সব শ্রেণী ও ধর্মের মানুষকে নিয়ে সমন্বয় ঘটিয়ে এক 'বাঙালিয়ানা' নির্মাণের সচেতন প্রয়াস দেখা যায়। মমতার মতে, এই বাঙালিত্বের সংজ্ঞা হওয়া উচিত—''যাঁরাই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা, তাঁরাই বাঙালি''। বাঙালির এই সমন্বয়ী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বাংলায় উনিশ শতকের রেনেশাঁর ঐতিহ্যের অনুসারী বলেই কেউ কেউ মনে করেন। একজন লেখকের অভিমত, ''একদিকে মমতা বাঙালিত্বের প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে নতুন করে গড়ছেন, অন্যদিকে, বাঙালির এই সমন্বয়ী চরিত্রের সাহায্যে ভারতীয় জনতা পার্টির হিন্দুত্বকেন্দ্রিক জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিকে রোখার চেষ্টা করছেন। মমতার হাত ধরে সাধারণ মানুষ এবার রাজনীতির আঙ্গিনায় প্রবেশ করেছে, সহজে তারা জায়গা ছেড়ে যাবে বলে মনে হয় না। ''

এখনকার নয়া উদারনৈতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শনের আবহের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ বা বিহারের মতো রাজ্যে কোন পথে ও কীভাবে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি মাথা তুলছে, তা ভালো করে খতিয়ে দেখার দাবি রাখে। দেখা দরকার এই রাজনীতির সম্ভাবনা

কী, সীমাবদ্ধতাই বা কতখানি। এই আন্দোলনের শ্রেণীভিত্তি, স্লোগান ও রণকৌশল কী হতে পারে? জানা দরকার, প্রচলিত বামপন্থার রাজনীতি সহ গোটা রাজনীতিকেই পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে কি না। বোঝা দরকার, শহরাঞ্চলের বস্তির বাসিন্দাদের, অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিশাল শ্রমিকবাহিনীদের নিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভোটকেন্দ্রিক রাজনীতিতে যে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে, তার প্রতি জনপ্রিয়তাবাদী আন্দোলনের মনোভাব কী হবে? রাজনৈতিক হিংসা, পরিবেশ এবং সাধারণ মানুষের জীবনে বিশ্বায়নের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেই বা তার দৃষ্টিভঙ্গী কী হবে? মনে রাখা দরকার, উত্তর-ঔপনিবেশিক গণতন্ত্রে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি কী ভূমিকা পালন করতে পারে, সে ব্যাপ্যারে সম্যক ধারণা ছাড়া এই রাজনীতির উদ্গাতারা, এমনকি বামপন্থী নেতারাও এগোতে পারবেন না বলেই মনে হয়।

জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির আবির্ভাব বামপন্থীদের সামনে একটি তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। কারণ, সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্যই জনপ্রিয়তাবাদী ও জনকল্যাণকর প্রকল্পগুলি করতে হচ্ছে, এবং সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার স্বার্থেই তা করা দরকার বলে দাবি তোলার পর বামপন্থাও চ্যালেঞ্জের মুখে। নয়া উদারনৈতিক চিন্তাধারায় সরকার বা রাষ্ট্র যেখানে জনপরিষেবা থেকে ক্রমশই হাত গুটিয়ে নিতে উদ্যত, এই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি তার উল্টো পথেই হাঁটছে। এই বামঘরানার জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির সামনে পড়ে প্রচলিত বাম রাজনীতি বা পশ্চিমী দুনিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রেসির ভবিষ্যৎ কী হবে?

জনপ্রিয়তাবাদের চরিত্র বুঝতে একগুচ্ছ প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে। যেমন,

১, বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির ইতিহাসে উত্তর-ঔপনিবেশিক দুনিয়ার জনপ্রিয়তাবাদী চিন্তার কোনও গুরুত্বপূর্ণ স্থান থাকবে? এ বিষয়ে কি দক্ষিণ এশিয়ার জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি থেকে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়? ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর জমানা, নাকি পাকিস্তানে ভুট্টোর জমানা, কোনটাকে দক্ষিণ এশিয়ায় জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির সূত্রপাত বলে চিহ্নিত করা যায়? এই রাজনীতির আবির্ভাবকে কি উদারপন্থার অবসানে নয়াউদারনৈতিক ধনতন্ত্রের উত্থানের সহবর্তী হিসাবে দেখতে হবে?

২. জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি কীভাবে শ্রেণী, জাতপাত, ভাষাগত, ধর্মীয় ও জাতিগত জনগোষ্ঠীর পরিচয়কে মুছে দিয়ে একটা অবয়বহীন 'জনগণ'কে নির্মাণ করতে পারে?

৩. জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি যে হেতু 'জনগণ'কে কেন্দ্র করেই ক্রিয়া করে, এবং জাতিরাষ্ট্র বা দেশের ধারণাতেও যে হেতু সাধারণ মানুষের একটা নির্দিষ্ট পরিচয়কে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়, তা হলে কি প্রায় সব ধরণের জাতীয়তাবাদের মধ্যেই

জনপ্রিয়তাবাদ নিহিত? তা যদি হয়, সে ক্ষেত্রে ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে জাতীয়তাবাদ ও জনপ্রিয়তাবাদের পারস্পরিক সম্পর্কটা কী ধরণের?

৪. প্রচলিত ধারার রাজনীতি কী ভাবে এই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির মোকাবিলা করছে? নাকি, তাদের পরাজয় অনিবার্য? পাশাপাশি, জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিই বা কী ভাবে সরকারি প্রশাসনের কাজের ধরনে পরিবর্তন আনছে?

৫. ভারতে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি কী? জনপ্রিয়তাবাদী নেতারা তাঁদের 'জনগণ'এর সঙ্গে কী ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করছেন? তাঁদের কোন স্লোগানগুলি 'জনগণ'এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হচ্ছে? প্রচলিত দলকেন্দ্রিক বা উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে জনপ্রিয়তাবাদী নেতৃত্বে পার্থক্য কোথায়?

৬. লিঙ্গবৈষম্য, বা তার প্রতিকারে নারীদের উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ, জনপ্রিয়তাবাদী প্রশাসনে বিষয়টি কী ভাবে কতখানি প্রতিফলিত হয়? কন্যাশ্রী, বা আম্মা প্রকল্পের সামাজিক গুরুত্ব কতটুকু?

৭. তৃণমূল কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, রাষ্ট্রীয় জনতা দল প্রভৃতির আবির্ভাবের প্রেক্ষিতে ভারতে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির সম্ভাবনা কতটুকু? এর প্রতিঘাতে দেশে প্রগতিপন্থী, গণতন্ত্রী ও সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি কোন পথে যাবে?

সঙ্কলিত প্রবন্ধগুচ্ছ

বর্তমান সংকলনে মোট আটটি প্রবন্ধ সন্নিহিত। আরও গবেষণাপত্র রাখা উচিত ছিল, কিন্তু গ্রন্থের আয়তন একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে রাখার তাগিদ ও অর্থের সঙ্কুলান, এই দুইয়ের কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি গবেষণাপত্রকে স্থান দেওয়া গেল না। তবু এই সীমিত সাধ্যের মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মাথা চাড়া দেওয়া জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাতের প্রয়াস হয়েছে। যেমন, দিল্লির আম আদমি পার্টির রাজনীতি, বিহার সহ হিন্দি বলয়ের সামাজিক ন্যায়কেন্দ্রিক রাজনীতি, ছত্তীশগড়ে আদিবাসী ও সমাজের দরিদ্রতম মানুষদের মন জয়ে উন্নয়নকেন্দ্রিক রাজনীতি এবং দার্জিলিং পাহাড়ে জাতিসত্ত্বাকেন্দ্রিক রাজনীতি। একই সঙ্গে স্থান করে নিয়েছে জনপ্রিয়তাবাদের তাত্ত্বিক দিকগুলি নিয়ে দুটি প্রবন্ধ। অন্যদিকে, সংগত কারণেই পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি নিয়ে তিন তিনটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বহু আলোচিত কন্যাশ্রী প্রকল্পের আলোকে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির মধ্যে নারীর অবস্থানকে দেখার চেষ্টা হয়েছে। পাশাপাশি, মমতার মা-মাটি-মানুষের স্লোগানের অন্তর্নিহিত রাজনীতির ইঙ্গিতময়তাকে বোঝার চেষ্টা রয়েছে ভিন্ন এক প্রবন্ধে। নির্বাচনী রাজনীতি ও সরকারের প্রশাসনিক উদ্যোগের মধ্য দিয়ে মমতার জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি যে ভাবে বিকশিত হয়েছে তা নিয়ে কাটা ছেঁড়া করার সঙ্গেই জনপ্রিয়তাবাদের তাত্ত্বিক দিকগুলি খুঁটিয়ে বিচার করার চেষ্টা হয়েছে আরও একটি প্রবন্ধে।

এটা লক্ষ্যণীয়, জনপ্রিয়তাবাদের কোনও একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকায় বেশিরভাগ প্রাবন্ধিকের লেখাতেই এর বিভিন্ন লক্ষণ দিয়ে একে বোঝার চেষ্টা লক্ষিত। সে জন্যই বার বার পশ্চিমী দুনিয়ার জনপ্রিয়তাবাদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জনপ্রিয়তাবাদের বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিতুলনা গুরুত্ব দিয়ে উঠে এসেছে। জনপ্রিয়তাবাদকে তার ভিন্ন ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়ে সামগ্রিকভাবে বোঝার প্রয়াস করা হয়েছে। অমিত প্রকাশ এবং মইদুল ইসলামের প্রবন্ধ দুটিতে জনপ্রিয়তাবাদের তাত্ত্বিক দিকটি নিয়ে আলোচনাতেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

অমিত প্রকাশ এর প্রবন্ধের শিরোনাম ''উদারনীতিবাদের সঙ্কট ও জনপ্রিয়তাবাদের আবির্ভাবঃ ভারতে রাজনীতির নীতি ও কর্মকান্ড''। তিনিও লক্ষ্য করেছেন যে জনপ্রিয়তাবাদের সংজ্ঞা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ঐকমত্য নেই, বরং বিতর্ক রয়েছে। কখনও সরকারি অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহারের মাধ্যমে জনমন জয়ের চেষ্টা, কখনও ভূমিপুত্রের দাবিকে অগ্রাধিকার দেওয়া, আবার কখনও বা নিজের দেশকে একমেবদ্বিতীয়ম করে দেখানোর উদ্দেশ্যে দেওয়া রাজনৈতিক স্লোগানকে জনপ্রিয়তাবাদী বলে অভিহিত করা হচ্ছে। এমনকি ওয়াল স্ট্রিট দখল করো রাজনীতিও এই অভিধা পাচ্ছে। ভারতের ক্ষেত্রে দিল্লির বুকে আম আদমি পার্টির আবির্ভাব, এমনকি ভারতীয় জনতা পার্টির ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের নির্বাচনী জয়ের মধ্যেও জনপ্রিয়তাবাদের উপস্থিতি চোখে পড়ছে অনেকের। অমিত প্রকাশ মনে করেন, বর্তমান বিশ্বে উদারনৈতিক চিন্তাধারাকে ক্রমশ কোনঠাসা হয়ে পড়তে দেখে এবং সেই সঙ্গে ক্ষুদ্র স্বার্থভিত্তিক রাজনীতিকে কেন্দ্র করে সঙ্কীর্ণ মনোভাবাপন্ন মানুষের জোট বাঁধার ক্রমবর্ধমান প্রবণতায় উদারপন্থীদের মধ্যে যে সংশয় ও উদ্বেগের সৃষ্টি হচ্ছে, তা থেকেই জনপ্রিয়তাবাদী চিন্তা সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা তৈরি হচ্ছে, যে কোনও আন্দোলন বা রাজনীতিকেই জনপ্রিয়তাবাদী বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এক কথায়, জনপ্রিয়তাবাদকে তিনি উদারনীতিবাদের সঙ্কটের মধ্য দিয়েই দেখার চেষ্টা করেছেন।

মনীশ ঝা-র প্রবন্ধের শিরোনাম ''রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে জনপ্রিয়তাবাদ ঃ হিন্দি বলয়ে জাতপাত ও সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্ন''। মনীশ তাঁর আলোচনা প্রধানত উত্তর প্রদেশ ও বিহারের মধ্যেই সীমিত রেখেছেন। হিন্দি বলয়ে জাতপাতকে কেন্দ্র করে সামাজিক ন্যায়ের রাজনীতি কীভাবে ক্রিয়া করে, কী ভাবেই বা তার মধ্যে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি হস্তক্ষেপ করে রাজনীতির দিক পরিবর্তন করে সেটা বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কথায়, মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট সরকার গ্রহণ করার অনেক আগেই হিন্দি বলয়ের সোশ্যালিষ্ট নেতারা কংগ্রেসের আধিপত্য খর্ব করার জন্য ও বি সি এবং দলিতদের জোটবদ্ধ করার কথা ভাবতে শুরু করেন। পরে মন্ডল কমিশনের রায় কার্যকর হলে এই জোট হিন্দি বলয়ে কংগ্রেসের সামাজিক ভিত্তি দুর্বল করতেও সমর্থ হয়। বি জে পি, বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদির দক্ষিণপন্থী রাজনীতি জাতপাতের এই খেলায় নেমে দুটি কৌশল নেয়। প্রথমত, তারা প্রকাশ্যে নীতিগতভাবে জাতপাতের রাজনীতির বিরোধিতা করে বর্ণহিন্দুদের সমর্থন

তাদের দিকে অনেকটাই টেনে আনতে পারে। অন্যদিকে ও বি সি এবং দলিতদের মধ্যে ছোট ছোট গোষ্ঠী, যারা এতদিন ধরে উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি (এস পি) ও বহুজন সমাজ পার্টি (বি এস পি) এবং বিহারে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আর জে ডি) ও কংগ্রেসে যাদব, কুর্মি প্রভৃতি বড় তফশিলী গোষ্ঠী এবং দলিতদের আধিপত্যে হতাশ হয়ে পড়েছিল, সেই সব মৌর্য্য, খটিক, ধোবি, রাজভর, পাসি প্রভৃতি ছোট ছোট জনগোষ্ঠীকে বি জে পি জোটবদ্ধ করে এদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি, সব কা সাথ, সব কা বিকাশ এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলে জাতপাতের রাজনীতিকেও পিছনে ঠেলে দেয়। এই সব করার সময় মোদি যে ভাবে নিজের সাধারণ সামাজিক পরিচয়কে (নিজেকে চা-ওয়ালা বলে দাবি করে) কংগ্রেসের নেহরু-গান্ধীপরিবারের এলিট পরিচয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন, ভোটের মুখে উচ্চবর্ণের আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসরদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ করেন, সবই সামাজিক ন্যায়ের দোহাই দিয়ে আদতে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিরই প্রকাশ বলে মনীশ মনে করেন। অতীতে বিহারে সামাজিক ন্যায়ের আন্দোলনে (কর্পূরি ঠাকুর-লালুপ্রসাদ যাদব) দেখা গিয়েছিল, রাজনীতিতে নেতাদের সাধারণ সামাজিক পরিচয়, ইংরেজি জানা শ্রেণীর নেতাদের প্রতি প্রকাশ্যে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন, প্রচলিত স্থিতাবস্থার প্রতি বিতৃষ্ণা, এবং নেতাদের পুরুষালি দাপটের লক্ষণ। মোদির মধ্যেও এ সবই দেখা গিয়েছে। সব মিলিয়ে মনীশ দাবি করেন, জনপ্রিয়তাবাদ গণতন্ত্রের সঙ্গেই সহাবস্থান করতে পারে, প্রচলিত সংসদীয় গণতন্ত্র মানুষের আশা আকাঙ্খা পূর্ণ করতে না পারলে সেই ক্ষোভ হতাশাকে কাজে লাগিয়ে জনপ্রিয়তাবাদ মাথা তোলে। জনপ্রিয়তাবাদী নেতারা (স্বৈরাচারীদের বাদ দিলে) গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমেই নিজেদের বৈধতা আদায় করে নেন।

এক দশকেরও কম সময়ের আগে দিল্লিতে আন্না হাজারের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন এবং তার পরেই আম আদমি পার্টির সফল আবির্ভাব সবাইকে বিস্মিত করেছিল। নির্বাচনে বিপুলভাবে জেতার পরে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বে আম আদমি পার্টির সরকার দিল্লিতে একগুচ্ছ জনমোহিনী প্রকল্প নেয়। তাদের রাজনীতির চরিত্র নিয়ে জনপরিসরে আলোচনা-বিতর্ক অব্যাহত। সুমনা দাশগুপ্ত তাঁর সমসাময়িক ভারতে রাজনৈতিক দল এবং জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি ঃ আম আদমি পার্টি প্রবন্ধে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে আম আদমি পার্টির জন্মই হয়েছিল একটি জনপ্রিয়তাবাদী আন্দোলনের (আন্না হাজারের দুর্নীতিবিরেধী আন্দোলন) মধ্য দিয়ে, যা সুমনার মতে, জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির একটি টেক্সটবুক উদাহরণ। আর্নেস্টো লাকলাউ এর On Populist Reason বইয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাঁর দাবি, বিশেষ কোনও ঐতিহাসিক মুহূর্তে শ্রেণী চেতনার ব্যাতিরেকেই একাধিক বৈরিতামূলক সম্পর্কের উদ্ভব হতে পারে। তার জেরে সাধারণ মানুষ অনেক সময় পুরনো পরিচয় ছেড়ে নতুন পরিচয়কে আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হতে পারে, যা তাদের রাজনীতিতে সক্রিয় করে তোলে। এটা একটা সুনির্দিষ্ট জনপ্রিয়তাবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর জন্ম দেয়, যা বৈপ্লবিক আন্দোলনের থেকে আলাদা।

আম আদমি পার্টির ক্ষেত্রে এই নতুন পরিচয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নাগরিক হিসাবে আর তারা দুর্নীতিগ্রস্ত এলিট শ্রেণীর অধীনে উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় থাকতে রাজি নয়। অর্থাৎ, এখানে দুর্নীতি সবার শত্রু হিসাবে চিহ্নিত, আর এই 'দুর্নীতি-শত্রু'র প্রতিভূ ক্ষমতাসীন এলিট শ্রেণী। আম আদমি পার্টির এই সাধারণ মানুষ বা 'জনগণ'কে বা কারা? একদিকে এই 'জনগণ' সমাজের একেবারে নিচুতলার মানুষজন, অন্যদিকে, ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে গোটা জনসাধার'। এই কারণেই আম আদমি পার্টি-শ্রেণীর উর্ধে উঠে, বাম-দক্ষিণ, সবার সমর্থন পেতে গিয়েছিল।

আম আদমি সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলের অধিকার, নারীকল্যাণ, বস্তি উন্নয়ন, সাফাইকর্মীদের সম্মান, প্রভৃতি একগুচ্ছ প্রকল্পের বিশ্লেষণ করে সুমনা দেখিয়েছেন, এই রাজনীতির মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব নিহিত, যে দ্বন্দ্ব বাস্তবোচিত রাজনীতি ও রাজনীতিকে তার বন্ধ্যাদশা থেকে মুক্তির পথে আনার টানাপোড়েন থেকে উদ্ভূত।

গত চার দশকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নানা ধরণের আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলন মাথা তুলতে দেখা গিয়েছে। ভাষাকেন্দ্রিক, অঞ্চলকেন্দ্রিক এবং জাতিসত্ত্বাকেন্দ্রিক এই সব আন্দোলনের ফলে কোথাও কোথাও আগের রাজ্য ভেঙ্গে নতুন রাজ্য তৈরি হয়েছে, যেমন, ছত্তীশগড়, তেলেঙ্গানা, ঝাড়খন্ড বা উত্তরাখন্ড। আবার আলাদা রাজ্যের দাবিতে গোর্খাল্যান্ডের মতো কিছু আন্দোলন এখনও অমীমাংসিতই রয়ে গিয়েছে। কপিল তামাং তাঁর প্রবন্ধে এই ''গোর্খা পরিচয়কেন্দ্রিক আন্দোলন এবং তার উপর দক্ষিণপন্থী হস্তক্ষেপের প্রভাব'' নিয়ে আলোচনা করেছেন। গোর্খা পরিচয়কেন্দ্রিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত পর্যালোচনা করে কপিল দেখানোর চেষ্টা করেছেন, ব্রিটিশ আমল থেকেই এই আন্দোলনের বীজ বপনের সূত্রপাত হয়। একশ বছরেরও আগে ১৯০৭ সালে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা চেয়ে হিলমেন'স অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করে তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসকদের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়। সেই দাবি এসেছিল প্রধানত পাহাড়ের উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে থেকে। তাদের মধ্যে পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে কর্মরতরা, ধনী ব্যবসায়ী, প্রমুখের সঙ্গে ভুটিয়া জনগোষ্ঠীর লোকেরাও ছিল। স্বাধীনতার আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯৪৩ এর মন্বন্তরে বাংলার সঙ্গেই দার্জিলিং পাহাড়ের মানুষও বিধ্বস্ত হয়েছিল। ওই সময় কংগ্রেস এবং সদ্যগঠিত গোর্খা লিগকে পাশে না পেলেও রতনলাল ব্রাহ্মণের মতো কমিউনিষ্ট নেতাকে পাহাড়ের মানুষ পাশে পায়। ১৯৪৭ সালে রতনলাল ব্রাহ্মণ কমিউনিষ্ট পার্টির তরফে দার্জিলিং পাহাড়ের নেপালিভাষীদের জন্য 'পৃথক গোর্খাস্থান' এর দাবি সংবিধান সভা পেশ করেন। ওই 'পৃথক গোর্খাস্থান' কোনও আলাদা রাজ্যের দাবি ছিল না, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে চাওয়া হয়েছিল।

১৯৮০-র দশকে সুবাস ঘিসিংয়ের নেতৃত্বে জি এন এল এফ এর যে হিংসাত্মক আন্দোলন দানা বাঁধে, তা থেকে ২০০৭ সালে শুরু হওয়া গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার বর্তমান আন্দোলন পর্যালোচনা করে কপিল বলেন, বার বার এই আন্দোলন রাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা করে

চলেছে। কিন্তু পাহাড়ের মানুষের জনপ্রিয় দাবি অমীমাংসিত থেকে যাওয়ায় তার সুযোগে ভারতীয় জনতা পার্টি (বি জে পি) পাহাড়ের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের সুযোগ পেয়ে যায়। আগে বি জে পি পাহাড়বাসীদের দাবি সমর্থনের কথা বলে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র থেকে নিজেদের প্রার্থীকে জিতিয়ে আনলেও স্থানীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী ছিল না। এবার হল। ধীরে ধীরে পাহাড়ের আন্দোলন গোর্খা পরিচয়কেন্দ্রিক রাজনীতির উপর গেরুয়া প্রলেপ দিতে শুরু করল।

এই সংকলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারে জনপ্রিয়তাবাদী প্রবণতাকে বোঝার চেষ্টা। এই বিষয়ে মইদুল ইসলাম, শিবাজীপ্রতিম বসু ও রিয়া দে-র তিনটি প্রবন্ধ রয়েছে, তিনটিই ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের। অমিত প্রকাশের মতোই মইদুল ইসলামও জনপ্রিয়তাবাদের তাত্ত্বিক দিকটি নিয়েই চর্চা করেছেন। তবে অমিত প্রকাশ যেখানে জনপ্রিয়তাবাদের সাধারণ লক্ষণগুলি বিচার করে এই তত্ত্বের সাধারণ সূত্রগুলি বোঝার চেষ্টা করেছেন, মইদুলের জিজ্ঞাসা ভিন্ন। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ''নির্বাচনকেন্দ্রিক গণতন্ত্র ও পশ্চিমবঙ্গের সরকারকেন্দ্রিক জনপ্রিয়তাবাদ'' থেকেই স্পষ্ট, মইদুল তাঁর লেখায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকেন্দ্রিক জনমুখী কর্মকান্ডকে কাটা ছেঁড়া-করে দেখিয়েছেন একুশ শতকের প্রথম দশকে বামপন্থীদের জনসমর্থন হারানো এবং সেই সঙ্গে মমতার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পিছনে কী কী কারণ ছিল। এর পরে মইদুল তাঁর মূল প্রসঙ্গে এসে ল্যাকলাউ-র যুক্তির সাহায্য নিয়ে মমতার জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। মমতার সরকারে আসীন হওয়ার পরের সাত আট বছরকালে তাঁকে সারদা চিট ফান্ড কেলেঙ্কারি, নারদা টেপ, টেট পরীক্ষা কেলেঙ্কারি, ভাঙ্গরে পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সরকারি হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন প্রভৃতি কড়া চ্যালেঞ্জের সামনে পড়তে হয়েছে। তার মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য, দলীয় নেতা ও সাংসদ কোনও না কোনও কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েছেন। চিট ফান্ড বন্ধ হয়ে বহু গরিব মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছেন। কিন্তু মমতার ভাবমূর্তিতে চিড় ধরেনি। বরং, মমতার সাধারণ পরিবার থেকে আসা, সাধারণ জীবনযাপন, সবই সাধারণ মানুষের কাছে মমতাকে আস্থাভাজন করে তুলেছে। মমতাও সরকার থেকে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের জন্য নানা হিতকর প্রকল্প আনার সঙ্গেই মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি যে এ সবই তাঁর কীর্তি। এ ভাবেই মমতা তাঁর সরকার ও দলকে ছাপিয়ে একক নেত্রী হিসাবে জনগণের কাছে 'দিদি' হয়ে ওঠেন। দাবি করতে পারেন, রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনে তিনিই প্রার্থী ধরে নিয়ে মানুষ যেন ভোট দেয়। ল্যাকলাউ-র যুক্তি স্মরণ করে মইদুলের সিদ্ধান্ত,ল্যাকলাউ-র মতে দুভাবে, অর্থাৎ, সব না পাওয়ার ক্ষোভকে একসূত্রে গাঁথা (**logic of equivalence**) বা কোনও একটি মূল দাবিকে (logic of difference) ভিত্তি করে জনপ্রিয়তাবাদ ক্রিয়া করতে পারে। মইদুলের বক্তব্য, সরকারকেন্দ্রিক জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির ক্ষেত্রে এই দুইয়ের সঙ্গে আরও একটি মাত্রা যোগ করা দরকার, তা হল প্রশাসন কেন্দ্রিক উদ্যোগ।

পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় কর্মসূচি সম্ভবত 'কন্যাশ্রী'। রিয়া দে তাঁর ''কন্যাশ্রী প্রকল্প ঃ জনপ্রিয়তাবাদ ও নারীশক্তির প্রতি সরকারি দৃষ্টিভঙ্গী'' বিষয়ে প্রবন্ধে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার কীভাবে তার জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কাজটি করে, তা বোঝার চেষ্টা করেছেন। 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প যেহেতু ছয় বছরের বেশি সময় ধরে চলছে, তাই সমাজে তার কার্যকারিতা দেখার সুযোগও তৈরি হয়েছে। মমতার নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এই ছয় বছরের মধ্যে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পকে শুধু রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়েই দেয়নি, প্রকল্পের আওতায় আরও বেশি সংখ্যায় উপভোক্তাদের এনে আকারেও বিস্তার ঘটিয়েছে। যেহেতু 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পটি সরকারি শিক্ষা প্রশাসনের অঙ্গীভূত, এবং জনগণ মনে সাদৃত হওয়ার ফলে সমাজে তার প্রতিফলন ভালোভাবেই ঘটতে দেখা যায়। সরকারি উদ্যোগে এই প্রকল্পের প্রচার বেশি হওয়ায় তা বিশেষ করে শহরাঞ্চলে খুবই দৃশ্যমান। অন্যদিকে, সোশ্যাল মিডিয়া, সংবাদপত্র ও টিভিতে তার প্রচারও যথেষ্ট। সব মিলিয়ে এই প্রকল্প সরকারি প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরণের সেতুবন্ধনের কাজ করছে বলা যায়। রিয়া এটা মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি যে এই প্রকল্প যেহেতু মেয়েদের নিয়ে, তাই এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে নারীদের প্রতি সরকারি নীতির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলনও ধরা পড়ছে।

কেন 'কন্যাশ্রী'একটি আদর্শ জনপ্রিয়তাবাদী প্রকল্প, তা খতিয়ে দেখতে গিয়ে এর বৈশিষ্ট্যগুলি মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন, এখানে উপভোক্তাদের নগদে অর্থসাহায্য করা হয়। এই সাহায্যের বিনিময়ে সরকার অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিয়ে ঠেকাতে সচেষ্ট, আবার গ্রামাঞ্চলে গরিব স্কুল ছুটদের নারীপাচারকারীদের হাতে পড়া থেকে বাঁচানোর চেষ্টাও রয়েছে। লক্ষ্যণীয়, গোড়ায় স্কুলছুট ঠেকানো ও তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাওয়া বন্ধ করতে শুধুই গ্রামাঞ্চলের গরিব পরিবারের কন্যাদের এই প্রকল্পের আওতায় আনা হলেও পরে রাজ্যের সব শিশুকন্যাকেই প্রকল্পের অধীনে আনা হয়। সরকার এই প্রকল্পকে তুলে ধরতে ১৪ আগস্ট প্রতি বছর 'কন্যাশ্রী দিবস' পালন শুরু করেছে। সেই সঙ্গে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেয়েদের উৎসাহিত করে চলেছে। সমাজে এর সুফলও চোখে পড়ছে, 'কন্যাশ্রী'তে উপকৃত নাবালিকা নিজেই বা সঙ্গীদের সাহায্যে তার অল্পবয়সে বিয়ে ঠেকিয়ে দিচ্ছে। এই প্রকল্প এখন আর শুধু শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে আবদ্ধ নেই। তবে এই প্রকল্পের রূপায়ণকে ঘিরে কিছু সমস্যাও রয়েছে, যার সামাজিক মাত্রা রয়েছে। যেমন, যেহেতু নাবালিকা ছাত্রী বিয়ে করে ফেললে আর 'কন্যাশ্রী'র অর্থ পাবে না, তাই অনেকে বিয়ের কথা গোপন রেখে 'কন্যাশ্রী'র সুবিধা ভোগ করছে। এ নিয়ে স্কুলের অন্য ছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভও রয়েছে। তেমনই এটাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে অনেক গরিব ছাত্রী স্কুলের পাঠ শেষ করে আরও পড়াশোনা করতে তৈরি হচ্ছে। রাজ্যের দুই জেলায় দুই স্কুলে নমুনাসমীক্ষা করে রিয়া দেখেছেন, গরিব ছাত্রীরা সরকার থেকে পাওয়া অর্থ অনেক ক্ষেত্রে বাবা- মাকে দিয়েছে, অন্যদিকে, স্বচ্ছল পরিবারের মেয়েরা নিজেরা সেই টাকা সঞ্চয় করছে।

রিয়ার বক্তব্য, 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও তা থেকে প্রাপ্তির হিসাব করার সঙ্গেই আরও একটি বিষয় দেখা জরুরি। তা হল, এই রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী 'কন্যাশ্রী', 'সবুজসাথী' প্রভৃতি প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের বড় একটা অংশের মানুষকে সরকারের প্রতি অনুকূল মনোভাবাপন্ন 'জনগণ' নির্মাণ করার চেষ্টা করছেন। এর কিছু নমুনা ২০১৯ সালের নির্বাচনের প্রচারের সময় দেখা গিয়েছে, যখন কন্যাশ্রীর ছাত্রীরা রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলের প্রতীকসহ কন্যাশ্রীর প্রচারে দেওয়াললিখন করেছে। এ ভাবে ধীরে ধীরে কন্যাশ্রীর ঘোষিত উদ্দেশ্য ছাপিয়ে ছাত্রীদের কাছে মমতার মাতৃসমা ভাবমূর্তিই বড় হয়ে ওঠে, আর তারা নিজেরা হয়ে ওঠে মমতার কাছে উপকৃত সামাজিক গোষ্ঠী।

শিবাজীপ্রতিম বসুর প্রবন্ধের শিরোনাম 'মা, মাটি, মানুষঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির উৎসের সন্ধান'। অমিত প্রকাশ, মনীশ ঝা বা সুমনা দাশগুপ্তের মতোই শিবাজীও প্রবন্ধের শুরুতেই পশ্চিমী দুনিয়ায় বহু আলোচনার মধ্য দিয়ে জনপ্রিয়তাবাদের তত্ত্বের যে আখ্যান তৈরি হয়ে চলেছে, তার নাতিক্ষুদ্র আলোচনা করেছেন। ভারতের প্রসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে এখানে নানা ধরণের জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি বিভিন্ন সময়ে মাথা তুলেছিল। কংগ্রেসের আমলের গরিবি হঠাও স্লোগানের পরে ১৯৮০ দশক থেকে বি জে পি এবং আর এস এস যে হিন্দুত্ব পরিচয়কেন্দ্রিক রাজনীতি শুরু করে, তার মধ্যে অ-হিন্দুদের (বিশেষ করে মুসলমান ও খ্রিষ্টান) বিরুদ্ধে অসূয়া প্রকাশের সঙ্গেই বৃহত্তর হিন্দুসমাজের জাতপাত ইত্যাদির উপরে তাদের হিন্দুত্বকে চাপিয়ে দিতে শুরু করে। তা সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদিকে প্রকৃত অর্থে জনপ্রিয়তাবাদী নেতা বলা যায় কি না, তিনি সেই প্রশ্ন তুলেছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক কেরিয়ারের বিস্তারিত বার্তা দিয়ে শিবাজী দেখিয়েছেন, মমতাকে কোনও একটি বা দুটি নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্য দিয়ে দেখা বা বোঝা অসম্ভব। মমতার উদ্যোগে তাঁর সরকার সাধারণ মানুষের জন্য অসংখ্য জনমুখী প্রকল্প শুরু করেছে। স্পষ্টতই, মমতা সরকারি প্রশাসনের মাধ্যমেই তাঁর জনপ্রিয়তাবাদী কর্মসূচি এগিয়ে নিতে চান। পাশাপাশি, মমতা বি জে পির মুসলমানদের দূরে ঠেলার নীতির বিরোধিতায় পশ্চিমবঙ্গে সব ধর্মের, সব প্রান্তের ও সব ভাষাভাষী মানুষদের মিলে মিশে থাকতে দিতে আগ্রহী। অসমে এন আর সির পরে এবার কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা দেশে এন আর সি করতে বদ্ধপরিকর। অন্য সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এ নিয়ে নীরব, কিন্তু মমতা নন। তিনি বার বার ঘোষণা করছেন, পশ্চিমবঙ্গে এন আর সি হতে দেবেন না।

মমতার রাজনৈতিক কর্মধারা বিশ্লেষণ করে শিবাজি মনে করিয়ে দিয়েছেন, তাঁর এই রাজনীতি যে হেতু একান্তভাবেই নেত্রীকেন্দ্রিক, সেখানে ছোট বড় সব সিদ্ধান্তের জন্যই তাঁর উপর সরকার ও দল নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে যা হয়, অর্থাৎ, দলীয় সংগঠন দুর্বল, ফলে হঠাৎ বিপরীত রাজনীতির ঝড় এলে তা সামলানো কঠিন হয়ে পড়তে পারে।

মনীশ ঝা যেমন হিন্দিবলয়ের প্রধান দুই রাজ্য উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে সামাজিক ন্যায় ও জাতপাতের রাজনীতির মধ্যে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন, তেমনই হিন্দিবলয়ের আর এক রাজ্য ছত্তীশগঢ়ে রমন সিংহের জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজ এবং সমাজের উপর রাষ্ট্রের আধিপত্য নিশ্চিত করার উদ্যোগকে বোঝার চেষ্টা করেছেন রজত রায় তাঁর প্রবন্ধে। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ''প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্রের আবহে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি : সমীক্ষায় ছত্তীশগঢ়''। বি জে পি নেতা রমন সিংহ ছত্তীশগঢ়ের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন (২০০৩-২০১৮) রাজ্যের রেশন ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার থেকে শুরু করে যে বিপুল জনহিতকর উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তার পর্যালোচনা করতে গিয়ে রজত লক্ষ্য করেন, রমন সিংহ প্রধানত ছত্তীশগঢ়ে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষ, বিশেষ করে আদিবাসী মানুষের দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টায় সরকারি প্রশাসন ও অর্থ কাজে লাগিয়েছেন। রেশনের সংস্কারের মাধ্যমে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করেছেন। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা আইন প্র'য়ে'র অনেক আগেই ছত্তীশগঢ় অগ্রণী ভূমিকা নেয়। পাশাপাশি, কৃষি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ বিপুলভাবে বাড়িয়ে দিয়ে তিনি একগুচ্ছ জনহিতকারী প্রকল্প নেন। এ জন্য তিনি সাধারণ মানুষকে নগদ টাকা দিতেও পিছপা নন। তাঁর এই কাজ জঁ দ্রেজের মতো অর্থনীতিবিদেরও প্রশংসা কুড়োয়। সরকারি তথ্য ও পরিসংখ্যান বলছে, রমন সিংহের আমলে গ্রামের হতদরিদ্র মানুষদের পুষ্টির পরিমাণ আগের চাইতে কিছুটা বেড়েছিল। পাশাপাশি, মোটামুটি একই সময়ে ছত্তীশগঢ়ের বস্তারে নকশাল (মাওবাদী) দমনের জন্য সরকারি মদতে বেআইনী 'সলওয়া জুড়ুম' বাহিনী তৈরি হয়, যারা পুলিশি মদতে গরিব আদিবাসীদের উপর অত্যাচার চালায়। পরে সুপ্রিম কোর্ট তাদের বেআইনী ঘোষণা করে। কেন্দ্রের নকশাল নীতির মতোই রমন সিংহের সরকারেরও নকশালদের প্রতি দুমুখো নীতি লক্ষ্য করা যায়। একদিকে নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে তাদের দমন করার চেষ্টা, অন্যদিকে, প্রত্যন্ত গ্রামে উন্নয়ন (সড়ক, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি) পৌঁছে দিয়ে নকশালদের থেকে তাদের জনভিত্তি (আদিবাসী সমাজ) দুর্বল করার চেষ্টা। এর সঙ্গে এটাও রমন সিংহ সরকার গোপন করেনি যে কর্পোরেট দুনিয়ার স্বার্থে অরণ্য ও খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চলকে নকশালদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা দরকার। লেখক প্রশ্ন তুলেছেন, দারিদ্র্য দূরীকরণের রমন সিংহের উদ্যোগের পিছনে এই সব কারণ কিছুটা হলেও ক্রিয়া করেছে কি না।

অন্যদিকে, লেখক লক্ষ্য করেছেন, রমন সিংহের জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির অন্যতম উপাদান সরকারি প্রশাসনের মাধ্যমে জনকল্যাণকারী প্রকল্প, আর এ ভাবেই তিনি পপুলার নেতা হয়ে গরিব মানুষের কাছে 'চওর ওয়ালা বাবা' অভিধা পান, টানা তিনটি নির্বাচন জেতেন। পরে ২০১৮ সালে কংগ্রেস নির্বাচনী প্রচারে নেমে রমন সিংহের মতোই জনপ্রিয়তাবাদী স্লোগান ও প্রতিশ্রুতি দেয়, বরং রমন সিংহের চাইতে এক ধাপ বেশি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে জিততে সমর্থ হয়। ক্ষমতায় এসে কংগ্রেসও রমন সিংহের

জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি থেকে সরে নি। অর্থাৎ নির্বাচনী গণতন্ত্রের প্রতিযোগিতার আবহে জনপ্রিয়তাবাদী আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি সম্ভব, এবং প্রচলিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক দলগুলির পক্ষেও তা এড়িয়ে চলা কঠিন। প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ায় যেখানে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির প্রকাশ প্রধানত সরকারি প্রশাসনিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, সেখানে পশ্চিমী দুনিয়ার প্রচলিত তত্ত্ব দিয়ে তাকে কতদূর ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে? বরং, দক্ষিণ এশিয়া বা উত্তর ঔপনিবেশিক দেশগুলির ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তাবাদকে প্রশাসনিক উদ্যোগের মধ্যে গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। আর সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজকর্মকে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই ধরা দরকার।

উদারনৈতিক রাজনীতির সঙ্কটের দর্পণে জনপ্রিয়তাবাদ : ভারতের নীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে কিছু কথা

অমিত প্রকাশ

সারা পৃথিবী জুড়ে সমকালীন রাজনীতি প্রসঙ্গে 'জনপ্রিয়তাবাদ' (populism) আখ্যাটি ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি হিসাবে ট্রাম্পের উত্থানের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে, তুরস্কের এরডোগান-এর সংস্কারবাদী নেতা থেকে একনায়ক হয়ে ওঠায়, অথবা রুশ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পুতিনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায়। অবশ্য জনপ্রিয়তাবাদ কোনো সময় কালে সীমাবদ্ধ ঘটনা নয়, কারণ পেরনের আর্জেন্টিনা, ইন্দিরা গান্ধীর 'গরিবী হটাও' এমনকি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রবক্তা ফ্রান্সের জ্যাকোবিন রাজনীতিকেও জনপ্রিয়তাবাদী (populist) বলা হয়েছে। গবেষণামূলক লেখা-লেখিতে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে অবশ্য কোনও ঐকমত্য নেই। শব্দটি নানা ধরণের রাজনৈতিক ঘটনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। সরকারের অর্থনৈতিক অগ্রগতির নীতি থেকে শুরু করে ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণ, অথবা 'ভূমিপুত্রের অগ্রাধিকার' ভিত্তিক রাজনৈতিক মতপ্রকাশ, নিজের জাতি ও দেশের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি; প্রত্যেকটিকে জনপ্রিয়তাবাদী বলা হয়েছে। এমনকি পৃথিবীর নানা অংশে 'Occupy Wall Street' এর মতো আন্দোলনগুলিকেও জনপ্রিয়তাবাদী তকমা দেওয়া হয়েছে।

ঘরের কাছে, আমআদমি পার্টির উত্থান ও নির্বাচনের পিছনে যে রাজনীতি অথবা ভারতীয় জনতা পার্টির তিন দশকব্যাপী রাজনৈতিক সক্রিয়তার ফলস্বরুপ ২০১৪ ও ২০১৯ এর সাধারণ নির্বাচনে সাফল্য; এই দুটিকেই দেখা হয়েছে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির নিদর্শন হিসাবে।

নানা ধরণের রাজনীতিকে এই নমনীয় অভিধার অন্তর্গত করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে জনপ্রিয়তাবাদের আবর্তে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ (xenophobia) দ্বারা উদ্বুদ্ধ রক্ষণশীলদের বিপরীতে উদারনৈতিক রাজনীতিবিদদের উদ্বেগ, অথবা শাসনব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞদের হস্তক্ষেপ; এমনকি সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার (মূলত অর্থনৈতিক) একটি বড় অংশই গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার বাইরে রাখার প্রবণতাও এর অন্তর্গত।

উপরের আলোচনার সুত্র ধরে এটা বলা যায় যে জনপ্রিয়তাবাদ শব্দটির অর্থ ও ব্যঞ্জনা শুধুই রাজনীতির দৃশ্যমান লক্ষণগুলি দেখে, রাজনীতির চর্চা বা সক্রিয় রাজনীতি থেকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আবার এটাও বলা হয় যে জনপ্রিয়তাবাদ উদারনীতিবাদের বিপরীত নয়, যেমনটা অনেক ক্ষেত্রে অনুমান করা হয়। জনপ্রিয়তাবাদের সমকালীন প্রকাশগুলি বরং উদারনীতিবাদের তত্ত্ব ও অনুশীলনের সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অভিজ্ঞতা নির্ভর অনুসন্ধানের প্রচলিত উদারনৈতিক ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে এই বিষয়টি বোঝা বা এই সম্পর্কে তত্ত্ব খাড়া করা সম্ভব নয়। বরং, যা চোখের সামনে দৃশ্যমান নয়, যে যে লক্ষণ অনুপস্থিত, সেই সব বিচার করার পদ্ধতি ধরে এগোলে এক্ষেত্রে বেশি কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিষয়টি তলিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশটি উদারনীতিবাদের সঙ্কটের উপর আলোকপাত করবে। শুধু মাত্র জনপ্রিয়তাবাদ সম্পর্কে আরো সুনির্দিষ্ট ধারণা তৈরি করতে নয়, গভীরতর আলোচনায় প্রবেশ করার সূত্র পেতেও এটা জরুরি। তেমনই, উদারনীতিবাদের সঙ্গে তার একটি সমকালীন সংস্করণ, অর্থাৎ নয়াউদারনীতিবাদের সম্পর্কগুলিও এখানে আলোচ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বক্তব্যগুলি আরও বিশদে আলোচনা করা হবে। আলোচনা শেষ করবার আগে তৃতীয় অধ্যায়ে সামাজিক বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গে উদারবাদী তত্ত্বের দূর্বল দিকগুলি খতিয়ে দেখা হবে।

১

নাগরিকের ব্যক্তিগত অধিকার, স্বাধীনতা ও সাম্যকে প্রাধান্য দিয়ে এক রাজনীতি গঠনের কাঠামোকে উদারনীতিবাদ হিসাবে দেখা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রত্যেক সমাজে জটিল দরকষাকষির মাধ্যমে তৈরি করা সামাজিক চুক্তির সূত্রে পাওয়া একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতির সমাহার রূপেও উদারনীতিবাদকে দেখা যেতে পারে। সমকালে বিশ্বজুড়ে উদারনীতির প্রসার, তার প্রতি ব্যাপক সমর্থন এই চিন্তাধারার আকর্ষণীয়তা প্রমাণ করে। অবশ্য সমসাময়িক মূলধনী পুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ার ফলে গণতান্ত্রিক চেতনায় যা ন্যায্য, সেরকম কিছু প্রতিশ্রুতিভঙ্গের ঘটনাও ঘটেছে। যেমন, রাষ্ট্রের পরিচালনব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের আরও বর্ধিত অংশগ্রহণ, উন্নয়নের সুফল সমাজের সকল শ্রেণীরমানুষের কাছে আনুপাতিক ভাবে পৌঁছনোর সুযোগ ইত্যাদি বৈধ গণতান্ত্রিক ভাবনাগুলিকে অগ্রাহ্য করা হয়ে থাকে। জনপ্রিয়তাবাদ সেইসব উপেক্ষিত প্রত্যাশাগুলিকে জড়ো করে অভিন্ন জনপ্রিয় আকাঙ্খার এক ধারণা গড়ে তোলে, সেইসঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করার আশ্বাসও দেয়।

উদারনৈতিক রাজনীতির সঙ্কটের আবহে জনপ্রিয়তাবাদকে বোঝার চেষ্টা ঃ

এই ধরনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রভাব অত্যন্ত জটিল এবং বিস্তৃত। যেমন, প্রাতিষ্ঠানিক জড়তা থেকে অর্থনৈতিক পুঁজিবাদের বিকল্পের অভাব, এবং ক্রমশ বেড়ে চলা বৈষম্যের সম্মুখীন হয়ে বাড়তে থাকা সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রত্যাশা।

জনপ্রিয়তাবাদ সম্বন্ধে গবেষণা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল উপাদানগুলির অধীনে করা হয়েছে, যা পরস্পর সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলির ওপর সেভাবে নির্ভর করেনি। অতএব, জনপ্রিয়তাবাদী পরিবর্তনের নেপথ্যে প্রক্রিয়াগুলি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়না, ভারতের ক্ষেত্রে যা আরও প্রযোজ্য। যেমন, নয়া উদারনৈতিক প্রবণতা কীভাবে জনপ্রিয়তাবাদের উত্থান ও বৃদ্ধির পরিমন্ডল তৈরি করে এবং দুইয়ে মিলে কীভাবে সামাজিক কাঠামোগুলির ওপর প্রভাব ফেলে। তথ্যপ্রযুক্তি, অর্থনৈতিক পুঁজি এবং উদারবাদের সংকটের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া কীভাবে রাজনৈতিক পরিসরকে দখল করে জনপ্রিয়তাবাদী চিন্তার আবির্ভাব ও বৃদ্ধি এবং উদারবাদী প্রকল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করে?

উদারনীতিবাদের সংকটের প্রেক্ষিতে জনপ্রিয়তাবাদকে বোঝার চেষ্টা ঃ

জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রকৃতি ও চরিত্রের সঙ্গে মৌলিকভাবে জড়িত। অবশ্য এই গণতন্ত্র কীভাবে বা কতটা আধুনিক,তা সরাসরি মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতিতে নিছক গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার বা শাসনব্যবস্থা গঠন থেকে স্পষ্ট হয় না। ফলে, কয়েকটি বিষয় বুঝবার জন্য এই ধারণাগুলি বিশদে আলোচনা করা জরুরি, যেমন ঃ

...গণতন্ত্রের দুটি দিকের মধ্যে পার্থক্য। একদিকে গণতন্ত্রকে এক প্রকার শাসন হিসাবে দেখা, মানুষের সার্বভৌমত্ব যার নীতি। অন্যদিকে সেই প্রতীকী কাঠামো যার সীমারেখার মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসন প্রয়োগ করা হয়... গণতন্ত্রকে যা যথার্থভাবে আধুনিক করে তোলে তা হল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে ''ক্ষমতার রাশ জনগণের হাতে থাকা উচিত'' নামক প্রাচীন নীতির নবরূপে উত্থান। এই উত্থান উদারনৈতিক ধ্যানধারণার প্রতীকী কাঠামোর মধ্যেই থাকে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। এই আদর্শগুলির অবস্থান উদারনৈতিক মতবাদের কেন্দ্রে, এবং সেগুলিই আধুনিক গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে গড়ে তোলে। তাই বলে, শুধু এই মূল্যবোধের ভিত্তিতেই আধুনিক গণতন্ত্রকে বোঝার চেষ্টা অনুচিত। কারণ, তার দুই প্রধান ভিত্তি, অর্থাৎ সাম্য ও মানুষের সার্বভৌমত্বের ধারণা এ থেকে আলাদা। প্রকৃতপক্ষে, চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পৃথকীকরণ, গণপরিসর ও ব্যক্তি পরিসরের মধ্যে বিভাজন এবং আইনের শাসন বা 'Rechtstaat' সম্পর্কে যে ধারণা; উদারনৈতিক রাজনীতির মধ্যে রয়েছে, তাদের উদ্ভব গণতন্ত্রের চর্চা থেকে হয়নি।বরং অন্য কোথাও .....

উদারবাদী ভাবধারা বিকশিত হয়েছে আইনের শাসন, মানবাধিকার রক্ষা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে। অপর প্রান্তে রয়েছে গণতান্ত্রিক ভাবধারা, যার কেন্দ্রে রয়েছে সাম্য, শাসক ও শাসিতের মধ্যে অভিন্নতা এবং সাধারণ মানুষের সার্বভৌমত্ব। দুই পৃথক মতবাদের মধ্যে কোনো আবশ্যক সম্পর্ক নেই, বরং রয়েছে একটি আকস্মিক ঐতিহাসিক স্পষ্টোক্তি। সি বি ম্যাকফারসন দেখিয়েছেন যে এই স্পষ্টোক্তির মাধ্যমেই উদারবাদের গণতন্ত্রীকরণ ও গণতন্ত্রের উদারীকরণ হয়েছে... বর্তমানে যদিও আমরা উদারবাদ ও গণতন্ত্রের যোগসূত্রকে নিশ্চিতভাবে ধরে নিই, তাদের এই মিলন কিন্তু কোন সহজ প্রক্রিয়া নয়, বরং তিক্ত লড়াইয়ের ফল...

এই তিক্ততা মেটানোর ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদীদের ব্যর্থতার (বা, সচেতনভাবে উপেক্ষার) ফল বহুমুখী। এর মধ্যে অন্যতম হল বহু চর্চিত 'গণতন্ত্রের ঘাটতি'। এটি এমন এক পরিস্থিতি, যেখানে উদারনীতিবাদীরা সাম্য ও মানুষের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নের ওপর জোর দেয়। এর বিপরীতে অবস্থানকারী সাধারণ গণতান্ত্রিক চিন্তায় সাম্য ও মানুষের সার্বভৌমত্বকে গুরুত্ব না দিয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আইনের শাসনের উপর জোর দেওয়া হয়। শেষের দুই নীতি যে নয়া উদারনীতিবাদী চিন্তাধারায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, এটা নিছক কাকতালীয় নয়?

এর সাথে তাল মিলিয়েই রয়েছে সামাজিক গোষ্ঠীর দাবির সঙ্গে আধুনিক উদারবাদী গণতন্ত্রের মতগুলির সমন্বয় ঘটাতে এই টানাপোড়েনের ব্যর্থতা। সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের নানা দাবি মেটানোয় উদারবাদী গণতন্ত্রের ভূমিকা আর যাই হোক উপকারী নয়। ব্যক্তি স্বাধীনতার গুরুত্ব এবং নিরপেক্ষতার মিথ আধুনিক উদারবাদী গণতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

একই সঙ্গে আধুনিক গণতান্ত্রিক উদারনৈতিক মতবাদ সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিজস্ব দাবিগুলির নিরসন করতে ব্যর্থ হওয়ার প্রসঙ্গটিও মনে রাখতে হবে। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিশিষ্টতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে উদারনৈতিক মতবাদের ব্যর্থতা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। আধুনিক উদারনৈতিক চিন্তায় ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে দেখা এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর পরিচয়কেন্দ্রিক সত্ত্বাকে অস্বীকার করতে চেয়ে উদারনৈতিক চিন্তাধারা এমন একটা পরিস্থিতির সামনে দাঁড়াতে বাধ্য হয় যেখানে মানুষ তার ব্যক্তি পরিচয়ের চাইতে জাতি বৈশিষ্ট্যভিত্তিক পরিচয়কে তুলে ধরতে চাইলে তার কোনও উত্তর উদারবাদীদের হাতে থাকে না। ইতিহাসগত দিক থেকে জাতি রাষ্ট্রের স্থাপনার সঙ্গে জাতিরাষ্ট্রকেন্দ্রিক পরিচয় তৈরির চেষ্টা হলেও তার মধ্যে অনেক অসংগতি থেকে যায়। যেমন, পাশাপাশি জাতিগোষ্ঠীকেন্দ্রিক পরিচয়ের ধারাটিও বয়েই চলে। এটা বিশেষ করে প্রযোজ্য বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে।

অবশ্য অল্পকালের জন্য এই দুই চিন্তাধারা একদিকে, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আইনের শাসন, অন্যদিকে,সাম্য, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রও মানুষের সার্বভৌমত্বের মধ্যে একটা সমঝোতার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে ১৯৭০ এর দশকের তেলসঙ্কটের সময় পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় ছিল। মুখ্যত কেইনস-এর চিন্তা ধারার প্রভাবে জাতি রাষ্ট্রগুলির উদারনৈতিক ভাবমূর্তি গঠনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। মোটামুটি ওই সময়েই উদারনৈতিক রাষ্ট্রনীতি সাধারণ মানুষের প্রতি কিছু প্রতিশ্রুতিপূরণ করতে পেরেছিল। ওই সময়ে প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রের জননীতিতে সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানোর কথা বলা হয়। বাস্তবে যদিও তা খুব একটা কার্যকর হতে দেখা যায়নি। বেশির ভাগ রাষ্ট্রের জননীতিতেই এ ব্যাপারে বেশ উচ্চাশা প্রকাশ করতে দেখা যায়, যেগুলি বেশির ভাগই ভালো। যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যপরিষেবা, কর্মসৃজণ প্রভৃতি। যদিও সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সত্যিকারের লাভগুলিকে অস্বীকার করার উপায় নেই,

তবু যেটা নিরুচ্চারিত থেকে যায়, তা হল উদারনৈতিক রাজনীতির মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য ছড়িয়ে থাকা নানা প্রতিশ্রুতি। সাম্য, জনগণের সার্বভৌমত্ব, এবং গণতন্ত্র সেই সব অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, যার জেরে আশা করা হয়েছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা, আইনের অধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এইসব ভাবনাই ওই সময়ের রাজনৈতিক নীতি প্রণয়ণ এবং বাস্তব রাজনীতিকে পরিচালিত করত।

এ হেন প্রগতিশীল ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লব কখনোই বেশি দূরে থাকতে পারে না। ১৯৬০ এর দশকেই উদারনীতিবাদে নিহিত প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবে রূপায়িত করতে না পারার ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। পরে ১৯৭০ এর দশকে গোটা চিন্তাধারাটির কার্যকারিতা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে থাকে। কেইনস-এর নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রব্যবস্থা কার্যত ভেঙ্গে পড়ে, সেই সঙ্গে নয়া উদারনীতিবাদী চিন্তার উদয় হয়। নয়া উদারবাদী ব্যবস্থার উত্থানে আগেকার নীতি ও রাজনীতির মধ্যে ভারসাম্য ও সমাজের কাছে দেওয়া উদারনৈতিক প্রতিশ্রুতি, সব উল্টে পাল্টে যায়।

যার পরিণামে নীতি ও রাজনীতিতে যে পরিবর্তন আসে, তাতে নয়াউদারনীতির মোড়কের আড়ালে যুক্তিসঙ্গত, পদ্ধতিগত ব্যক্তিত্ববাদী চিন্তা প্রাধান্য পায়। এর ফলে এতদিন উদারবাদী চিন্তা যে নড়বড়ে ভারসাম্য রক্ষা করে চলছিল, তার দুটি সুত্রের মধ্যে টানাপোড়েন আরও বেড়ে যায়। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আইনের শাসনের ধারণা ব্যক্তি স্বার্থের পিছনে বেলাগাম দৌড়কে উৎসাহিত করে চলে, যার পরিণতিতে উদারবাদী রাজনীতির চিন্তাধারার উপর তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। বাজার অর্থনীতির কার্যকারিতার বেদিতে সমাজকে দেওয়া যাবতীয় উদারনৈতিক প্রতিশ্রুতিকে বিসর্জন দেওয়া হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য ঘুচিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠার কাজ এবং মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমাজ গঠনের চেষ্টা, দুটোই পাল্টে গেল। এটাও কাকতালীয় নয় যে এই সময় থেকেই সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের জন্য সামাজিক ন্যায়ের দাবিতে সোচ্চার হতে শুরু করে।

উদারনৈতিক চিন্তাধারার পলিটিক্যাল ইকনমির এই প্রেক্ষিতকে মাথায় রেখেই জনপ্রিয়তাবাদকে আজকের দিনে দেখতে ও বুঝতে হবে। মনে রাখতে হবে, আগেকার বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী ঝোঁকের জনপ্রিয়তাবাদের চাইতে এখনকার জনপ্রিয়তাবাদ আলাদা। একইসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে মতাদর্শভিত্তিক যেসব গণআন্দোলন হয়েছে, তার সঙ্গেও এর পার্থক্য রয়েছে।

জনপ্রিয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় ঃ

জনপ্রিয়তাবাদের অর্থ কি?

সেই ১৯৬০ এর দশকের শেষ ভাগে 'পপুলিজম' শব্দটি দেখা যায় ঔপনিবেশিকতার নিগড় থেকে মুক্তি সংক্রান্ত আলোচনায়, কৃষককেই সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা শক্তি সম্বন্ধে জল্পনায়, এবং যা সবচেয়ে বিস্ময়কর... এক বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বিশেষ করে মাওবাদের মধ্য দিয়ে কম্যুনিজমের উত্থান ও বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কিত আলোচনায়।

যাই হোক, জনপ্রিয়তাবাদ শব্দটির সমসাময়িক ব্যবহারে কিন্তু বৌদ্ধিক চর্চার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি। বরং এর অর্থ রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্টাতে থাকে। শব্দটির ইউরোপীয় ব্যাবহারে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চিন্তায় (xenophobia) প্রতিফলিত রক্ষণশীলতাকে বোঝায়। গণতন্ত্রের তাত্ত্বিকরা আবার নয়া উদারনৈতিক ধারায় বিশেষজ্ঞনির্ভরতার উদ্ভব নিয়ে বেশী উদ্বিগ্ন। যা জনগণের প্রত্যাশার সংস্পর্শে না থাকা প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞ বা এলিটদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার আভাস দেয়, এবং যার প্রভাবে উদারনৈতিক চিন্তায় নিহিত মানুষের সার্বভৌমত্ব এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে বিচ্ছেদ আরো প্রবল হয়।[৬]

এই অর্থে জনপ্রিয়তাবাদকে সাধারণ মানুষের সার্বভৌমত্বের আকাঙ্ক্ষাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা যায়। সাম্প্রতিককালে নানা ধরণের দখলদারি আন্দোলনের উদ্ভবকে (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ালস্ট্রিট দখল আন্দোলন অথবা ভারতে দুর্নীতি বিরোধী লোকপাল আন্দোলন) বিকল্প রাজনীতি হিসাবে দেখে জনপ্রিয়তাবাদী বলা হয়। এই ধরনের জনপ্রিয়তাবাদী রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আগেকার দিনের এলিট শ্রেণীর প্রতিভূ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রতি নাগরিকদের মোহ ভঙ্গকে প্রকাশ করে। আগে উল্লিখিত গণতান্ত্রিক আকাঙ্খার বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষকেও প্রবাহিত করে। যাদের জনপ্রিয়তাবাদী তকমা দেওয়া হয় তারা দাবী করে যে তারা তাদের কাজের মাধ্যমে নাগরিকদের জনপ্রিয় আকাঙ্খা গুলিকেই প্রতিফলিত করে এবং কোনও বিশেষ মতাদর্শগত অবস্থান বা চিন্তাধারায় তারা সীমাবদ্ধ থাকে না।

জনপ্রিয়তাবাদীরা যতই দাবি তুলুক,খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে উদারনৈতিক মতাদর্শের দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে রক্ষা করা বা উদারনীতির হারিয়ে ফেলা ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার কাজে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি গুরুত্ব আরোপ না-ও করতে পারে। জনপ্রিয়তাবাদীরা যেভাবে রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করতে, এবং এলিট শ্রেণীর গণতন্ত্রের প্রসারে আগ্রহী, তাতে তাদের দাবি অনুযায়ী সাধারণ মানুষের আকাঙ্খাপূরণের কাজ করার পরিবর্তে তারা রক্ষণশীল রাজনীতিকেই জায়গা করে দেবে। ফলে, মানুষের সার্বভৌমত্বের আকাঙ্খার সঙ্গে নিকৃষ্ট ধরণের সাম্যের ধারণাকে জোড়াতালি দিয়ে মিশিয়ে যা তৈরি হবে, তা মেকি উদারনীতিবাদের একটা আকার মাত্র। তার সঙ্গে এই জোড়াতালি কার্যত লাগামহীন ব্যক্তিস্বাধীনতা ও কড়া আইনের শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করবে। জনপ্রিয়তাবাদী চেতনায় ব্যক্তিকে সমষ্টির অধীনে আনা, এবং একই সঙ্গে উভয় পক্ষকেই একত্র করার কাজটি কিন্তু উদারনৈতিকতার সাফল্য ও ব্যর্থতা, দুটো থেকেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু, উদারনীতিবাদের ব্যর্থতা এবং তাকে রক্ষণশীল গণতান্ত্রিক চিন্তাধারর অধীনস্থ করার বিষয়টি কিন্তু জনপ্রিয়তাবাদের মূল কাঠামোর মধ্যেই রয়ে গেছে।

উদারনীতিবাদ ও তার অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ঃ

কোনও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বা নীতির প্রভাব বুঝতে প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্ভার সংকলন ও বিশ্লেষণ করাটা সমাজ বিজ্ঞানের প্রচলিত পদ্ধতি। যেমন, পূর্ণ সাক্ষরতার প্রতিশ্রুতি কতটা পূরণ হয়েছে বিচার করতে গেলে দেখতে হবে সাক্ষরতা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, এমনকি স্কুলের বিভিন্নস্তরেছাত্র ভর্তির হার(GrossEnrolmentRatio)বাসাক্ষরতায়সাফল্যইত্যাদি।কিন্তু উদারনৈতিক রাজনীতির সাফল্য বিচারে এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ, এই পদ্ধতিতে যে কটি সূচক বেছে নেওয়া হবে তার প্রায় প্রত্যেকটিই ইঙ্গিত দেবে যে সাম্যের প্রতিশ্রুতিগুলো নাগরিকদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতির নিরিখে বিপুলভাবে পূরণ হয়েছে। নাগরিক জীবনের প্রায় সব দিক; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক সুযোগ সংক্রান্ত সরকারিনীতিগুলি আরও বৈষম্য মুক্ত সমাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ সুগম করছে। তাই বলে, এটা অবশ্য মূল বক্তব্যকে খর্ব করে না যে উদারনীতিবাদের নীতিতে নিহিত গণতন্ত্র ও সাম্যের প্রতিশ্রুতিগুলির অনেকটাই এখনও অনেকাংশে অধরা রয়ে গেছে। যথার্থভাবেই, উদারবাদী প্রতিশ্রুতিকে একটা নিছক কথার কথা বা ঘোষণায় সীমিত অনুশীলন হিসাবে দেখা যেতে পারে। মনে করা হতে পারে, আসলে এটা উদারনৈতিক রাষ্ট্রের বৈধতা আদায়ের উপায় মাত্র, যখন অপর দিকে নীতি ও রাজনীতির যাবতীয় ঘোষণা সেসব প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে একান্তভাবে ব্যর্থ।

অর্থনৈতিক সাম্যের অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ঃ

স্বাধীনতার সময়ে ভারতে যে উদারনৈতিক রাজনীতির সূচনা হয়েছিল তার ভাবনায় সচেতনভাবেই, অন্যসব কিছুর সঙ্গে, সমাজে 'স্থিতি ও সুযোগসুবিধার সাম্য'-র প্রসারের চেষ্টা ছিল। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই সে কথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। রক্ষণশীলদের সতর্ক বাণী উপেক্ষা করে সংবিধান সভায় সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের প্রস্তাবে সিলমোহর পড়া নিঃসন্দেহে অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ঐতিহাসিক একটি পদক্ষেপ ছিল। তখনকার বিশ্বের উদারনৈতিক আবহের সঙ্গে এই পদক্ষেপ সামঞ্জস্যপূর্ণই ছিল।

১৯৪৯ সালে সংবিধান সভায় সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃতি পাওয়ার পরে মনে করা হয়েছিল একটাই কাজ বাকি, সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য কমিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজন আর্থিক উন্নয়ন ও সম্পদ পুনর্বন্টনে গুরুত্ব আরোপ। এটাও তখনকার দিনে চারদিকে যে উদারনৈতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। গোড়ায় তা আধুনিকতার চিন্তার আলোকে পুষ্ট হলেও, পরে নয়া উদারনীতিবাদের চিন্তাধারাতেও তা উপেক্ষা করা যায়নি। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের প্রসঙ্গটিও মীমাংসার অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু তার আগেই দেশের রাজনীতি ভিন্ন দিকে বাঁক নিয়ে নেয়। যা নিয়ে পরের অধ্যায়ে আলোচনা করা যাবে।

অর্থনৈতিক সাম্যের প্রশ্নে যে বিপুল গবেষণা রয়েছে, তা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে নয়া উদারনীতিবাদী রাজনীতির পরিসরে সম্পদের ন্যায্য বন্টনের বদলে তার ফল নেতিবাচকই হয়।

...ভারতের নীতিনির্ধারকেরা বরাবরই দারিদ্র্য ও বৈষম্য দুর করার দিকে নজর দিয়েছেন... স্বাধীনতার পর প্রায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত ভারত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাভিত্তিক উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করেছিল...তাদের আশঙ্কা ছিল অতিরিক্ত বাজার-নির্ভরতার ফলে উচ্চ-আয়ের মানুষদের মধ্যে যেমন অত্যধিক ক্রয় ও ভোগের প্রবণতা দেখা যাবে; তেমনই, অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলিতে তুলনামূলক কম বিনিয়োগ... এবং সরকারি উদ্যোগে সম্পদের পুনর্বন্টনের কারণে মুদ্রাস্ফীতির জেরে সামগ্রিক অর্থনীতিতে তার ধাক্কা লাগা স্বাভাবিক। এ সবের ফলে দেশের শ্রমিক, কৃষক এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষদের উপর যে আঘাত নামবে, তা নিয়ে সরকার ও সরকারের নীতি নির্ধারকরা উদ্বিগ্ন ছিলেন।

১৯৮০-র মাঝামাঝি থেকে ভারত সরকার ধীরে ধীরে বাজারমুখী অর্থনৈতিক সংস্কারের নীতি নেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এগুলো সম্প্রসারণবাদী আর্থিক কৌশলের সাথে জড়িত ছিল। গ্রামীণ এলাকায় অর্থবন্টন এর অংশ ছিল, যা উদারীকরণের গোড়ার দিকের পুনর্বন্টনের প্রভাবগুলির বিরুদ্ধে ভারসাম্য রক্ষা করছিল।

১৯৯০-এর গোড়ায়, যখন সরকার জোরাল ভাবে নয়া উদারনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে, তখন থেকে ব্যাপক আর্থিক সংস্কারের সূচনা হয়। অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গিতে বদল আসে। এই সময়ে অর্থনৈতিক নীতিগুলির ভরকেন্দ্র রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে সরে আসে, সম্পদের পুনর্বন্টনের নীতি থেকে সরে আসে, উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের দিকে সরে যায়।

এই নীতিগুলির প্রভাব সুবিশাল, যা ছুঁয়ে গেছে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রকে; চাকরি থেকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা থেকে কৃষিক্ষেত্র। বর্তমান প্রবন্ধে সেই প্রভাবের বিস্তারিত মূল্যায়ন অপ্রয়োজনীয়, কারণ এ নিয়ে নানা বিতর্ক, বহু লেখালেখি রয়েছেই, তার ক্ষেত্রও আলাদা।

এই কারণেই কিছু সূচকের মূল্যায়ন এখানে উদ্ধৃত হবে, মূল বক্তব্যের সহায়ক হিসাবে। দেশে বাড়তে থাকা বৈষম্য বিচার করার ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গিনি কোয়েফিসিয়েন্ট। ১৯৮৪ থেকে গ্রামীণ ও শহুরে; দুই প্রকার মানুষের মধ্যেই বৈষম্যের দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষণীয়।

...প্রত্যেক গ্রামের আয় বৈষম্য...অতিরিক্ত মাত্রার বৈষম্যের ইঙ্গিত দেয়...গিনি কোয়েফিসিয়েন্টের মান অনুযায়ী...সমস্ত গ্রামগুলির মাথা পিছু গড় আয়ের মাত্রা ছিল ০.৫৯৫...

কিছু পরিবারে নেতিবাচক আয়ের উপস্থিতি থাকা ছাড়াও প্রায় ১৩ শতাংশ পরিবার চাষে ক্ষতির রিপোর্ট দিয়েছে...আমাদের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, প্রতিটি গ্রামে মুষ্টিমেয় উচ্চ আয়ের পরিবারের আয়ের বিপুল বৃদ্ধি হয়ে চলেছে...পারিবারিক আয় সম্বন্ধে আমাদের সমীক্ষায় লব্ধ তথ্য গ্রামীণ এলাকায় আয়ের বিপুল বৈষম্যজনিত গভীর উদ্বেগের দিকে আলোকপাত করছে... [৯]

সাম্প্রতিক অতীতে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সামগ্রিক চিত্রটা একইভাবে অপরিবর্তিত ও ক্রমবর্ধমান ঃ

বৈষম্যের এই প্রবণতা ও মাত্রাগুলি প্রমাণ করে যে ভারত শুধুমাত্র উচ্চ বৈষম্যের দেশ নয়, গত দুই দশকে বৈষম্যগুলি বেড়েই চলেছে। এটা শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষেত্রে নয়,সমাজে অনুভূমিক বৈষম্যেও এটা রয়েছে, যেখানে অন্ত্যজ ও প্রান্তিক মানুষদের সঙ্গে অন্যদের দূরত্ব বেড়েছে... যা ইঙ্গিত দেয় শুধু মাত্র প্রাথমিক সুযোগ সৃষ্টির অভাব নয়, সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেও বৈষম্য... যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে অর্থনৈতিক সম্পদ থাকে তারা সেটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে ব্যবহার করে। এই প্রবণতা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও সামাজিক সংহতিকেই নষ্ট করে।[১০]

এই বাড়তে থাকা বৈষম্যকে ঠেকানোয় সরকারি ভূমিকার ব্যর্থতার কথাও এখানে মনে রাখা দরকার। কৃষিক্ষেত্রে নীতি পরিবর্তনের কারণে উদ্ভূত সঙ্কট ইতিমধ্যেই বিশেষভাবে প্রকট। সাম্প্রতিক কৃষি সঙ্কটে বাড়তে থাকা কৃষক আত্মহত্যা, কৃষিঋণ হ্রাস, কর্মসংস্থানের আশায় শহরে চলে যাওয়া, কমতে থাকা কৃষক সংখ্যা এবং কৃষি নীতির দুর্বলতা; এসবই এই দুর্দশার স্বরূপ।

'অর্থাৎ ভারতের কৃষি সংকটের দায় সরকারের নয়া উদারনৈতিক নীতির ওপর আরোপ করা যায়। এই নীতি মুক্ত বাণিজ্য ও বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে কাজ করে। কৃষি সংকট রয়েছে, কারণ অদূর ভবিষ্যতে এটির সমাধান করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা কোনোটাই ভারতের নেই।'[১১]

অকৃষি কর্মসংস্থানের অবস্থাও কিছু আলাদা নয়। সংগঠিত ক্ষেত্রের বদলে এখন অসংগঠিত ক্ষেত্রের গুরুত্ব বাড়ায় কাজের নিরাপত্তা নেই, স্থায়ী চাকুরি বলে কিছু নেই বললেই চলে। শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার' এখন একটা বাড়ন্ত প্রবণতা হিসাবে দেখা দিয়েছে, যা অনেক গবেষণার বিষয়বস্তু। ''সংগঠিতক্ষেত্রেও অস্থায়ী কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ঘটনায় এটা বোঝাই যায় যে গত কয়েক দশকে রাষ্ট্রের পরিবর্তনশীল ভূমিকা একটি প্রধান নির্ণায়ক। ইদানীং এটা বলাই যায় যে ওপরের দুটি বিষয়ের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের ভূমিকা স্পষ্টভাবে হ্রাস পেয়েছে।[১২]

১৯৮০'র গোড়ায় শুরু হওয়া লেবার মার্কেট পুনর্গঠন আরো গভীর হওয়ায় কর্মসংস্থানের গুণমানও খারাপ হয়েছে। এর ফলে চাকুরীরত মানুষরাও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এই যুগে শ্রমের বাজারকে ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গী হয়ে শ্রমিকদের

ইউনিয়নের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রবণতাও ক্রমশ কমতে শুরু করেছে, বিশেষ করে এই প্রবণতার সূত্রপাত হয়েছে ১৯৮০'র পর থেকে।

UNCTAD এর বিশ্বব্যাপী গণনা অনুযায়ী ১৯৮০ থেকে ২০১১'র মধ্যে বিশ্বে পুঁজি ও শ্রমের অনুপাতে উৎপাদনের হার ৬৫% থেকে ৫৪% নেমে এসেছে। এই প্রবণতা একটি নতুন শব্দ, 'precariat' (সমাজের সেই অংশ, যাদের কাজের নিশ্চয়তা বা নিরাপত্তা, কোনওটাই নেই) এর উদ্ভব ঘটিয়েছে। এদের না আছে কাজের স্থায়ীত্ব, পেশাগত পরিচয়, না আছে নির্ভরযোগ্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা।[১৩]

ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পরিবর্তনগুলি এই বৃহৎ মূল্যায়নের আলোকে দেখলে বোঝা যায় যে সামাজিক ক্ষেত্রে সুযোগের সাম্যের প্রতিশ্রুতিগুলিও অপূর্ণ, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য।

ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্যের এই প্রেক্ষিতে দেখলে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে সামাজিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি।

দেখাই যাচ্ছে, ভারতের অর্থনীতি নয়া উদারবাদী পথে হাঁটতে শুরু করার পরে সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির বদলে আরও কমেছে।

...শিক্ষায় সুযোগের বৈষম্য দুর করায় নয়া উদারীকরণের আবহে ভারতের ভূমিকায় রাজ্যে রাজ্যে, অঞ্চল সাপেক্ষে অনেক পার্থক্য রয়েছে। বৈষম্য হ্রাসের নিরিখে সবচেয়ে এগিয়ে কেরল। উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির তুলনায় দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে বৈষম্যের হার সাধারণত কম... পূর্বের রাজ্যগুলি, অর্থাৎ বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ দারিদ্র্য বেশি মাত্রায় উপস্থিত। যদিও পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য দুর করায় অনেকটাই এগিয়েছে, বিহারে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে... শিক্ষায় সুযোগের ক্ষেত্রে রাজ্যওয়াড়ি যে তফাৎ দেখা যায়, তার নানা কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ভারতের নানা অঞ্চলের মধ্যে নীতির পার্থক্য, দারিদ্র্য দূরীকরণে সাফল্যে তারতম্য, রাজ্যে রাজ্যে আর্থিক বৈষম্য এবং শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য। এ ছাড়া শৈশব থেকেই দারিদ্র্যের কবলে থাকায় সমাজের অনেক অংশের মানুষই স্কুলের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে না।

অর্থনীতির নিম্নগতির সঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রে সুযোগ সংকোচনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তেমনই, কাজের সুযোগ হ্রাসের সঙ্গেও এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সংস্কার এমন একটা সময়ে শুরু হয়, যখন স্বল্প অর্থ বরাদ্দের কারণে সরকারি স্বাস্থ পরিষেবা ব্যবস্থা ধুঁকছে, অন্যদিকে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা বাড়ছে। রাষ্ট্রায়াত্ত ক্ষেত্রে সংস্কারের মাধ্যমে তাকে বাজার অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করার সূচনার জেরে স্বাস্থ্য পরিষেবা মহার্ঘ করে তোলা হল, বিকেন্দ্রিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ হল। এর গুরুতর পরিণতি হল, এরপর থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা আর সুলভ রইল না। গত দুই দশকে স্বাস্থ্য পরিষেবার বাণিজ্যিকরণের নেতিবাচক ফলগুলি সামনে এসেছে। এ নিয়ে সমাজে বৈষম্য

বেড়েই চলেছে। চিকিৎসার জন্য ব্যয় বৃদ্ধির ভার নিম্নবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণীকে দারুণভাবে বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছে।[১৪]

যদিও সমাজ বিজ্ঞানের অনেক গবেষণাই বলে যে বিগত ৮-৯ দশক জুড়ে অর্থনৈতিক সুযোগের প্রসারের স্বার্থে সুবিশাল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, গত দুই দশকের বিপুল অর্থনৈতিক বৃদ্ধি যার অন্তর্গত। এগুলিকে ভুল প্রমাণ করা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। যথার্থই, এমন অনেক দাবি সঠিক। ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনও কেনা বেচায় এরকম বৃদ্ধি হয়ত আগে কখনও দেখা যায়নি। অবশ্য এটাও ঠিক যে সমান্তরালভাবে বৈষম্যের হারও কখনও এতটা বৃদ্ধি পায়নি, যা আগেই বলা হয়েছে।

উদারনৈতিক তত্ত্ব ও বৈচিত্র্য বৈষম্যের কি হল ?

উদারনৈতিক তত্ত্বে ব্যক্তি স্বাধীনতার সার্বজনীনতা প্রদান ও তাকে রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার প্রয়াস হলেও যখন সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের পরিচয়কেন্দ্রিক স্বীকৃতির দাবি তোলে, তখন উদারনীতিও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। একদিকে ব্যক্তির স্বাধীনতা, অন্যদিকে, গোষ্ঠীর স্বাধিকারের দাবি, এই দুইয়ের মধ্যে অস্বস্তিকর সম্পর্ককে তাই অস্বীকার করা যায় না। এই টানাপোড়েনের তিনটি প্রভাব দেখা যায়। ক) সামাজিক গোষ্ঠী পরিচয়ের ন্যায্য দাবিকে আর্থিক দাবির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়, নয়তো একেবারে উপেক্ষা করা হয়। খ) উদারনৈতিক ধ্যানধারণায় প্রোথিত সাম্যের প্রতিশ্রুতিসমূহ মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়, এবং গ) তা থেকে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির জমি তৈরি হয়।

যদিও উদারনীতিবাদীরা অনেকেই আশা করেছিলেন যে মানবাধিকারের ওপর গুরুত্ব বাড়ানোর মধ্য দিয়েই সামাজিক গোষ্ঠীগুলির দ্বন্দ্বের নিরসন হবে। জাতি, গোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ নির্বিশেষে সবার জন্য মৌলিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে পারলেই এই সমস্যাকে এড়ানো যাবে। আসল কথা হল, এর পিছনে যে মানসিকতা রয়েছে, তা হল, জাতি গোষ্ঠীরা আলাদা পরিচয়ের দাবিদার হতে পারে না, তাদের এই বিশেষ পরিচয়ের স্বীকৃতিও দেওয়া সম্ভব নয়। এ ভাবেই, সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীদের অধিকারের বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে মানবাধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বুঝিয়ে দেওয়া হয়, যেহেতু সবাই সমান অধিকারের অধিকারী, তাই আলাদা করে জাতিগোষ্ঠীর বিশেষ পরিচয়ের বিষয়টি নিয়ে দাবি বৈধ নয়।

এই নীতির অনুবর্তী হয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জ তাদের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা পত্র (Universal Declaration of Human Rights) থেকে জাতি গোষ্ঠীর ভিন্ন পরিচয়ের অধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় উল্লেখ ছেঁটে ফেলে।... এই নীতি পরিবর্তনকে উদারনীতিবাদীরা অনেকেই স্বাগত জানায়....।[১৫]

গণতন্ত্র ও সাম্যের প্রতিশ্রুতি পূরণের চেষ্টায় ১৯৪০ থেকেই সমাজতত্ত্বের চর্চায় সামাজিক ন্যায়ের ধারণার ওপর প্রবলভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। গবেষকরা সাম্য ও সামাজিক ন্যায়ের পরিধির বিস্তার ঘটাতে নিরন্তর প্রয়াস করেছেন। বিভিন্ন মডেল, প্রক্রিয়া ও

প্রতিষ্ঠান নির্মাণের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। বিশেষ করে নজর দেওয়া হয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রান্তিক অবস্থানে থাকা মানুষদের প্রতি।। এই মনোযোগ বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, এই প্রান্তিক মানুষদের বৈষম্য কমানোর উপর, যা কেইনসকে অনুসরণ করে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের (যা, আগেই যেমন বলা হয়েছে, আরেক ভগ্ন প্রতিশ্রুতি) সম্পদ পুনর্বন্টনের নীতির উপর নির্ভরশীল।

সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক সাম্য (যার ওপর সমাজতন্ত্রের অনেকাংশই ব্যয়িত) এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সাম্যের (যার ওপর সেরকম কাজই হয়নি) মধ্যে এই যে বিভাজন, এর ফলে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যেখানে উদারনৈতিক মতবাদের প্রতিশ্রুতিগুলোর অনেকটাই রক্ষিত হয়নি। এই বিভাজনের ফলে সত্যিকারের সমানাধিকারের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সবার সমানভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি। এর ফলে এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের দাবিতে মানুষকে বিকল্প রাজনৈতিক মঞ্চে জড়ো করার উৎসাহ জারিত হয়েছে।

সামাজিক ন্যায়ের আলোচনা, যা একসময় বন্টনের ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল, এখন তা ক্রমশই একদিকে পুনর্বন্টন, এবং অন্যদিকে পৃথক জাতিসত্ত্বা বা জাতিগোষ্ঠী পরিচিতি, এই দুই দাবির মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। এবং ক্রমশই জাতিপরিচয় বা জাতিধর্মকেন্দ্রিক পরিচিতির দাবিই জোরালো হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে দেখা যায়, সম্পদ পুনর্বন্টনের দাবি ক্রমশই আলোচনার কেন্দ্রস্থল থেকে সরে যাচ্ছে প্রান্তিক অবস্থানে।...[১৬]

এই পৃথক পরিচয়ের দাবিতে রাজনৈতিক পরিসরে দাবি আদায়ের জন্য মানুষকে সংঘবদ্ধ করার প্রবণতাই এখনকার রাজনীতির মুখ্য প্রবণতা হয়ে উঠছে। ন্যান্সি ফ্রেজার অবশ্য মনে করেন, সম্পদের পুনর্বন্টন ও পৃথক সত্তার পরিচয়, সামাজিক ন্যায়ের স্বার্থে দুটোই দরকার, একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা নয়। এ জন্য দরকার একটা দ্বিমাত্রিক ধারণার নির্মাণ, যা কিনা সামাজিক সাম্য ও পৃথক পরিচয়, দুটোকেই একত্রে জায়গা করে দিতে পারে।[১৮]

সামাজিক ন্যায়ের কোনও দাবিই কোনও না কোনও ধরণের প্রতিধিনিত্বমূলক ব্যবস্থার কথাকে অস্বীকার করতে পারে না। এই প্রতিনিধিত্বের মধ্যেই সম্পদ পুনর্বন্টন ও পৃথক পরিচয়ের দাবি নিহিত।[১৯]

উদারনৈতিক চিন্তাধারা থেকে সামাজিক ন্যায়ের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলি হারিয়ে যেতে শুরু করায় এবং সম্পদ পুনর্বন্টন ও পরিচয়কেন্দ্রিক দাবিকে এক করে দেখার প্রবণতা উদারনীতির উপর এমন একটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, যা থেকে মুক্তির উপায় ছিল না।

....কারণ, এখানে রাষ্ট্র ও শক্তিশালী বহুজাতিক শক্তির তরফে এমন একটা প্রক্রিয়া নেওয়া হল যা রাজনীতিকে ভুল পথে চালিত করে সামাজিক ন্যায়ের বদলে অবিচারকেই

প্রতিষ্ঠিত করল। এই প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক পরিসর তৈরিতে বাধা দিয়ে সবচেয়ে ক্ষতি করল তাদেরই, যাদের জন্য এই সাম্যের কথা বলা হচ্ছিল। [২০]

উদারনৈতিক তত্ত্বের মধ্যেকার এই দ্বিধা ও বিভাজন দূর করার কোনও সফল চেষ্টার নজির কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে চোখে পড়ে না। পৃথক পরিচয়ের দাবি থেকে এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য সামাজিক তত্ত্ব সৃষ্টি হয়নি, যা কিনা অবিচারের তিনটি দিকেরই গুরুত্ব খর্ব না করে একটা সমাধান বাতলাতে পারে। পৃথক পরিচয়ের এই দাবিকে ক্রমশই এখন উত্তরোত্তর জাতিসত্ত্বাকেন্দ্রিক, বা জাতি-ধর্মীয় পরিচয়কেন্দ্রিক হিসাবে দেখা হচ্ছে। যেমন, উত্তর আয়ারল্যান্ডে প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিকরা, লেবানন ও ফিলিপাইনসে মুসলমানরা, দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা-কালো, শ্রীলঙ্কায় তামিল ও সিংহলীরা। পূর্ব ইউরোপে এবং মধ্য এশিয়াতেও নানা স্তরে একই দাবি উঠছে। এই দাবিগুলির উৎস অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, ধর্মকেন্দ্রিক, জাতিগোষ্ঠী বা জাতপাত এবং ঐতিহাসিক সাযুজ্যের ভিত্তিতে। তা সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার, রাজনৈতিক পরিসর দখলের জন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, বা একই ধরণের রাজনৈতিক আকাঙ্খা প্রকাশে আগ্রহী ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তেমন কোনও প্রতিযোগিতা দেখা যায় না। যদি না তা ভিন্ন চরিত্রের সামাজিক গোষ্ঠী হয়।[২১]

যেমন, ভারতে পৃথক পরিচয় এবং পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের জন্য অসংখ্য দাবি উঠছে। ১৯৫০-১৯৭০ এর মধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভাষা পরিচয়ের দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন হয়েছে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে অসংখ্য জাতিসত্ত্বার পরিচয়কেন্দ্রিক আন্দোলন, উত্তর ভারতে দলিতদের উত্থান, উন্নয়নে অবহেলার প্রতিবাদে তেলেঙ্গানা, উত্তরাখন্ড, উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণ গুজরাতের আদিবাসী অঞ্চল এবং আগেকার মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী অধ্যুষিত ছত্তীশগঢ়, বা কর্নাটকের কুর্গের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন হয়েছে। ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকে ধর্ম ভিত্তিক আন্দোলন এবং দলিতদের উত্থানকে বাদ দিলে বাকি সবই পরিচয়কেন্দ্রিক আন্দোলন, যার সমাধান হিসাবে স্বশাসনের দাবি ওঠে।[২২]

এই সব দাবিগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে তাদের চার ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) আদিবাসীদের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিচয়ের রাজনীতি ঃ

এটা সম্ভবত, সম্পদের পুনর্বন্টন ও পরিচয়কেন্দ্রিক রাজনীতির মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ় সম্পর্কের রাজনীতি। ভারতে আদিবাসী পরিচয়কেন্দ্রিক আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ দেখা যায় — উত্তর-পূর্বাঞ্চল, মধ্যভারতের ছত্তীশগঢ়, ঝাড়খন্ড ও ওড়িশায়, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, এমনকি কেরল, তামিলনাড়ু ও কর্নাটকে। এইসব আদিবাসী সমাজের দাবিদাওয়ার প্রকাশের মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও রাষ্ট্রের সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি অভিন্ন।

খ) আঞ্চলিকতার রাজনীতি ঃ

পৃথক পৃথক অঞ্চলের স্বকীয়তার ও প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতির দাবিরও নানা ধরণের প্রকাশ হয়েছে। এই দাবি কখনও আদিবাসীকেন্দ্রিক, কখনও সামাজিক পরিচয়, বা অন্য কিছুকে কেন্দ্র করে উপস্থাপিত হয়। তবে রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে আঞ্চলিকতাবাদকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলেই গণ্য করা হয়। উত্তরাখন্ড, ওড়িশা, হিমাচলপ্রদেশ, এবং সম্প্রতি গুজরাত ও বিহারে প্রধানত উন্নয়নের দাবিতে, বা রাজ্যের আওতায় থাকা সম্পদের নিয়ন্ত্রণের দাবিতে আন্দোলন উল্লেখ্য। 'অনুন্নয়ন'কে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন কার্যত আর্থিক নীতির মিথ্যা প্রতিশ্রুতির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

গ) 'অপর'কে বাদ দেওয়ার মাধ্যমে নিজের স্বীকৃতি আদায়ের রাজনীতি ঃ

এই সব দাবি প্রায়শই সামাজিক-ধর্মীয় পরিচয় কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। এটাকে দেশ-নির্মাণের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক মনে করাও হয়। কিন্তু হেঁয়ালি মনে হলেও এটাই এখন জাতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় চালক। এই ধরণের রাজনীতিতে একটা বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর (ধরা যাক, হিন্দুত্ব) কল্পনা করা হয়, যার স্বীকৃতি আদায়ে অন্য সামাজিক গোষ্ঠীকে প্রান্তিকতায় ঠেলে দেওয়ার রাজনীতি করা হয়। উন্নয়নকেন্দ্রিক রাজনীতি ও পরিচয়কেন্দ্রিক রাজনীতির মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণে দেশের সমাজের একীভূত চেহারার পরিবর্তে একটা বিকল্প তৈরি হয়ে যায়। যে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীকে কোনও জনপ্রিয়তাবাদী দাবির ভিত্তিতে একসূত্রে গাঁথা যায়।

ঘ) প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্ব ও অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে স্বীকৃতি আদায়ের রাজনীতি ঃ

এই রাজনীতিতে উন্নয়নের দাবিতে রাষ্ট্রের সঙ্গে দর কষাকষির মাধ্যমে সমাজে দলিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি উপস্থাপিত হয়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা ও রাজস্থানে দলিতদের পরিচয়কে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন উঠছে, তা প্রধানত সামাজিক ন্যায়ের দাবিকে তুলে ধরছে। সমাজের গোষ্ঠীভিত্তিক এই আন্দোলন কার্যত 'অপর'কে বাদ দেওয়ার রাজনীতির পাল্টা চ্যালেঞ্জ।

এই সব কয়টি ধারার আন্দোলনের প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী খুব একটা স্বচ্ছ নয়। ভারতের রাষ্ট্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরণের দাবিকে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানোর দাবির সঙ্গে এক করে দেখতে চেয়েছে।[২৩] অথচ, অধুনা রাষ্ট্র আর্থিক বৈষম্যের প্রশ্নের মোকাবিলা করতেও ব্যর্থ।

আপাত দৃষ্টিতে যতটা মনে হয়, এই প্রক্রিয়ার অভিঘাত তার চাইতেও অনেক বেশি। দশকের পর দশক ধরে এইসব দাবিকে উপেক্ষা করে উদারনৈতিক রাজনীতি তার নিজেরই ভরা ডুবির ব্যবস্থা করেছে। জাতি গোষ্ঠী ও অন্য সামাজিক গোষ্ঠীর পরিচয় ও রাষ্ট্রের কাজে যথার্থ প্রতিনিধিত্বের দাবিকে উদারনৈতিক রাষ্ট্র যত বেশি দিন ধরে লঘু করে দেখেছে, ততই বিভিন্ন পরিচয়কেন্দ্রিক আন্দোলন আরও জোরালো স্বরে দেশের একমাত্রিক সমাজের ভাবনাকে আঘাত করে বিপন্ন করেছে। এই অবস্থায় এই পরিচয়কেন্দ্রিক রাজনীতি

সহজেই আরও বৃহত্তর কিন্তু উদারনীতির বিরোধী চিন্তার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ে হাত বাড়িয়ে দিলে আশ্চর্যের কিছু নেই। এই অন্য রাজনৈতিক চিন্তাই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি। এতেও আশ্চর্যের কিছু নেই যে এই দুই ধারার রাজনীতির ভাষার মধ্যে অনেক মিলও রয়েছে।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে ভারতীয় রাষ্ট্রে জাতীয় স্তরে একটি অভিন্ন সমাজের কল্পনা বহু ছোট বড় আঞ্চলিক সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিচয়কেন্দ্রিক সমাজের ধারণাকে মিশিয়ে তৈরি হয়েছে,[২৪] তাহলে সেই ভাবনা একই সঙ্গে জনপ্রিয়তাবাদী চেতনার মধ্যেও রয়েছে। যে কারণে দেশের যেসব অঞ্চলে পরিচয়কেন্দ্রিক রাজনীতি বেশি সক্রিয়, সেইসব জায়গাতেই জনপ্রিয়তাবাদের পতাকার তলায় ওইসব আন্দোলন এসে জড়ো হচ্ছে।

এই পরিণতি আমাদের একটা ধাঁধার সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

৩

উদারবাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ থেকে অনুদারবাদী গণতন্ত্র ঃ

উপরের আলোচনা থেকে উদারনীতিবাদে নিহিত স্বাধীনতা, সাম্য ও সামাজিক ন্যায় এবং সমসাময়িককালে ভারতে ও বহির্বিশ্বে জনপ্রিয়তাবাদের উত্থানের কারণ অনুসন্ধানে আরও গভীরে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে, জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে তা উদারনৈতিক রাজনীতিকে খারিজ করে দিয়েছে। বরং, ভারতে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির মূলে রয়েছে উদারনৈতিক রাজনীতির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের হতাশা। ফলে, জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির স্লোগানে উদারনীতিবাদের মূলতত্ত্ব, অর্থাৎ, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সাম্য সহজেই স্থান করে নেয়। বাস্তবে তা কিছুটা বক্রোক্তি হিসাবে আসুক না কেন।

একই ভাবে দেশের সমাজের বৈচিত্র্যকে অগ্রাহ্য করে দেশকে 'এক জাতি এক প্রাণ' হিসাবে দেখার আকাঙ্খাও জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির গভীরে প্রোথিত। যেহেতু উদারনৈতিক রাজনীতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পরিচয়ের স্বীকৃতি ও সামাজিক ন্যায়ের দাবি মেটাতে ব্যর্থ, তাই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির তরফে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়ের দাবি মেটানোর আশ্বাস সহজেই ওইসব আন্দোলনকে আকৃষ্ট করতে পারে। উদারনৈতিক চিন্তায় এইসব দাবিকে নিছক অর্থনৈতিক সাম্য আনার চেষ্টার মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি তাদের সেই বন্ধন দশা থেকে মুক্ত করে সামাজিক শ্রেণী ও স্তর বিন্যাসের ঊর্ধে সবার জন্য সাম্যের অধিকারের দাবি তুলল।

উদারনীতির গণতন্ত্র নয়া উদারনৈতিক চিন্তা ধারার দিকে ঝুঁকে পড়ার পরই উদারনীতির রাজনীতির বুলিসর্বস্বতা বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে

নয়া উদারনীতিবাদী রাজনীতিতেও সমাজে বৈষম্য দূর করার কোনও প্রবণতা দেখা না যাওয়ায় সাধারণ মানুষ এবার বিকল্পের সন্ধান শুরু করে। সমাজকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অপূর্ণ থাকায় যে শূণ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, জনপ্রিয়তাবাদ সেই শূণ্যস্থানপূরণ করতে হাজির হল। মনে রাখতে হবে, ভারতে ও বিশ্বের অন্যত্র উদারনৈতিক চিন্তাধারা সমাজে যে গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নির্মাণ করেছিল, জনপ্রিয়তাবাদ সেগুলিই ব্যবহার করে তাদের কার্যসিদ্ধি করতে চাইল। এই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব না থাকলে জনপ্রিয়তাবাদের রাজনীতির পক্ষেও সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে তাদের পতাকার তলায় জড়ো করা কঠিন হত।

ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা বর্তমান, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এটা উদারনৈতিক চিন্তাধারার বিশেষ অবদান। কিন্তু উদারনৈতিক রাজনীতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি জনপ্রিয়তাবাদ ছিনিয়ে নেওয়ার ফলে গণতন্ত্রের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও হারিয়ে যেতে বসেছে। এর পরিণতি, ভারতে গণতন্ত্র থাকলেও তা ক্রমশই এখন অনুদারবাদী মতাদর্শ চালিত হয়ে পড়ছে।

অনুবাদক ঃ সাম্যব্রত দাস

Reference

1. Bethan McKernan. 'From Reformer to 'New Sultan': Erdogan's Populist Evolution' in The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2019/mar/11/from-reformer-to-new-sultan-erdogans-populist-evolution, accessed on 01 August 2019.
2. 2See Emil Husted. 'From Creation to Amplification: Occupy Wall Street's Transition into an Online Populist Movement' in Julie Uldam and Anne Vestergaard (eds.) Civic Engagement and Social Media: Political Participation Beyond Protest, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillian, 2015, pp. 153-173; and, Joe Lowndes and Dorian Warren, 'Occupy Wall Street: A Twenty-First Century Populist Movement?' in Dissent, https://www.dissentmagazine.org/online_articles/occupy-wall-street-a-twenty-first-century-populist-movement, accessed on 04 August 2019. Also see
3. See Jan-Werner Müller, What Is Populism?, Philadelphia: University Of Pennsylvania Press, 2016, chapter 1.
4. Chantal Mouffe, The Democratic Paradox, London: Verso, 2000, pp. 2-3.
5. Jan Werner Müller, What is Populism, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016, p. ?.
6. Ibid.
7. The complex process of discursive consensus about the tools of economic equality, its critiques and shift to the neoliberal consensus is beyond the space and scope of this paper. Suffice it to note that the promissory notes of the new liberal order did contain a large measure of such policies.
8. Parthapratim Pal and Jayati Ghosh, Inequality in India: A survey of recent trends, DESA Working Paper No. 45 ST/ESA/2007/DWP/45, New York: UN Department of Economic and Social Affairs, 2007, p. 1,
9. Madhura Swaminathan and Vikas Rawal, 'Is India Really a Country of Low Income-Inequality?: Observations from Eight Villages' in Review of Agrarian Studies, vol. 1, no. 1, 2011, pp. 19-21, available at http://ras.org.in/is_india_really_a_country_of_low_income_inequality _observations _from _eight _ villages, accessed on 09 August 2019.

10. M. Niaz Asadullah, Gaston Yalonetzky, Inequality of Educational Opportunity in India: Changes over Time and across States, Discussion Paper No. 5146, Bonn: Forschungsinstitut zurZukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor, 2010, pp. 25-26, available at http://ftp.iza.org/dp5146.pdf, accessed on 10 August 2019.

11. D. N. Dhanagare, 'Declining credibility of the neoliberal state and agrarian crisis in India: some observations; in B. B. Mohanty, ed., Critical Perspectives on Agrarian Transition: India in the global debate, Abingdon, Oxon: Routledge, 2016, p. 161.

12. Babu P. Remesh, 'Informal Work in the Formal Sector: Conceptualizing the Changing Role of the State in India' in Ernesto Noronha &PremillaD'Cruz, eds., Critical Perspectives on Work and Employment in Globalizing India, Singapore: Springer, p. 84.

13. Ronald Labonté& David Stuckler, 'The rise of neoliberalism: how bad economics imperils health and what to do about it' in Journal of Epidemiology and Community Health, vol. 70. no. 3, Mar 2016, pp. 312-318.

14. Rama V. Baru&Malu Mohan. 'Globalisation and neoliberalism as structural drivers of health inequities' in Health Research Policy and Systems, vol. 16, no. 1, Suppl. 1, October 2019, pp 91 (1-29), https://doi.org/10.1186/s12961-018-0365-2

15. Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford: Clarendon Press, 1995, pp. 2-3.

16. Nancy Fraser, 'Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation' in Nancy Fraser and Axel Honneth, Redistribution or Recognition?: A Political-Philosophical Exchange, (Translated by Joel Galb, James Ingram, and Christiane Wilke) London: Verso, 2003, pp.7-8.

17. For instance, Charles Taylor,Multiculturalism and The Politics of Recognition, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992, Charles Taylor, Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, Princeton University Press, 1994 and Bhiku Parikh, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, Basingstoke, Hampshire & London: Macmillan, 2000, amongst others.

18. Nancy Fraser, 'Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation' in Nancy Fraser and Axel Honneth, Redistribution or Recognition?: A Political-Philosophical Exchange, (Translated by Joel Galb, James Ingram, and Christiane Wilke) London: Verso, 2003, pp.10-11.

19. Nancy Fraser, Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World, New York, Columbia University Press, 2009, P.21

20. Nancy Fraser, Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World, New York, Columbia University Press, 2009, P.21

21. While some of the Left movements ib many parts of South Asia may not qualify for such a description, their being restricted to certain geographical pockets in the country would indicate that the question of identity is not totally irrelevant.

22. For a more detailed discussion of the classification and its relation to liberal theory, See Amit Prakash 'The Democratic Story of Twin Challenges to Governance: Identity Needs and Developmental Needs' in Ranabir Samaddar and Suhit K. Sen, eds., New Subjects and New Governance in India, New Delhi: Routledge, 2012, pp. 13-68.

23. See Amit Prakash, Jharkhand: Politics of Development and Identity, New Delhi: Orient-Longman, 2001; and, Amit Prakash, 'Politics, Development and Identity: Jharkhand: 1991-2009' in Daniel J. Rycroft & Sangeeta Dasgupta, eds., The Politics of Belonging in India: Becoming Adivasi, London: Routledge, 2011, pp. 175-89.

24. Partha Chatterjee, The Nation and its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993. Also see Amit Prakash, 'Contested Discourses: Politics of Ethnic Identity and Autonomy in the Jharkhand Region of India' in Alternatives: Global, Local, Political, vol. 24 no. 4, 1999, pp. 461-96 for application of the argument to regional, recognitive politics; in this instance, Jharkhand.

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র এবং পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় লোকবাদের প্রকৃতি

মইদুল ইসলাম

> "[B]y 'populism' we do not understand a type of movement—identifiable with either a special social base or a particular ideological orientation—but a political logic."—Ernesto Laclau[1]

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আলোচনায় 'লোকবাদ' শব্দটি প্রায়শই নিন্দাসূচক অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে বিগত বেশ কয়েক দশকে রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রধান পন্ডিতবর্গদের মধ্যে অনেকেই লোকবাদ বা জনপ্রিয়তাবাদ নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে লোকবাদ হল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মের একটি নিয়ন্ত্রক নীতি, একটি আবশ্যিক রাজনৈতিক যুক্তি এবং প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের একমাত্র বাস্তবিক রাজনৈতিক রণনীতি। রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক আন্দোলন, মতাদর্শগত বিশ্বাসের ভিন্নতা সত্ত্বেও লোকবাদী রীতিকে গ্রহণ করে এবং লোকবাদী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে স্পষ্টতা দিয়ে ভিন্ন ধরণের জনসাধারণ এবং বিসমজাতীয় জনসংখ্যার মধ্যে নানাধর্মী বর্গ, শ্রেণী এবং গোষ্ঠীকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একজোট করার চেষ্টা করে। এই নিবন্ধে, তত্ত্বের নিরিখে বুঝতে চেষ্টা করা হবে যে 'পপুলিজম' বা 'লোকবাদ', প্রতিনিধিমূলক রাজনীতি ও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রেও একটি দৃঢ় বিশ্লেষণাত্বক ধারণা যা 'রাষ্ট্রীয় লোকবাদ' সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় মুল্যায়ণ করা হবে যে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূলের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কীভাবে পরিচালিত হয়। সেই রাজ্য পরিচালনা আসলে একটি লোকবাদী রাজনীতির ফসল যার প্রধানতম ঝোঁক হল দলকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সমাগমের তুলনায় নেতা-নেত্রী কেন্দ্রিক রাজনৈতিক সমাবেশ। 'জনপ্রিয়' এবং 'জনপ্রিয়তাবাদ' এই দুটি শব্দকে উত্তর-মার্কসবাদী রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, আর্নেস্তো লাকলাউ যে অর্থে ব্যবহার করেছেন তাঁর বিভিন্ন প্রভাবশালী কাজে, ঠিক সেই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। সংক্ষেপে

বললে এটি হতভাগ্য, অবহেলিত, অসহায় এবং লাঞ্ছিতদের নিয়ে সমতুল্যের যুক্তির ভিত্তিতে গড়া একটি আধিপত্যবাদী রাজনৈতিক নির্মাণ যা চূড়ান্ত দ্বন্দ্বমূলক বা বৈরিতার সঙ্গে অন্য একটি আধিপত্যবাদী ক্ষমতা গোষ্ঠীকে চ্যালেঞ্জ করে। লাকলাউ পর্যবেক্ষণ করেছেন যে ''লোকবাদের ক্ষেত্রে বিভেদের কাঁটাতার সমাজকে দুটি শিবিরে বিভক্ত করে। সেক্ষেত্রে 'জনতা' সমাজের সামগ্রিক সদস্যদের থেকে কিছু কম; যারা বৈধ সামগ্রিকতা সাধনের উদ্দেশ্যে আংশিক উপাদান হিসাবে কাজ করে।''[২] এই ব্যাখ্যার নিরিখেই 'জনতা' শব্দটি লাকলাউ-র তাত্ত্বিক ধারণার্থে ব্যবহার করা হয়েছে, যা সাধারণ অর্থের থেকে আলাদা। গতানুগতিক রাজনৈতিক প্রকরণে 'জনসংখ্যা' আর 'জনতা' বা 'জনগণ' সমতুল্য নয়। লাকলাউ তীক্ষ্ণ ভাবে চিহ্নিত করেছেন, প্রথাগত পরিভাষায় জনগণ (ইংরেজিতে 'পিপল') নামক শব্দকে সাধারণ ভাষায় অনুবাদ করলে পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়। জনতা অর্থে ধরা হয় 'পপুলাস', সমস্ত জনসমাজের দেহ/অংশ অথবা প্লেবস অর্থাৎ জনসংখ্যার 'অনগ্রসর অংশ'।[৩] লাকলাউ 'জনতা' এবং 'লোকবাদ' নিয়ে বলছেন ''লোকবাদের ক্ষেত্রে জনতা আসলে এক প্লেবস যারা বৈধভাবে জনপ্রিয়তা দাবি করে; জনসমাজের সম্পূর্ণ অংশ হিসাবে ক্রিয়াশীল হতে চায়।''[৪] কারণ জনসংখ্যার যে অংশ (এক্ষেত্রে ক্ষমতাধর) অনগ্রসর/বঞ্চিত মানুষের অবহেলিত অবস্থার জন্য দায়ী তারা ঐ একই গোষ্ঠীর (এ ক্ষেত্রে 'জনতা'/'জনগণ' এর) বৈধ অংশ হতে পারে না। তার কারণ প্লেবস জনসংখ্যার বাকি অংশের (ক্ষমতাধরদের) প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। সেই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী আসলে ক্ষমতার জোট এবং তাই অনগ্রসর, অবহেলিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত এবং অত্যাচারিত মানুষের সঙ্গে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মধ্যেকার ফাটল 'অপূরণীয়'।[৫]

পরিবর্তন এবং তৃণমূলের রাজনৈতিক ক্ষমতার উত্থান ঃ

২০১১ সালে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে, তৃণমূল 'পরিবর্তন' (সরকার বদলের) স্লোগান তুলে দুর্দান্ত জয় পেয়েছিল। ২০১১ সালে তৃণমূল তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে নিম্নলিখিত বার্তা দিয়েছিল ঃ

> ''পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বিগত প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে বামফ্রন্ট এমন একটি সরকার পরিচালনা করে চলেছে, যে সরকার চূড়ান্ত অপদার্থতার এক অভূতপূর্ব নজির রেখেছে এবং সাধারণ মানুষকে আইনের শাসনের নামে অতল অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছে। এরই প্রেক্ষাপটে আমাদের রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন। মা-মাটি-মানুষ আর সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-নেতাই সহ রাজ্যের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা-সেলাম-প্রণাম জানিয়ে আবেদন জানাই, গণতন্ত্র- ধর্মনিরপেক্ষতা-উন্নয়ন ও প্রগতির পথে বাংলার স্বার্থে পরিবর্তন আনুক বাংলার জনগণ। আসুক এক সুন্দর সকাল, মানুষ নিয়ে আসুক পরিবর্তনের ভোর। এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার জনগণের কাছে আশীর্বাদ-দোয়া প্রার্থনা করছে, এবার বাংলায় আনুন পরিবর্তন''।[৬]

২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে, ২০০৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্টের জনসমর্থন হ্রাস এবং ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের পরাজয় তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এই জয়লাভ বাংলায় জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনের পরের ঘটনা। বামফ্রন্ট সরকার ২০০৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে কর্পোরেট চালিত শিল্প বিকাশের জন্য আগ্রাসী জমি অধিগ্রহনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। ২০০৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের স্লোগান ছিল 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'। সেই ধরণের স্লোগান রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে কার্যত পুনর্গঠনে উদ্যোগী হয়েছিল যার সাথে বামফ্রন্টের অভ্যন্তরে বিরাজনীতিকরণ ও জনগণের সঙ্গে তাদের বিচ্ছিন্নকরনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। 'শ্রেণী' প্রেক্ষিতকে হারিয়ে ফেলে তাদের ভাবনা চালিত হল মূলত বড় কর্পোরেট পুঁজি চালিত শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে। বিরাজনীতিকরণ প্রতিফলিত হয়েছিল বাম দলের সম্মতিকরণের রাজনৈতিক অভ্যাসের মধ্য দিয়ে। তারা প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলি করতে অবহেলা করেছিল যে 'কী ধরণের শিল্প ও কার স্বার্থে'? এর ফল হয় যে মতাদর্শগত সংগ্রামের অভাবের ফলে কেবলমাত্র কর্পোরেট নেতৃত্বাধীন শিল্পায়নের সমর্থন ছাড়া কোনও বিকল্প পথের সন্ধান ছিল না অন্তত বাংলার বৃহত্তম কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে। এহেন পরিস্থিতিতে জনসাধারণ এক ঐতিহাসিক বিদ্রুপের সম্মুখীন হল যে সেই একই বামফ্রন্ট সরকার যারা বামফ্রন্ট শাসনের শেষ দশকে কৃষিজীবীদের জমি, জীবনজীবিকা এবং কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতি থেকে দখলচ্যুত করে কর্পোরেট শিল্প ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করল, তারাই কিন্তু বামফ্রন্ট শাসনের প্রথম দশকে ভূমি সংস্কারের নামে 'অপারেশন বর্গা' বাস্তবায়িত করা এবং জনসাধারণের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টন করেছিল। বামফ্রণ্ট সরকারের জমি ছিনিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত দলের অভ্যন্তরে ও বৃহত্তর জনসমাজে ওই বাম দলের প্রতি অশ্রদ্ধা তৈরী করেছিল। বামফ্রন্ট সরকারের দমনমূলক কৌশল জনসাধারণের মধ্যে একটি প্রতারিত হওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি করে যা অত্যন্ত গভীর অভিঘাত রূপে প্রকাশিত হয় সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের মর্মান্তিক ঘটনায়।

যাইহোক, কেন বাংলার জনগণ ২০০৬ সালে বিধানসভা ভোটে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে রায় দিয়েও তার কিছু বছরের মধ্যে ঐ একই জনগণ ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত ভোট, ২০০৯ সালের লোকসভা ভোট এবং ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে কর্পোরেট চালিত উন্নয়নের বিপক্ষে রায় দিয়েছিল? বামেদের বিরুদ্ধে এই লোকপ্রিয় রায় রাতারাতি হয়নি। বহুদিনের ধামাচাপা পড়া অন্যায়ের শিকার ও অবহেলিত হওয়ার উপলব্ধি থেকে সেই রায় দিয়েছিল জনগণ। জনসাধারণের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি এবং জাতি ও সম্প্রদায় সংক্রান্ত অধিকারের প্রশ্নগুলিকে বহুক্ষেত্রে বামফ্রন্ট ধারাবাহিক ভাবেই এড়িয়ে গিয়েছিল। ২০১১-র জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গ — বিদ্যুৎ ব্যবহারে, নলবাহী পানীয় জল ব্যবহারে, ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ায় এবং টেলিভিশন ব্যবহারের খতিয়ানে জাতীয় গড়ের নিচে অবস্থান করছিল। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভারতের রাজ্যগুলোর তুলনায় মাঝামাঝি অবস্থানে ছিল, ৩৪ বছরের দীর্ঘ বামফ্রন্ট

রাজত্বের পরেও। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো উন্নতি সংক্রান্ত অপূর্ণ গণতান্ত্রিক দাবিগুলি সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামের জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে জনরোষে পরিণত হয়ে সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের নির্বাচনী পরাজয় ঘটালো। এইখানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে, বামফ্রন্ট, সুনির্দিষ্ট ও গঠনমূলক কিছু পরিবর্তন আনতে পেরেছিল যা গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য সহায়ক ছিল। বামেরা শ্রমজীবী ও কৃষক শ্রেণীর মানুষের প্রাথমিক বস্তুগত জীবনযাত্রার মানকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। বিকেন্দ্রীভূত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বামেরা ভূমি সংস্কার ও পঞ্চায়েতি রাজকে কার্যত একটি সদর্থক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিল যা প্রথাগতভাবে গ্রামীণ প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের ক্ষমতায়নের দিকে নজর দেয়। এই ধরণের রাজনীতি বাম শাসন ব্যবস্থার বিস্তৃতি ও সেই শাসনপ্রণালীকে মজবুত করে সাড়ে তিন দশক টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল। তবে বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম দশকে পুনর্বণ্টনকেন্দ্রিক কৃষি সংস্কার এবং স্থানীয় প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিকে পরবর্তীকালে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল 'দল সমাজ', যেখানে বামফ্রন্ট, গ্রামাঞ্চলের স্কুল শিক্ষক এবং তাদের মোড়ল মার্কা নিয়ন্ত্রণের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।[৭] ২০০৮ সাল থেকে বামফ্রন্ট গ্রামীণ দরিদ্র, তফসিলি জাতি, আদিবাসী ও মুসলমানদের সমর্থন হারাতে শুরু করেছিল। 'জনগণ' এর সক্রিয়তা ও গঠনমূলক চরিত্র বোঝার ক্ষেত্রে বামেদের সৃজনশীল কল্পনাশক্তির অভাবের কারণেই উপরোক্ত দূর্বল অংশটির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি সমাধানে অক্ষম হয়।

বামপন্থী রাজনীতির ব্যাকরণে 'জনগণ' সর্বদাই শ্রেণী সম্পর্কের ভিত্তিতেই বর্ণিত হয়েছে। বামপন্থীরা গভীরভাবে অনুধাবন করেনি যে প্রান্তিক পরিচয়ের গোষ্ঠীগুলোর আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের গণতান্ত্রিক দাবি পূরণ করার কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দেওয়া অন্যতম প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল। অথচ তার পরিবর্তে অত্যধিক মাত্রায় প্রতিনিধিত্ব পাওয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্চবর্ণের 'ভদ্রলোক' (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য-রা) বাম দলের বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্বের ভূমিকায় অথবা আইনসভা ও মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হিসেবে বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রিসভায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল।[৮] এই 'ভদ্রলোক' বামপন্থী নেতৃত্ব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাংস্কৃতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত বামপন্থী আন্দোলনের মৌলিক শ্রেণীদের থেকে যথা খেটে খাওয়া শ্রমিক ও কৃষকদের থেকে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বামফ্রন্ট নেতৃত্বের সঙ্গে বাংলার শ্রমিক-কৃষকের সাংস্কৃতিক দূরত্ব থাকার ফলে বামফ্রন্টের রাজনৈতিক পতনের সম্ভাবনা বরাবর ছিল। মৌলিক শ্রেণীর সঙ্গে বামফ্রন্ট নেতৃত্বের সাংস্কৃতিক দূরত্ব আরও বাড়ে ২০০৬-২০১১ সময়কালে যখন কর্পোরেট শিল্পায়নের প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে উদ্ধত বামফ্রন্ট নেতৃত্ব বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়। ওই সময়কালে বামফ্রন্টের রাজনৈতিক সংকট গভীর হয় যা ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে বারবার প্রমাণিত।

২০১১ সালে তৃণমূল 'পরিবর্তন' নামক স্লোগান তুলে ক্ষমতায় আসল। কিন্তু সেই 'পরিবর্তন' স্লোগানটি লাকলাউয়ের রাজনৈতিক তত্ত্বের ভাষায় একটি 'এম্পটি

সিগনিফায়ার' যা অনেকগুলো অপূর্ণ গণতান্ত্রিক দাবিকে সমতুল্যতার যুক্তির নিরিখে একসঙ্গে বাঁধে ক্ষমতাসীন পক্ষের বিরুদ্ধে।[৯] এক্ষেত্রে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের জনগোষ্ঠীর বেশ কিছু অনগ্রসর অংশ যেমন দলিত, আদিবাসী, মুসলিম এবং দরিদ্রদের তাৎপর্যপূর্ণ অংশকে একত্র করতে পেরেছিল। বাংলার বুদ্ধিজীবি মহলের একাংশও 'পরিবর্তনের' স্লোগানকে সমর্থন জানিয়েছিল। বাংলায় সরকার পরিবর্তন বিষয়টি যদি কেউ লাকলাউ এর রাজনৈতিক তত্ত্বের নিরিখে আলোচনা করে তাহলে ১৯৭৭ সালে, 'গণতন্ত্র' নামক স্লোগান ছিল একটি 'এম্পটি সিগনিফায়ার' যা দলকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সমাবেশের মধ্যে সফল হয়েছিল। বামফ্রন্ট শাসনে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তাঁর সময়পর্বে ভূমি সংস্কার বা পঞ্চায়েতি রাজের থেকেও গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সব থকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। বিপরীতে, ২০১১ সালে 'পরিবর্তন' স্লোগান ছিল একটি 'এম্পটি সিগনিফায়ার' যা কিন্তু দলকেন্দ্রিক সমাবেশের তুলনায় একটি নেতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সমাবেশের মধ্যে সফল হয়। কিন্তু ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সাফল্য লাভ করে তৃণমূল তার শাসন কীভাবে বজায় রাখছে?

তৃণমূল এবং ২০১১ পরবর্তী নির্বাচনী চিত্র ঃ

২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে, লোকসভা নির্বাচনে প্রথম বারের জন্য চারটি প্রধান রাজনৈতিক শক্তি;বামফ্রন্ট, তৃণমূল, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং বিজেপি ৪২টি লোকসভা আসনে পৃথক ভাবে লড়াই করেছিল।[১০] সেই নির্বাচনে, তৃণমূল ৩৯.৭৯% ভোট পেয়েছিল, বামফ্রন্ট পেয়েছিল ২৯.৯৫% ভোট, বিজেপি পেয়েছিল ১৭.০২% ভোট এবং কংগ্রেস পায় ৯.৬৯% ভোট।[১১] ওই নির্বাচনে, পশ্চিমবঙ্গে, বামফ্রন্ট ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ২০১৪ সালের নির্বাচনে বাংলায় তৃণমূল ও বিজেপি, ভোটের অঙ্কে লাভবান অবস্থায় ছিল ২০০৯ সালের লোকসভা আর ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায়। কোনো বড় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ না হয়েই তৃণমূল সফল হয়েছিল আঞ্চলিক কর্মসূচীর জোরে।[১২]

সেন্টার ফর স্টাডি অফ ডেভেলপিং সোসাইটির (সি এস ডি এস) লোকনীতি প্রোগ্রামের জাতীয় নির্বাচনী সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস সমাজের সমস্ত স্তরের সমর্থন পেয়েছিল, বিশেষ করে ৪২% মহিলা ওই দলকে ভোট দিয়েছিল। অন্যদিকে বামেদের ভোট, সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠী; বিষেশত দলিত, আদিবাসী এবং মুসলমানদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছিল। ওই তিন গোষ্ঠীর পাশাপাশি দরিদ্র মানুষ ব্যপক সংখ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক প্রচারাভিযান চালানোর ফলে দক্ষিণবঙ্গের মুসলমান ভোটারদের তৃণমূল আকৃষ্ট করেছিল।[১৩] ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পক্ষে দরিদ্র ও মুসলমানদের সমর্থন বৃদ্ধির প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। সেন্টার ফর স্টাডি অফ ডেভেলপিং সোসাইটির (সি এস ডি এস) নির্বাচন পরবর্তী তথ্য অনুসারে

তৃণমূল কংগ্রেস ২০০৬ সালে দরিদ্র মানুষের সমর্থন ২১% থেকে বাড়িয়ে ২০১৬ সালে ৫২ শতাংশে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার তাৎপর্যপূর্ণ অংশ মুসলমান। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবাংলায় ২৭.১% মুসলমান বাস করে। তিনটি প্রাথমিক বিষয় ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ১) পরিচয় (ধর্ম চর্চার স্বাধীনতা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব উৎযাপন, সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান পরিচালনার স্বাধীনতা), ২) সুরক্ষা (সাম্প্রদায়িক সংঘাত থেকে রেহাই বা বিমুক্তি), এবং ৩) সাম্যভাব (আয়, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, জনসামগ্রী অভিগমনের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ)। ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে সাচার রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের আর্থসামাজিক অবস্থার চিত্র পরিস্ফুট হয়। বাংলায় মুসলমান সম্প্রদায়, মূলত শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং সরকারি চাকুরীতে পিছিয়ে ছিল।

বামফ্রন্ট আমলে যদিও মুসলমানদের পরিচয় ও সুরক্ষার বিষয়গুলি তুলনামূলকভাবে বেশি সম্বোধন করা হয়েছিল, মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রে সাম্যের প্রশ্নটি উপেক্ষা করা হয়েছিল। সেই কারণে সংখ্যালঘু মুসলমানরা ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকে বামফ্রন্ট থেকে তৃণমূলের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। ২০০৯-এর শেষের দিকে রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্ট (প্রাথমিকভাবে ২০০৭ সালে রচিত) ভারতীয় সংসদে উপস্থিত করা হয়েছিল যাতে অ-সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনগ্রসর মুসলমানদের জন্য ১০% আসন সংরক্ষণ এবং সরকারি চাকুরিতে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের জন্য ১০% সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়েছিল। ২০১০ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যারা অন্তত সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মিশ্র কমিশনের প্রস্তাবনা বাস্তবায়িত করেছিল।

বিগত কিছু বছরে, বাংলায় তৃণমূল নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পিছিয়ে পড়া জাতিগুলিকে রাজ্য ওবিসি তালিকাভুক্ত করেছে। এইভাবে তৃণমূল নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর দুটি পৃথক তালিকা; ওবিসি-এ (অধিক অনগ্রসর বিভাগে, যারা উচ্চতর শিক্ষা ও চাকরিতে ১০% সংরক্ষণ পাবে) এবং ওবিসি-বি (অনগ্রসর বিভাগ, যারা উচ্চতর শিক্ষা ও চাকরিতে ৭% সংরক্ষণ পাবে) কে প্রশস্ত করে। ২০০৪-২০০৫ সালে বাংলায় মোট মুসলমান জনসংখ্যার মাত্র ২.৪% মানুষ, সর্বমোট ৯টি মুসলমান গোষ্ঠী, রাজ্য ওবিসি তালিকায় স্থান পেয়েছিল। ২০১৭ সাল নাগাদ, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত ১৭৪টি ওবিসি বর্ণের মধ্যে ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে রাজ্যের মোট মুসলমান জনসংখ্যার ১১৫টি মুসলমান জাত যা প্রায় রাজ্যের মুসলমান জনসংখ্যার ৯০% মানুষ। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য ওবিসি-এ ও ওবিসি-বি সংরক্ষণ প্রাপ্য। হিন্দু ও মুসলমান জাতির মধ্যে উচ্চ বর্ণেরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। ওবিসি তালিকার এই সম্প্রসারণ নিঃসন্দেহে মুসলমানদের জন্য শিক্ষাগত এবং চাকরির সুযোগগুলিকে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করেছে। তৃণমূল শাসনকালে রাজ্য

সরকারের কর্ম নিযুক্তিতে মুসলমান প্রতিনিধিত্ব বাড়ছে ধীরে অথচ অবিচল ভাবে। ২০০৬ এর সাচার রিপোর্টে রাজ্য সরকারের চাকরিতে মুসলমান প্রতিনিধিত্ব গড়ে ৩.৪% ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কর্মচারী গণনা রিপোর্ট (২০১৬) অনুযায়ী রাজ্যে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা ৫.৭৩%। অর্থাৎ এক দশকে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা রাজ্যে এক দশকে ২.৩% বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনগ্রসর গোষ্ঠীর সংরক্ষণ নীতির পাশাপাশি তৃণমূল নেতৃত্বাধীন সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হল দরিদ্র ও কৃষক সমাজের জন্য কল্যাণমূলক নীতি গ্রহণ। বাংলায় গরিব ও কৃষকদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হল দলিত, আদিবাসী এবং মুসলিম। ২০০৬-২০১১ সময়কালের সপ্তম এবং শেষ বামফ্রন্ট সরকারের তুলনায় ২০১৬ সালে দ্বিতীয় তৃণমূল জমানায় রাজ্য মন্ত্রিসভায় রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের মাপকাঠিতে দলিত, আদিবাসী, মুসলমান এবং মহিলাদের সংখ্যা বেড়েছে। উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য রাজ্যে তৃণমূলের সংহতিকরণের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু উপাদানকে অস্বীকার করা যাবে না। তাই, মুসলমানদের মধ্যে থেকে তৃণমূলের পক্ষে সমর্থন ২০০৬ সালে ২২% থেকে বেড়ে ২০১১ সালে ৩৫%, ২০১৪ সালে ৪০% এবং ২০১৬ সালে ৫১% হয়েছে।[১৪] এই সমর্থনের হার সম্প্রতি ২০১৯ সালে সিএসডিএস-এর লোকসভা নির্বাচনের ভোট পরবর্তী সমীক্ষা অনুসারে ৭০% হয়েছে।

২০১১র পরে, তৃণমূল নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার দরিদ্রদের বিভিন্ন ধরণের সহায়তা দেওয়া শুরু করে যার মধ্যে চারটি কল্যাণমূলক প্রকল্প ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে ঃ খাদ্যসাথী (চাল ও গম ২টাকা প্রতি কেজি), সবুজ সাথী (স্কুল ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে সাইকেল বিতরণ), কন্যাশ্রী (ছাত্রীদের শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক প্রেরণা) এবং যুবশ্রী (বেকার যুবকদের আর্থিক সহায়তা)। গ্রাম বাংলায় উপস্থিত কৃষি সংকট ও কৃষক ঋণ এর আবহে এই ধরণের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি শক্তিশালীরূপে সহায়ক হওয়ায় তৃণমূলের গ্রামীণ সমর্থনের ভিত্তি মজবুত হয়েছে। যে রাজ্যে ৮২% পরিবারের সর্বাধিক উপার্জনকারী সদস্যের মাসিক আয় ৫ হাজার টাকা,[১৫] সেখানে কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি রাজ্যের মানুষের কাছে এক বিরাট প্রাপ্তি। তার সঙ্গে নন-কর্পোরেট পুঁজি, শ্রমিকদের বিশাল সংরক্ষিত বাহিনী নিয়ে গঠিত বেকার ও অর্ধ-বেকার এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের এক তাৎপর্যপূর্ণ অংশকে তৃণমূল সাফল্যের সঙ্গে পরিচালন করতে সক্ষম হয়েছে।

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সিএসডিএস-এর ভোট পরবর্তী সমীক্ষা বলছে যে বামফ্রন্টের তুলনায় তৃণমূল নেতৃত্বাধীন সরকার তিনটি দিক দিয়ে বেশি ভালো কাজ করেছে; সড়কের অবস্থা, বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং পানীয় জলের সরবরাহ।[১৬] এমনকি কিছু ভোটারের মতে, তৃণমূল নেতৃত্বাধীন সরকার বামফ্রন্ট শাসনের তুলনায় বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত হলেও, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য তৃণমূলকে সমর্থন করে বিপুল সংখ্যার ভোটার।[১৭] মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা রাজ্যে ভোটারদের গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে বাড়ে এবং তা মহিলাদের মধ্যে আরও বৃদ্ধি পায়। ২০১৬ সালের বিধানসভা

নির্বাচনে মহিলাদের মধ্যে তৃণমূলের সমর্থন হয় ৪৮%। এইসব কারণসমূহ তৃণমূলের সংহতিকরণ ও একত্রীকরণে সাহায্য করেছে।[১৮] অর্থাৎ ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের জনপ্রিয় স্লোগান; 'জনগণের ক্ষমতা, তাই বাংলায় চাই মমতা' যেখানে নেত্রীর নাম ও ব্যক্তিত্ব একই সঙ্গে 'এম্পটি সিগনিফায়ার' রূপে ব্যাপক সফল হয়েছিল।

আজ তৃণমূল এমন একটি নেতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল যারা ১৯৯৮-২০০৬ সালের সময় পর্বে বিজেপির নৈকট্যে থাকাকালীন মূলত মধ্য-দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক কর্মসূচীর প্রচারক ছিল। ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তীকালে, বিশেষ করে সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় থেকে তৃণমূলের কর্মসূচী মূলত একটি মধ্য-বামপন্থী লোকবাদী রাজনৈতিক ভাষ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল। এস ই জেড ও জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নে তৃণমূলের হাত তুলে নেওয়া নীতি, খুচরো ব্যবসায় সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগে বিরোধিতা করা ও নোটবন্দীর বিরোধিতা করা ইঙ্গিত দেয় যে দলটি অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগী। কেন্দ্রের বেশ কিছু সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা, যেমন ব্যাংক সঞ্চয় পরিকল্পনায় সুদের হার কমানো, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি, এম এন আর ই জি এ (একশো দিনের কাজের প্রকল্প) ও বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে টাকা বন্টনে বিলম্ব হওয়ার বিরোধিতা করা এবং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার আহ্বান পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের আকর্ষিত করেছিল। তদুপরি, রোহিঙ্গা সঙ্কট সম্পর্কে তৃণমূলের সমবেদনাপূর্ণ অবস্থান, আসামে এনআরসি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করা প্রকৃতপক্ষে মোদী নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টির দক্ষিণপন্থী লোকবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে একটি স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ জবাব। ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে ভারতে বসবাসকারী ভারতীয় মুসলমানদের বিদেশী বলে প্রচার করা এবং সেই সূত্রে জাতি-বিদ্বেষ রাজনীতির তুলনায় তৃণমূলের রাজনীতি একটি বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একধরণের মধ্য-বামপন্থী লোকবাদী রাজনৈতিক কার্যক্রম, যা একদিকে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করতে সচেষ্ট আর অন্যদিকে জাত-ধর্ম নির্বিশেষে দরিদ্রদের জন্য ব্যাপক বণ্টনমূলক নীতি প্রণয়ন করতে উদ্যত।

যদিও ২০১৪ এবং ২০১৯-র লোকসভা নির্বাচনে, তৃণমূলবিরোধী বামফ্রন্ট সমর্থকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ বিজেপির শিবিরে ভিড়ে ছিল, ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকে তৃণমূলও, বামফ্রন্টের আস্থাশীল পুরোনো ভোটারদের এবং সমর্থকদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে। তার তিনটি মুখ্য কারণ। প্রথমত, আঞ্চলিকতার ইস্যুতে, বামফ্রন্টের তুলনায় তৃণমূল অনেক বেশি বাংলা কেন্দ্রিক। অপর দিকে বামেদের অন্যান্য ঘাঁটি যথা কেরালা ও ত্রিপুরার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক কৌশলগত বিষয়ে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, যা অনেক সময় পরস্পরবিরোধী। দ্বিতীয়ত, তৃণমূলের সাংগঠনিক স্তরে সাবল্টার্ণ বা প্রান্তিক মানুষের উপস্থিতি বামফ্রন্টের তুলনায় বেশি। বামফ্রন্ট জমানায়, বাম নেতৃত্ব মূলত ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বিপরীতে, তৃণমূলের বিভিন্ন সাংগঠনিক হর্তা-কর্তা এবং উচ্চস্তরের নেতৃত্বের মধ্যে অনেকে

নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসার ফলে তাদের পক্ষে গরিব মানুষকে তৃণমূলের পতাকার তলে নিয়ে আসতে সুবিধা হয়েছে। পরিশেষে, তৃণমূল মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্র যা 'রাজনৈতিক সমাজের'[১৯] অন্তর্গত মানুষদের দাবি রক্ষার্থে বামফ্রন্টের তুলনায় অধিক পটু। বামফ্রন্টের মূল চালিকাশক্তি আজও সংখ্যায় অনেক কম সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী ও ইউনিয়ন।

তৃণমূল ও রাষ্ট্রীয় লোকবাদের রাজনৈতিক যুক্তি ঃ

২০১১ পরবর্তী সময়ে তৃণমূলের নির্বাচনী সাফল্যের ভিত্তি ছিল কল্যাণমূলক নীতি ও উন্নয়নের উদ্যোগ যার ফলে বাংলার বিভিন্ন অনগ্রসর গোষ্ঠী তৃণমূলকে সমর্থন জুগিয়েছে। এই কল্যাণমূলক পরিকল্পনাগুলি প্রায়শই তৃণমূল নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের প্রধান কাজ হিসাবে জনগণকে স্বস্তি প্রদানের পাশাপাশি বন্টনমূলক উপযোগিতাকে কাজে লাগানো হয়েছিল যাতে নির্বাচনে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। এমনকি এই প্রকল্পগুলি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের (স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প) উপরে নির্ভরশীল না থেকে নিজস্ব স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প চালু করা হয়েছে যা রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার উন্নয়ন বিভাগের অর্থানূকুল্যের উপর নির্ভরশীল। জনকল্যানমূলক এই প্রকল্পগুলি 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকার বা জনগণের সরকারের সক্রিয় নীতির অংশ হিসাবে প্রচার করা হয়। বামফ্রন্ট জমানার প্রথম দিকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বর্ণনা করা হত একটি জনপ্রিয় এবং লোকবাদী স্লোগানকে সামনে রেখে। সেই স্লোগানের নাম ছিল 'বামফ্রন্ট সরকার, সংগ্রামের হাতিয়ার, বামফ্রন্ট সরকার, জনগণের সরকার'। 'বামফ্রন্ট সরকার, সংগ্রামের হাতিয়ার' বা 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকারের মতো জনপ্রিয় স্লোগান লোকবাদী প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে জনসাধারণকে নির্বাচিত সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে না। বরং তা নির্বাচিত সরকারকে বাড়তি বিশ্বাসযোগ্যতা ও বৈধতা দেয়।

কিন্তু কেবলমাত্র জনপ্রিয় স্লোগানের উপরে নির্ভর করে তৃণমূল রাজ্য পরিচালনা করতে পারে না। দলটিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিতর্কের পরিবেশে কাজ করতে হয়, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ঘটে চলা বেশ কিছু আন্দোলন, দলের কিছু নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ যেমন চিট ফান্ড (সারদা ও রোজ ভ্যালি) সংক্রান্ত অভিযোগ, নারদা স্টিং অপারেশন ভিডিও, প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষার দুর্নীতির অভিযোগ ইত্যাদি। নিকট অতীতে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারকে ভাঙড়ের জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনের সম্মুখে পড়তে হয় যেখানে জমি হারানোদের জন্য পুনর্বাসন ও ভালো ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত দাবি ছিল এবং ২০১৯ লোকসভা ভোটের একদম পরেই ডাক্তারদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কীভাবে এই আন্দোলনগুলি মোকাবিলা করেছিল তা আলোচনার আগে আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে বিভিন্ন রাজনৈতিক যুক্তিগুলিকে যা লোকবাদী রাজনীতির পক্ষে সহায়ক হয়।

লোকবাদের তত্ত্বকে বিশদে বর্ণনা করতে লাকলাউ তাঁর প্রথম বইয়ে প্রাথমিক ভাবে সমাজতান্ত্রিক লোকবাদের বৈপ্লবিক ধরণটির (যা রাষ্ট্রকে দমিয়ে রাখতে চায়) সঙ্গে অন্য

ধরণের লোকবাদী ঝোঁক যেমন ফ্যাসিবাদ, বোনাপার্টিজম, পেরোনিজম (যারা রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ককে দমায় না) এর একটা মৌলিক পার্থক্য দেখিয়েছিলেন। লাকলাউ তাঁর বইয়ে ব্যাখা করেছেন,

> "[P]opular resistance exerts itself against a power external and opposed to 'the people'– that is to say– keep it in italics. This is in the original text of Laclau. The same was also quoted in my paper. Why did you make such changes? the resolution of 'the people'/power bloc contradiction can only consist in the suppression of the State as an antagonistic force with respect to the people. Therefore, the only social sector which can aspire to the full development of 'the people'/power bloc contradiction, that is to say, *to the highest and most radical form of populism*, is that whose class interests lead it to the suppression of the State as an antagonistic force. *In socialism– therefore– coincide the highest form of 'populism' and the resolution of the ultimate and most radical of class conflicts*. The dialectic between 'the people' and classes finds here the final moment of its unity; there is no socialism without populism, and the highest forms of populism can only be socialist. This is the profound intuition present from Mao to Togliatti in all those trends within Marxism which, from very diverse political positions and cultural traditions, have tried to go beyond class reductionism."[21]

সমাজতান্ত্রিক লোকবাদের উপরোক্ত ধারণার সঙ্গে তুলনায় কম বৈপ্লবিক লোকবাদী প্রবণতাকে লাকলাউ ব্যাখ্যা করছেন নিম্নোক্ত কথাগুলো বলে ঃ

> "The dialectic between the people and classes leads...to different forms of articulation. The feature common to them all is that populist radicalisation of democratic interpellations must be linked to a connotative domain of such a kind as to contain the antagonism implicit in popular-democratic interpellations within the limits necessary for the confrontation of the new dominant class with the traditional power bloc. We already know how this neutralisation was achieved in the case of fascism; popular interpellations were linked to contents such as racism and corporativism which obstructed their radicalisation in a socialist direction. We also know that the maintenance of these limits necessitates a high degree of ideological homogenisation which was made possible only by repression. Hence

the 'totalitarian' character of fascism. In the case of Bonapartist regimes—such as Peronism—the method of neutralisation was different: it consisted essentially in allowing the persistence of various 'elites' which based their support of the regime upon antagonistic articulating projects, and in confirming state power as a mediating force between them."[22]

পরবর্তীতে তাঁর আরও পরিণত তাত্ত্বিক মূল্যায়নের বয়ানে লাকলাউ বলেছিলেন, লোকবাদ একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটা বৃহত্তর জনসমাবেশ গঠন করা সম্ভব। সেদিক থেকে লোকবাদ বা জনপ্রিয়তাবাদ হল জনতা বা জনগণের একটা ধারণা গঠন করার রাজনৈতিক কৌশল যা ক্ষমতার বিপরীতে থাকবে এবং ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী, স্বার্থ, সরকার বা দলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। লোকবাদ এমন একটি জনসমাগমের রাজনৈতিক কৌশল যা বিভিন্ন রকমের শ্রেণী, গোষ্ঠী, জাত, লিঙ্গ, ভাষার মানুষকে একত্রিত করতে সক্ষম। তাই দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী মতাদর্শের রাজনীতি নির্বিশেষে লোকবাদ হয়। লোকবাদ ছাড়া বড় রাজনৈতিক সমর্থন যে কোনও দল বা আন্দোলনের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়। তাই লাকলাউ লোকবাদকে রাজনীতির একটি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য যুক্তি হিসেবে দেখেন। কোনও বিশেষ ধরণের আন্দোলন, দল বা মতাদর্শ হিসেবে নয়। তাই রাজনীতি থাকলে লোকবাদও থাকবে। রাজনীতির সঙ্গে জনপ্রিয়তাবাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।[২৩] লাকলাউ নির্দিষ্ট করে বলেছেন,

"[A] demand which initially is perhaps only a request. If the demand is satisfied, that is the end of the matter; but if it is not. People can start to perceive…equally unsatisfied demands... If the situation remains unchanged for some time, there is an accumulation of unfulfilled demands and an increasing inability of the institutional system to absorb them in a differential way (each in isolation from others), and an *equivalential* relation is established between them. The result could easily be, if it is not circumvented by external factors, a widening chasm separating the institutional system from the people. So we have here the formation of an internal frontier, a dichotomization of the local political spectrum through the emergence of an equivalential chain of unsatisfied demands. The *requests* are turning into *claims*. We will call a demand which, satisfied or not, remains isolated a *democratic demand*. A plurality of demands which, through their equivalential articulation, constitute a broader social subjectivity we will call *popular demands*—they start, at a very incipient level, to constitute the 'people' as a potential historical actor. Here we have, in embryo, a populist configuration."[24]

লাকলাউ যে কোনো দাবিকে গণতান্ত্রিক দাবি বলে চিহ্নিত করেন। কারণ, দাবি কোনও একটি অসহায় ও অবহেলিত মানুষ করছেন একটি বিশেষ মুহূর্তে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী

ব্যক্তি বা শাসকের কাছে। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক দাবি বা দাবিসমূহকে অন্যান্য দাবিগুলোর থেকে আলাদা করে গ্রাস বা পূরণ করার সামর্থ্য রাখে ক্ষমতার বৃত্ত। কিন্তু অনেকগুলো অপূর্ণ দাবিকে একত্রিত করা ও সামঞ্জস্য রূপ দেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একটি জনপ্রিয় দাবি বা জনপ্রিয় দাবিসমূহে পরিণত হয়। তাই জনপ্রিয় দাবি ক্ষমতার বৃত্তকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। গণতান্ত্রিক দাবি আর জনপ্রিয় দাবির প্রধান তারতম্য হল প্রথমটি ক্ষমতাসীন বৃত্ত পূরণ করার সামর্থ্য রাখে, আর দ্বিতীয়টি ক্ষমতাসীনকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবার সামর্থ্য রাখে।[২৫]

গণতান্ত্রিক দাবির সঙ্গে লাকলাউ 'বিভিন্নতার যুক্তি'র যোগ দেখেন যেখানে ক্ষমতাসীন বৃত্ত গণতান্ত্রিক দাবিকে অন্য আরও কিছু গণতান্ত্রিক দাবির থেকে আলাদা করে পূরণ করতে পারে। অন্য দিকে জনপ্রিয় দাবির সঙ্গে লাকলাউ 'সমানতার যুক্তি'র যোগ দেখেন যেখানে অনেকগুলো অপূর্ণ দাবিসমূহকে সমতা ও তুল্যতার বেষ্টনীতে বেঁধে কিছু অপূর্ণ দাবির মধ্যে একটি সংহতি তৈরী হয় ক্ষমতাসীন বৃত্তের বিরুদ্ধে। সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে জনগণ বা জনতার উন্মেষ হয় একটি সমষ্টিগত বা যৌথ রাজনৈতিক চালিকাশক্তি হিসেবে। এই জনগণ কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা শ্রেণীর দ্বারা গঠিত নয়। বরং বিভিন্ন গোষ্ঠীর অনেক মানুষের দাবিকে সামনে রেখে একটা জনসমষ্টি। অনেকগুলো অপূর্ণ গণতান্ত্রিক দাবি একযোগে যখন একটি জনপ্রিয় দাবির রূপ নেয় সেই জনপ্রিয় দাবিকে একটি বলিষ্ঠ জনপ্রিয়তাবাদী শক্তিতে উত্তরণের ক্ষেত্রে অনেক সময় জনপ্রিয় স্লোগান, জনপ্রিয় রাজনৈতিক ধারণা (গণতন্ত্র, সমতা, ন্যায়, শান্তি, সম্প্রীতি, ইত্যাদি) অথবা কোনো নেতা বা নেত্রী এবং তাঁর নাম বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

তাত্ত্বিক দিক থেকে লাকলাউ গণতান্ত্রিক ও জনপ্রিয় দাবির মধ্যে পার্থক্য করছেন মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। যা আরও পরিষ্কার হচ্ছে যখন উনি বলছেন "democratic demands were inherently bourgeoisie– and essentially linked to the establishment of 'liberal and democratic' regimes. Different from the bourgeoisie and democratic demands were the socialist ones, which involved transcending capitalist society and corresponded to a more advanced stage of historical development…So the main distinction was between socialist and democratic demands; the inscription of the latter within bourgeoisie hegemony and the establishment of a liberal state were taken for granted."[26]

সেই কারণে লাকলাউ 'গণতান্ত্রিক দাবি' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করছেন, 'নির্দিষ্ট দাবি' শব্দবন্ধটি উচ্চারণ না করে। যে মানদণ্ডে তিনি 'গণতান্ত্রিক দাবি' শব্দবন্ধটি ব্যবহারের পক্ষপাতী সেগুলি তার ভাষায় এই রকম (1) 'these demands are formulated to the system by an underdog of sorts—that there is an equalitarian dimension implicit in them; (2) that their very emergence presupposes some kind of exclusion or deprivation' to what Laclau calls 'deficient being'।[২৭] তাই লাকলাউ স্পষ্ট করে বলেছেন "a fulfilled demand ceases to be a demand. It is

only the lack of fulfilment—which can oscillate between downright rejection and just 'being in the balance' — that gives a demand materiality and discursive presence" – which makes the qualification of any demand being 'democratic'।[২৮]

সেই কারণে, জনগণের সনদে দাবি দাওয়া পূর্বনির্ধারিত হয় যা 'বহুত্ববাদী দাবির সমতুল্য', আবার গণতান্ত্রিক দাবি কোনঠাসা হতে পারে ওই একই সমানুপাতিক প্রক্রিয়ায়। তবে, এই গণতান্ত্রিক দাবি একটি পূর্ণাঙ্গ দাবি ব্যাতীত আর কিছুই নয় যা অন্যান্য দাবির সঙ্গে সমানুপাতিক সম্পর্কে প্রবেশ করতে পারে না। যা অন্য ভাবে বলা যায় যে একটি এমন দাবি যা বিছিন্ন থাকে না এবং পৃথক প্রাতিষ্ঠানিক সামগ্রিকতায় গঠিত।[২৯] লাকলাউ-এর মতে সামাজিক গঠন দুটি ভাবে হতে পারে 'Either through the assertion of a particularity…a particularity of demands — whose only links to other particularities are of a differential nature…or through a partial surrender of particularity, stressing what all particularities have, equivalentially, in common'।[৩০]

সামাজিক গঠনের দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একটি বিরোধী সীমা টানা প্রয়োজন, যেখানে জনগণ ও ক্ষমতার বৃত্ত একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। লাকলাউ সামাজিক গঠনের এই পদ্ধতিকে বলছেন 'সমতুল্যতার যুক্তি' বা 'সমানতার যুক্তি'। সামাজিক গঠনের প্রথম পদ্ধতি, লাকলাউ যাকে 'পার্থক্যের যুক্তি' অথবা 'বিভিন্নতার যুক্তির' বলছেন, সেক্ষেত্রে বিরোধী সীমান্ত প্রয়োজন হয় না কারণ সেই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক দাবি বা দাবিসমূহকে ক্ষমতার বৃত্তপূরণ করতে পারে।[৩১] সুতরাং লাকলাউ-এর মতে 'লোকবাদের ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হচ্ছে বিভিন্নতার যুক্তির তুলনায় সমতুল্যতার যুক্তির বিস্তৃতি'।[৩২] যদিও, পার্থক্য ও সমতুল্যতার যুক্তি একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী বা দ্বন্দ্বমূলক, কিন্তু তারা দুজনেই একে ওপরকে ছাড়া চলতে পারে না। সেজন্য লাকলাউ বলছেন ঃ 'They inhabit the space of a tension between mutually related dimensions…an equivalential chain can weaken the particularism of their links – but cannot do away with it altogether. It is because a particular demand is unfulfilled that with other unfulfilled demands a solidarity is established – so that without the active presence of the particularism of the link – there would be no equivalential chain.'[৩৩] তাই সমতুল্যতার যুক্তি লোকবাদের পক্ষে আদর্শ যুক্তি। তৃণমূল শাসনকালে কিভাবে সমতুল্যতা ও পার্থক্যের যুক্তি পরিচালিত হয়? এই বিষয়টি সুনির্দিষ্ট উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করা হবে।

২০১৩ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি, সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারিটি ফাঁস হয়। যারা আমানতকারী, তারা অধিকাংশ দরিদ্র ছিলেন। দরিদ্রেরা এমন এক সময় প্রকল্পে অর্থ জমা করছেন, যখন দেশে নবউদারবাদী সংস্কারের পর ব্যাংকে সুদের হার ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। তদুপরি পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি রাজ্য যেখানে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ব্যঙ্কের পরিষেবা জাতীয় গড়ের থেকে কম ছিল। ২০১৩ সালের ১৯ এপ্রিল,

পুঁজি প্রকল্প বন্ধ করার প্রতিবাদে ৩ হাজারের বেশি এজেন্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন আবরোধ করেছিলেন।[৩৪] তৃণমূলের তৎকালীন নেতা মুকুল রায়ের সঙ্গে আলোচনায় কোনো সুরাহা না হবার ফলে এজেন্টরা সেই প্রতিবাদ করেছিলেন। আলোক চৌধুরী নামে এক ব্যক্তির নীচে বহু এজেন্ট ছিলেন এবং তার কাছে এজেন্টদের ৬৫ কোটি টাকার তহবিল ছিল। সেই বিরাট পরিমান টাকা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে (সারদা কেলেঙ্কারির মূলপান্ডা)। আলোক চৌধুরীর কথায়, ‘‘সরকারের সমর্থন পাওয়া যাবে, (মুকুল) রায়ের এই আশ্বাসবাণী নির্ভরযোগ্য মনে হয়নি কারণ তা ফাঁপা বুলি বলে মনে হয়েছিল। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিচার চাইব। যেহেতু রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান নিয়ম বিরুদ্ধ তাই আমরা তাঁর বাড়িকেই বেছে নিয়েছিলাম।’’[৩৫] একই ভাবে ২৩ এপ্রিল ২০১৩ দিনটিতে কমপক্ষে তিন হাজার এজেন্ট এবং বিনিয়োগকারীরা মধ্য কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জড়ো হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীটের বাসভবনের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য। তবে মাঝেই ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পুলিশ তাদের থামিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দিকে রওনা দেওয়া আরো ৬০০-৭০০ এজেন্টকে হাজরায় থামানো হয়েছিল।[৩৬] সরকার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ২০১৩-র এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে বিচারপতি শ্যামল সেন কমিশন গঠন করেছিল। কমিশন কেবল ৩,৯৯,৯৮২ আমানতকারী বা ১৭ লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে মাত্র ২৩% আবেদনকারীর টাকা চেক মারফৎ ফেরত দিয়েছিল যারা সারদাতে দশ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম টাকা জমা রেখেছিলেন। এই পদক্ষেপটি পার্থক্যের যুক্তির নিকটবর্তী ছিল যার দ্বারা গণতান্ত্রিক দাবিগুলি কিছুটা হলেও পূরণ হয়েছিল এবং সর্বাধিক অভাবী বিনিয়োগকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। তবে সারদা কেলেঙ্কারির মূল অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা ও সমস্ত আমানতকারীদের অর্থ ফিরিয়ে দেবার লক্ষ্যে পৌছনোর আগেই কমিশন, ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই তার কাজ বন্ধ করে দেয়।[৩৭]

সংবাদপত্র এবং টেলিভিশনের খবর অনুযায়ী, মমতা বন্দোপাধ্যায় স্বয়ং সারদা গ্রুপের সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যনেলের বেশ কিছু অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কিছু রিপোর্টে এটাও বলা হয় যে সারদা ট্যুর এবং ট্রাভেল প্রাইভেট লিমিটেড কোনও ব্যাঙ্ক গ্যারেন্টি ছাড়া বা সুরক্ষা আমানত জমা না রেখেই ভারতীয় রেলের ক্যাটারিং এবং ট্যুরিজিম সংস্থ্ঞ্জার (আই আর সি টি সি) বরাত পেয়েছে।[৩৮] ২০১০ সালে, সারদা যখন আই আর সি টি সি-র চুক্তি পকেটস্থ করে সেই সময়কালে ২০০৯ সালের জুন মাস থেকে ২০১১ সালের মে মাস পর্যন্ত ইউ পি এ-দুই সরকারের রেলমন্ত্রী ছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। যার ফলে বিরোধী পক্ষ কংগ্রেস, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে।[৩৯] প্রশ্ন ওঠে, কীভাবে একটি লোকসানে চলা সারদার মতো কোম্পানি কোনো সুরক্ষা অর্থ জমা না রেখে রেলের এজেন্ট হবার স্বত্ত্বাধিকার পেল।[৪০]

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির এই জাতীয় অভিযোগ সত্ত্বেও, সারদা কেলেঙ্কারিতে অর্থ হারানো এজেন্ট এবং বিনিয়োগকারীদের কিছু অংশ মনে করে যে ‘দিদি’ (আক্ষরিক

অর্থে বড় বোন, বাংলার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী) তাদের টাকা ফেরত দিতে পারেন। উপরে উল্লেখিত এজেন্টদের কথা থেকে স্পষ্ট যে আর্থিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই ন্যায় বিচার দিতে পারেন। তাঁর বিনয়ী জীবনযাপন, পারিবারিক পটভূমি ও লড়াইয়ের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে 'দিদি'র প্রতি মানুষের আস্থা আসে। দিদির দলের নেতারা জেলে থাকা সত্ত্বেও বা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিবিআইএর তদন্তের জন্য কিছুদিনের জন্য হাজত বাস করলেও দিদির প্রতি বাংলার মানুষের বিশ্বাস অটল থেকেছে। চিট ফান্ডের ধ্বসের বিষয় নতুন ছিল না। এমনকি বামফ্রন্টের শাসনকালে অনুরূপ চিট তহবিল কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়েছিল।

তবে, অনুরূপ সংকটকালে ক্ষতিগ্রস্থ বিনিয়োগকারীরা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে টাকা ফিরে পাওয়ার শেষ আশা বলে মনে করেনি। বরং তারা মনে করেছিল সরকার সম্মিলিত সংস্থা হিসেবে টাকা ফিরে পাওয়ার জন্য সাহায্য করতে পারে। এই বিষয়টির ক্ষেত্রে ধারণাগত একটা বদল লক্ষ্যনীয় যে জনগণের প্রতিবিধানের চালিকাশক্তি আজ বাংলায়, সরকারের মতো একটি সম্মিলিত সত্তা-র থেকে একক ব্যক্তির প্রতি মানুষ আস্থাশীল হয়েছে। গত কয়েক বছরে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেছেন সরাসরি মন্ত্রক ও আমলাতন্ত্রের সমন্বয়ে দারিদ্র দূরীকরণ ও অন্যান্য সামাজিক এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন করতে। বিগত কয়েক বছরে, প্রতিটি বড় রাজনৈতিক সমাবেশ, দলীয় সভা এবং সরকারি সভাগুলিতে প্রধান আকর্ষণ হলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

একক নেতার উপরে এই বিশ্বাসই তৃণমূল কংগ্রেসের স্থিতিশীল এবং অবিরত রাজনৈতিক জনসমাগমের স্তম্ভ, যা এমনকী, ১৯৯৮ সালের জানুয়ারী থেকে ২০১১ সালের মে পর্যন্ত তারা যখন বিরোধী পার্টি তখনও জারি ছিল। বাংলায় ক্ষমতায় আসার পাঁচ বছর পর, ২০১৬ সালের নির্বাচনী সফরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যে বিধানসভার ২৯৪টি আসনের প্রার্থীই তিনি। বার্তাটি ভোটারদের কাছে স্পষ্ট ছিল। তিনি স্পষ্টভাবে এটাই প্রচার করতে চান যে সারদা কেলেঙ্কারি, নারদা স্টিং ভিডিও এবং টেট পরীক্ষার যাবতীয় দুর্নীতির অভিযোগ দলের কিছু নেতা-মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে নয়। সুতরাং যদি ভোটাররা দুর্নীতির জন্য তাঁর পার্টির উপর অসন্তুষ্ট হন, তারা যেন মনে রাখেন যে তিনি একজন সৎ এবং পরিশ্রমী কর্মী যিনি সবসময় তাঁর ভোটারদের স্বার্থের কথা ভাবেন। অন্যভাবে বললে, ২৯৪ জন তৃণমূল প্রার্থী বিধানসভা ভোটে দাঁড়ালেও আসলে তিনিই সব কেন্দ্রের প্রার্থী; এবং ভোটাররা ২৯৪টি কেন্দ্রেই বকলমে তাঁকে যেন ভোট দিচ্ছেন বলে ভাবেন। অতএব, বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে, ভোটাররা কিছু তৃণমূল প্রার্থীদের অযোগ্যতা ও দুর্নীতির অভিযোগকে যেন উপেক্ষা করেন তাঁর মুখ দেখে। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে গেল, ৪৫% ভোট পেয়ে এবং দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে (২৯৪ এর মধ্যে ২১১টি আসন) তাঁরা জয়ী হলেন। সারদা, নারদা এবং টেট দুর্নীতির অভিযোগ নির্বাচনে তেমন ছাপ ফেলল না। বহু রাজনৈতিক পণ্ডিতরা

এই জনাদেশকে মমতার জনপ্রিয়তার নিরিখে দেখেছেন। কিন্তু সেই সমস্ত রাজনৈতিক বিজ্ঞজনেরা যে বিষয়টি তেমন আলোচনা করেন নি তা হল রাজনৈতিক সমাবেশের ক্ষেত্রে মমতা একটি ভিন্ন, স্বতন্ত্র এবং বিশেষ ভাষা ব্যবহার করছেন যা স্বাধীনোত্তর বাংলার সমগ্র ইতিহাস পর্বে আগে কেউ উচ্চারণ করেনি। রাজ্য নির্বাচনের প্রতিটি কেন্দ্রে নিজেকে একক প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা; রাজ্য রাজনীতির একটি নতুন ভাষ্য। ১৯৫২ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত কোনো নির্বাচনেই, কেউ একটি দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে না, যেখানে কোনো মুখ্যমন্ত্রী, প্রার্থী বা কোনো প্রধান রাজনৈতিক নেতা, বিধানসভার প্রতিটি কেন্দ্রে নিজেকে প্রার্থী হিসেবে উপস্থাপিত করেছে। সংক্ষেপে বলা যায় 'মমতা' নামটি সমতুল্যতার যুক্তিতে এম্পটি সিগনিফায়ারের অর্থ বহন করে, যদিও এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি ক্ষমতাবৃত্তের অংশ।

২০১৭ সালে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়ে পাওয়ার গ্রিড প্রকল্পের কাজে প্রতিবাদ করেন কৃষকরা। এই প্রতিবাদ জাতীয় এবং স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষন করে; বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, পরিবেশ সংরক্ষণকারী মঞ্চ, অতি-বাম রাজনৈতিক দল এবং বাংলার বামফ্রন্টের সমর্থন পায়। প্রথমে, রাজ্য সরকার দমনমূলক পদক্ষেপ নেয়, পাঁচ জন মারা যান, আর আহত হন বহুজন। বহু আলাপ আলোচনার পর জট খোলে। তৃণমূলের হস্তক্ষেপে রাজ্য সরকার বিক্ষোভকারীদের প্রধান দাবিগুলি মেনে নেয়। সিদ্ধান্ত হয়, ১৬টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাওয়ারের পরিবর্তে, কেন্দ্রীয় সরকারের পাওয়ার গ্রিড করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (পি জি সি আই এল) মাত্র ৪টি টাওয়ার নির্মাণ করবে। একটি ইংরেজি সংবাদ প্রতিবেদন অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলিকে নিম্নলিখিত রূপে ব্যাখ্যা করেছে [T]he power lines will run underground instead of crisscrossing through the sky. The government has also agreed to increase the amount of compensation which will be awarded to people who will lose their land due to the project. The government has agreed to shell out an extra Rs 12 crore for compensating the villagers' beside the already paid amount of Rs 1 crore by PGCIL as compensation to the villagers.[41] ঐ সংবাদ প্রতিবেদনের মতে ভাঙড় আন্দোলনের পরিসমাপ্তিটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরাট সাফল্য হিসাবে দেখা হয় যেখানে তিনি নিজের মানব দরদী, দরিদ্রদরদী এবং কৃষকদরদী ভাবমূর্তির সঙ্গে কোনো আপোষ না করে প্রকল্পটিকে বোর্ডের কাছে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন।[৪২]

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে আন্দোলন সমাধানে রাজ্য সরকারের এই হস্তক্ষেপ গণতান্ত্রিক দাবি পূরণের ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্য ভাবে বলতে গেলে, রাজ্য সরকার পার্থক্যের রাজনীতির যুক্তিতে ক্ষুব্ধ কৃষক জনতার গণতান্ত্রিক দাবিকে পূরণ করতে সমর্থ হয়েছিল। ভাঙড় আন্দোলনটি ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি। বরং ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রটি (যা যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত) থাকায়, যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের জয়ের ব্যবধান, ২০১৪ সালের লোকসভা

নির্বাচনের থেকে বেড়েছিল। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করে বলা যায় ভাঙড় বিক্ষোভ কিন্তু জনপ্রিয় কৃষক আন্দোলন হয়ে উঠতে পারেনি।

চিট ফান্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং ভাঙড় আন্দোলনের পরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশ হবার পর ২০১৯এর জুন মাসে ডাক্তারদের আন্দোলনের দিকে। ঘটনার কালক্রমিক বিবরণ এক ইংরেজি সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী কিছুটা এইরকম ঃ

> 'The junior doctors of the Nil Ratan Sircar Medical College in Kolkata went on a strike on 11th June 201/– a day after allegedly assaulted by the relatives of a deceased patient following allegations of medical negligence. One of the doctors received serious skull injuries. The agitation spread from NRS to all medical colleges of the State. It snowballed into a major pan India movement with the medical fraternity – like Indian Medical Association SIMAV and doctors at AIIMS – supporting the agitation. The IMA's one-day strike call…brought OPD services to a halt in all government and private hospitals in the country. Resident doctors at AIIMS had also threatened to go an indefinite cease work if demands of agitating doctors of Bengal were not met. The stir spiralled into a full blown crisis when Banerjee threatened stringent action against agitating doctors if they failed to resume work by 2 pm on June 13. She maintained that outsiders were involved in the movement and pointed out that the Essential Services Maintenance Act ESMA could be imposed. It was then senior doctors across state run hospitals joined in and started submitting resignations en masse. Over 500 senior doctors had resigned…Civil society lent its support too…The West Bengal government had been criticised by the Centre and the Union Home Ministry issuing an advisory. The Governor – K N Tripathi too urged Banerjee to find a solution.'[৪৩]

একই সংবাদপত্রের খবরের ভিত্তিতে ধর্মঘটের অবসান ঘটানো চিকিৎসকদের দাবির গ্রহণযোগ্যতার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

> "Subsequently – the State Government softened down. The agitating doctors were assured that there would be no police action. Hectic parleys were carried out between agitators and the State government representatives. Agitators finally agreed to meet Banerjee at a venue of her choice but maintained that meetings will be held in the presence of media. After initial reluctance – the State government agreed to the conditions – finally signalling that a resolution was round the corner. As many as 31 junior doctors

(28 representing the 14-odd medical college and hospitals of the State and three other representatives) met the Chief Minister at the State secretariat for a nearly two hour long on camera meeting. Banerjee – unconditionally – accepted all demands. She assured them of steps like getting police protection at hospitals – a grievance redressal system – having helplines – and also restricting entry of persons in government hospitals especially with patients…Meanwhile – celebration began at NRS – epicentre of the protests with students shouting victory slogans. "We are calling off the cease work and will resume work soon. We are thankful to the medical fraternity and the common people for extending their support to us –' a statement by the agitating doctors – issued late in the evening – said. 'The CM is in agreement that doctors cannot be assaulted at any cost –' a spokesperson of the doctors added…Apart from the issue of safety– doctors pointed out to the political pressure on junior doctors to give priority treatment – clearing confusion over scope of State welfare schemes relating to treatment and other grievances relating to doctor intimidation and police inaction in this regard."[44]

চিট ফান্ডের কবলে পড়া দরিদ্র মানুষের ক্ষতিপূরণ, ভাঙড় আন্দোলনের কৃষকদের বাড়তি ক্ষতিপূরণ এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের দাবির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সবকটি ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকতার নিয়মে উক্ত আন্দোলনগুলোর গণতান্ত্রিক দাবি অনেকটা মেটানো হয়েছে। সুতরাং সরকার বিরোধী আন্দোলন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠলেও বা উপরে উল্লিখিত আন্দোলনের প্রতি কিছু মানুষ সমর্থন ও সংহতি জানালেও তৃণমূল নেতৃত্বাধীন সরকারের শীর্ষ নেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিক্ষুব্ধ এলাকার আম ভোটারদের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো সমতুল্যতার যুক্তির ভিত্তিতে একটি জনরোষ গড়তে দেননি। অন্যান্য প্রান্তিক ও বঞ্চিত গোষ্ঠীগুলির আন্দোলনের মধ্যে একটি সমানুপাতিক শৃঙ্খলার অভাবের ফলে সরকার বিরোধী একটি শক্তিশালী বিকল্প 'জনগণ' নির্মাণ পশ্চিমবঙ্গে হল না। ক্ষমতার বিপরীতে বিকল্প জনগণ কীভাবে নির্মিত হয় সেই বিষয়ে লাকলাউ ব্যাখ্যা করছেন নিম্নোক্ত কথাগুলির মাধ্যমে ঃ

"[T]he frustration of a series of social demands makes possible the movement from isolated democratic demands to equivalential popular ones. One first dimension of the break is that– at its root– there is the experience of a lack – a gap which has emerged in the harmonious continuity of the social. There is a fullness of the community which is missing. This is decisive as the construction of the 'people' will be the attempt to give a name to that absent fullness. Without this initial breakdown of something in the social order — however minimal that something could initially be — there is no possibility of antagonism–frontier– or–ultimately–'people'.

This initial experience is not only – however – an experience of lack. Lack– as we have seen – is linked to a demand which is not met. But this involves bringing into the picture the power which has not met the demand. A demand is always addressed to somebody. So from the very beginning we are confronted with a dichotomic division between unfulfilled social demands – on the one hand – and an unresponsive power – on the other. Here we begin to see why the plebs sees itself as the populus – the part as the whole since the fullness of the community is merely the imaginary reverse of a situation lived as deficient being – those who are responsible for this cannot be a legitimate part of the community — the chasm between them is irretrievable...the movement from democratic to popular demands presupposes a plurality of subject positions demands – isolated at the beginning – emerge at different points of the social fabric – and the transition to a popular subjectivity consists in establishing an equivalential bond between them."[45]

সুতরাং, গণতান্ত্রিক দাবিকে সহজে মেনে নিয়ে, তৃণমূল নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে একটি গণতান্ত্রিক দাবিকে লোকবাদী দাবি হয়ে উঠতে। লাকলাউ প্রদত্ত তাত্ত্বিক যুক্তি অনুসারে লোকবাদী বিন্যাস ক্ষমতার পদে উন্নীত হয় এবং ঐতিহ্যবাহী স্থিতিশীল পুরোনো শাসন ব্যাবস্থাকে স্থানচ্যুত করে নতুন ক্ষমতাগোষ্ঠী হিসাবে পরিণত হয়; পার্থক্যের যুক্তি সমতার যুক্তির ঊর্দ্ধে বিরাজ করে। যেমন লাকলাউ দেখিয়েছেন,

"A society which postulates the welfare state as its ultimate horizon is one in which only the differential logic would be accepted as a legitimate way of constructing the social. In this society – conceived as a continuously expanding system – any social need should be met differentially — and there would be no basis for creating an internal frontier. Since it would be unable to differentiate itself from anything else – that society could not totalize itself – could not create a 'people'. What actually happens is that the obstacles identified during the establishment of that society — private entrepreneurial greed – entrenched interests – and so on — force their very proponents to identify enemies and to reintroduce a discourse of social division grounded in equivalential logics. In that way – collective subjects constituted around the defence of the welfare state can emerge. The same can be said about neoliberalism it also presents itself as a panacea for a fissureless society — with the difference that in this case – the trick is performed by the market – not by the state. The result is the same."[46]

তবে শুধুমাত্র পার্থক্যের যুক্তিতে তৃণমূল তার শাসন ধরে রাখতে পারে না। এই নিবন্ধের প্রথম অংশের আলোচিত বন্টনকেন্দ্রিক সরকারি নীতি নতুন যুক্তি রূপে উদ্ধারকর্তা হিসেবে আসে। তবে কেন সরকারি কল্যাণমূলক নীতিকে লোকবাদের পরিবর্তে Clientelism হিসেবে দেখব না? এখানে লাকলাউ স্পষ্ট করে বলছেন যে Clientelism 'can adopt purely institutional forms – but it is enough that it is constructed as a public appeal to the underdog outside the normal political channels for it to acquire a populist connotation' irrespective of any institution or ideology'[47]

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের দৌড়ে, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস (এ আই টি সি), 'কংগ্রেস' শব্দটি বাদ দিয়ে, একক শব্দ বন্ধ, 'তৃণমূল' বলে প্রতীকে তাদের প্রচার অনুষ্ঠান, পোস্টার এবং দলীয় ইস্তেহারে ব্যবহার করেছে যদিও দলটি এখনো ভারতীয় নির্বাচন কমিশনে এআইটিসি নামেই নথিভুক্ত।[৪৮] তৃণমূল নামটির আক্ষরিক অর্থের সঙ্গে বঞ্চিত ও অনগ্রসর মানুষের আবেদন লুকিয়ে আছে। তৃণমূল ক্ষমতাসীন দল হলেও তার লোকবাদী চরিত্র এবং ওই নামের তাৎপর্যকে উপেক্ষা করার মতো নয়, কারণ লোকবাদী আকার পেতে নামকরণের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে।[৪৯] অন্য ভাবে বললে নামের পুনর্গঠন এবং মমতার ভাবমূর্তি পুনঃনির্মানে বাংলার 'দিদি', দরিদ্র এবং অনগ্রসর গোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে এক দিকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যদিকে বাংলার অভিজাত ভদ্রলোক যাদের কংগ্রেস ও সিপিএম প্রতিনিধিত্ব করে তাদের নীতির বিরুদ্ধে সমানতার যুক্তি খাড়া করতে সাহায্য করলেন।

লাকলাউ-এর পার্থক্যের যুক্তি সেই গণতন্ত্রের দাবির সঙ্গে মিলে যায়, যখন এ জাতীয় দাবিগুলি ক্ষমতা বিন্যাসের সামনে রাখলে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দাবি থেকে বিছিন্ন হয়ে উঠতে পারে। অন্য কথায় রাষ্ট্র কিংবা ক্ষমতা গোষ্ঠী কোনো একটি নির্দিষ্ট অবয়ব পাওয়ার পরই জনতার কিছু দাবি দাওয়া পূরণ করতে পারে। তৃণমূল নেতৃত্বাধীন সরকার যে সুনির্দিষ্ট প্রকল্পগুলি কার্যকর করেছে তার কোনোটাই রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলাফল ছিল না। ভোটাররা সেই প্রকল্পগুলি ক্ষমতা গোষ্ঠী/রাষ্ট্রর কাছে চায়নি। পরিবর্তে এই কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি সরকারি ব্যবস্থা, প্রশাসনের নির্দিষ্ট কৌশল এবং আমলাতন্ত্র দ্বারা প্রস্তুত। তবে নির্দিষ্ট কল্যাণমূলক প্রকল্প জনগণের সঙ্গে একাত্মতা সৃষ্টি করেছে কারণ জনগণের মধ্যে কিছু অভাব রয়েছে। তাই বাস্তবে কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি প্রয়োগ করা পার্থক্যের যুক্তির চেয়ে আলাদা। কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি পরিচালনা করা ও বজায় রাখাকে 'শাসন কাঠামোর যুক্তি' বা 'শাসনের যুক্তি' বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে যা পার্থক্যের যুক্তির থেকে পৃথক। এর কারণ লাকলাউবাদী পার্থক্যের যুক্তি কাজ করে ব্যবস্থাপক কৌশলের মাধ্যমে, আর শাসনের যুক্তি প্রাথমিক ভাবে কাজ করে প্রয়োগের কৌশলের উপরে। যেমন, আমরা জানি লাকলাউ সমানুপাতিক যুক্তিকে জনগণের যুক্তি হিসাবে সংযুক্ত করেন আর ক্ষমতাগোষ্ঠীর যুক্তির সঙ্গে পার্থক্য বা বিভিন্নতার যোগ থাকে। তবে 'শাসনের যুক্তি', ক্ষমতাগোষ্ঠীর শক্তিতে মিলে আরও একটি মাত্রা দিয়েছে।

এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী/প্রশাসনিক স্তরেই শুধু গণতান্ত্রিক দাবি পূরণের ক্ষমতা থাকে না, বরং দাবি উত্থাপনের আগেই নির্দিষ্ট নীতি প্রয়োগের ক্ষমতা রাখে। এটি রাষ্ট্রীয় লোকবাদের সাধারণ মানদণ্ড। স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের কাছ থেকে 'কাট মানি' প্রসঙ্গে সম্প্রতি আমলাতান্ত্রিক বাধা বা দুর্নীতির কারণে এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দিলে শাসনের যুক্তি বিঘ্নিত হতে পারে, যা কেবল রাষ্ট্রীয় লোকবাদের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে।

যাইহোক, যদি একটি নতুন মতাদর্শগত গঠনের মাধ্যমে 'জনগণের' মধ্যে একটি ফাটল তৈরী করা হয়, যেখানে 'জনগণ' তৈরী হয়েছে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধারায় যেমন ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সাম্প্রতিক সাফল্যে যা প্রত্যক্ষ করা হল, তা তৃণমূলের রাষ্ট্রীয় লোকবাদের কাছেও একটি চ্যালেঞ্জ। এর কারণ বিজেপির 'জনগণ' নির্মাণ বিভিন্ন প্রকরণের ফলাফল (মূলত মুসলমান তোষণ বনাম ক্ষতিগ্রস্থ হিন্দু, এ জাতীয় দাবি নৈতিক ভাবে বৈধ না সত্য তা অপ্রাসঙ্গিক)। এই ধরণের বৃত্তান্ত প্রায়ই সাজানো ঘটনা, উড়ো খবর এবং অর্ধ-সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে যা জোরদার হয় যদি 'মুসলমান তোষণ' এর কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া যায়, যেমন বাংলার ইমাম ভাতা, তিন তালাকের প্রসঙ্গে তৃণমূলের অবস্থান এবং কিছু সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা।

২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের পর, তৃণমূল 'দিদিকে বলো' নামে একটি প্রচার শুরু করে, যেখানে হেল্পলাইনের সাহায্যে ফোন করে বা অন-লাইনে যে কোনো ব্যক্তি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। এই জনসংযোগ প্রক্রিয়া এক দিকে অভিযোগ দায়ের করার পদ্ধতি আর অপরদিকে নিত্য দিন জনগনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকার প্রয়াস। এর ফলে, রাজ্য প্রশাসন সরকারি প্রকল্পগুলির বাস্তবে রূপায়নের সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারছে, দ্রুত প্রক্রিয়ায় জনগনের সমস্যার উপশম করতে পারছে এবং শেষ অবধি সরকারের প্রকল্পগুলির রূপায়নে সফল হতে পারছে। এই ধরণের প্রচার প্রশাসনিক যুক্তিকেই শুধু শক্তিশালী করে।

ভারতে, 'রাষ্ট্রীয় লোকবাদ', আঞ্চলিক স্তরে; পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িষ্যা ও তামিলনাড়ু এবং জাতীয় স্তরে মোদীত্বের (মোদীকেন্দ্রিক জনপ্রিয়তাবাদ) মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত।[৫০] এই ধরণের 'রাষ্ট্রীয় লোকবাদের' ধরণ লাকলাউ-এর তাত্ত্বিক সাহিত্যের বিপরীতধর্মী। লোকবাদকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ জনতার সমতুল্য যুক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আজকের ভারতবর্ষে যে বিশেষ ধরণের লোকবাদ বিরাজমান সেখানে একটি প্রকৃত শত্রু বা পূর্ব নির্ধারিত শত্রুকে চ্যালেঞ্জ জানাতে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা হয়। অন্যভাবে বললে, প্রতিষ্ঠান বিরোধী লোকবাদ/রাজনীতি রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পর রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে এক নতুন রাষ্ট্রকেন্দ্রিক লোকবাদে রূপান্তরিত হচ্ছে। এইভাবে রাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় লোকবাদী বিন্যাসকে একটা অনন্য মাত্রা দেয়। এই ধরণের রাষ্ট্রীয় লোকবাদের উপস্থিতি ছিল দক্ষিণ গোলার্ধে যেমন আর্জেন্টিনায় পেরনিস্ট রাজত্বকালে, লিবিয়ায় গদ্দাফির শাসনকালে ও

১৯৬০এর দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে। আজ শেখ হাসিনা বাংলাদেশে এবং একবিংশ শতাব্দীতে লাতিন আমেরিকায় 'একবিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্র'-এর নামে রাষ্ট্রীয় লোকবাদ লক্ষ্য করা যায়। ভারতের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল ভোটারদের মতামতের গরিষ্ঠতায় লোকবাদ গঠিত হয়, যা এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার বহুদেশে সেনা বা নাগরিক সমাজের সমর্থনে গড়ে ওঠে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূল পরিচালিত রাজ্যসরকারের গতি প্রকৃতির আলোচনা থেকে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে লাকলাউ-এর কাজে সমতুল্যতা / সমানতা এবং বিভিন্নতা / পার্থক্যের দ্বৈত যুক্তি রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় লোকবাদ ত্রিস্তরীয় এবং ত্রিভুজাকার সমানতা, বিভিন্নতা এবং শাসনকার্যের যুক্তির মেলবন্ধন।

অনুবাদক ঃ অন্বেষা সরকার

Reference

1. Ernesto Laclau, On Populist Reason (London: Verso, 2005), p. 117.
2. আর্নেস্তো লাকলাউ, *ওন পপুলিস্ট রিজন* (লণ্ডনঃ ভার্সো, ২০০৫), পৃষ্ঠা ৮১।
3. তদেব, পৃষ্ঠা ৮১।
4. তদেব।
5. তদেব, পৃষ্ঠা ৮৬।
6. সর্বভাতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, 'ইস্তাহার ২০১১ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০১১', পৃষ্ঠা ৪।
7. Dwaipayan Bhattacharyya, *Government as Practice: Democratic Left in a Transforming India* (New Delhi: Cambridge University Press, 2016).
8. Stephanie Tawa Lama-Rewal, 'The Resilient Bhadrolok: A Profile of the West Bengal MLAs', in Christophe Jaffrelot and Sanjay Kumar (eds.), *Rise of the Plebeians? The Changing Face of Indian Legislative Assemblies* (New Delhi: Routledge, 2009), pp. 361-392.
9. Empty signifier is a signifier without a signified, which could create a logic of equivalence among several democratic demands. As Laclau argues, "identification with an empty signifier is the sine qua non for theemergence of a 'people'. But the empty signifier can operate as a point of identification only because it *represents* an equivalential chain." See Laclau, *On Populist Reason*, p. 162. For a detailed discussion on the concept of the empty signifier, see Ernesto Laclau, 'Why do Empty Signifiers Matter to Politics?' in *Emancipation(s)*, (London: Verso, 1995), pp. 36-46.
10. For a recent assessment of strengths and weaknesses of these four major players in West Bengal politics, see my essay, 'Big National Parties in West Bengal: An Exceptional Outcast?' in Mujibur Rehman (ed.), *Rise of Saffron Power: Reflections on Indian Politics* (London: Routledge, 2018), pp. 279-296.
11. সূত্রঃ জাতীয় নির্বাচন কমিশন।
12. 12. K.K. Kailash, 'Regional Parties in the 16th Lok Sabha Elections: Who Survived and Why?', *Economic and Political Weekly,* Vol. 49, No. 39 (2014), 64-71.

13. Jyotiprasad Chatterjee and SuprioBasu, 'Bipolarity to Multipolarity: Emerging Political Geometry in West Bengal', *Panjab University Research Journal: Social Sciences* (Special Issue in collaboration with Lokniti, CSDS, Delhi), Vol. 22, No. 2, (2014), 211-223.

14. ShreyasSardesai and SuprioBasu, 'Poor dump Left for Trinamool, Muslims solidly behind Didi', *Indian Express*, 22nd May 2016: http://indianexpress.com/article/elections-2016/explained/west-bengal-muslims-mamata-banerjee-tmc-left-2812930/ accessed on 23rd July 2019.

15. Socio-Economic Caste Census, 2011. http://secc.gov.in/stateSummaryReport accessed on 24th July 2019.

16. Sardesai and Basu, 'Poor dump Left for Trinamool, Muslims solidly behind Didi'.

17. VibhaAttri and Souradeep Banerjee, 'Corruption an issue in West Bengal, but development No. 1', *Indian Express*, 22nd May 2016: http://indianexpress.com/article/elections-2016/explained/west-bengal-tmc-mamata-banerjee-corruption-development-2812946/ accessed on 24th July 2019.

18. Jyoti Mishra and AsmitaAasaavari, 'Historic sweep powered by Mamata', *Indian Express*, 22nd May 2016: http://indianexpress.com/article/elections-2016/explained/mamata-banerjee-tmc-west-bengal-historic-win-analysis-2812918/ accessed on 24th July2019.

19. The concept of 'political society' has been innovatively formulated by Partha Chatterjee. See Partha Chatterjee, Politics of the *Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World* (New York: Columbia University Press, 2004); Partha Chatterjee, Lineages of Political Society: Studies in Postcolonial Democracy (New York: Columbia University Press, 2011).

20. Ernesto Laclau, *Politics and Ideology in Marxist Theory* [1977] (London: Verso, 1979), pp. 196-197.

21. তদেব।

22. তদেব, পৃষ্ঠা ১৯৭।

23. মইদুল ইসলাম, 'লোকবাদ কাকে বলে?', *আরেকরকম*, সপ্তম বর্ষ, ঊনবিংশ-বিংশ যুগ্ম সংখ্যা (অক্টোবর ২০১)৯, পৃষ্ঠা ৭৭-৮২।

24. Laclau, *On Populist Reason*, pp. 73-74.

25. তদেব, পৃষ্ঠা ৮২।

26. তদেব, পৃষ্ঠা ১২৫-১২৬।

27. তদেব, পৃষ্ঠা ১২৫।

28. তদেব, পৃষ্ঠা ১২৭-১২৮।

29. তদেব।

30. তদেব, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮।

31. Ibid., p. 78. The logic of equivalence and difference is theoretically developed from an earlier celebrated work of Laclau and Mouffe where these political logics were connected in moving from particularity to universality for the making of a hegemonic relation where hegemonic universality is always a contaminated universality. See Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, 'Preface to the Second Edition' of *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics* [1985], 2nd ed. (London: Verso, 2001).

32. Laclau, *On Populist Reason*, p. 78.

33. তদেব, পৃষ্ঠা ১২০।

34. Saibal Sen and Caesar Mandal, 'Chit-fund scam: Saradha agents lay siege to Mamata house', *The Times of India*, 20th April 2013: http://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/Chit-fund-scam-Saradha-agents-lay-siege-to-Mamata-house/articleshow/19643453.cms accessed on 25thJuly 2019.

35. Ibid.

36. *The Times of India*, 26th April 2013.

37. New report: 'Shyamal Sen commission wound up; job unfinished', *Hindustan Times*, 22nd October 2014: https://www.hindustantimes.com/india/shyamal-sen-commission-wound-up-job-unfinished/story-07YLIk47hwg2S2WufOOQ6O.html accessed on 15th August 2019.

38. News report: 'Saradha's contract with IRCTC sans security deposit raises questions about Mamata Banerjee's role in it', *DNA*, 11th September 2014: http://www.dnaindia.com/india/report-saradha-s-contract-with-irctc-sans-security-deposit-raises-questions-

about-mamata-banerjee-s-role-in-it-2017852 accessed on 25thJuly 2019.

39. News report: 'Saradha-IRCTC deal: Cong wants Mamata to resign', *The Indian Express*, 5th September 2014: http://indianexpress.com/article/cities/kolkata/saradha-irctc-deal-cong-wants-mamata-to-resign/ accessed on 25th July 2019.

40. Shantanu Ghosh, 'EkPoysha Guarantee Charai Rail er Agent', *Anandabazar Patrika*, 11th September 2014: http://www.anandabazar.com/state/saradha-irctc-agent-deal-without-any-security-money-1.67955# accessed on 25thJuly 2019.

41. RomitaDatta, 'Stalemate over Bhangar power grid project ends, work to begin on August 14', *India Toady*, 13 August 2018: https://www.indiatoday.in/india/story/stalemate-over-bhangar-power-grid-project-ends-work-to-begin-on-august-14-1313100-2018-08-13 accessed on 15th August 2019.

42. Ibid.

43. See the news report, 'Doctors in West Bengal call off strike', 17th June 2019: https://www.thehindubusinessline.com/news/national/doctors-strike-mamata-agrees-to-live-coverage-of-meeting/article27995010.ece accessed on 15th August 2019.

44. তদেব।

45. See Laclau, *On Populist Reason*, pp. 85-86.

46. Ibid., pp. 78-79.

47. Ibid., p. 123.

48. Sandeep Phukan, 'Trinamool drops the Congress from its logo', *The Hindu*, 22nd March 2019:https://www.thehindu.com/elections/lok-sabha-2019/trinamool-drops-the-congress-from-its-logo/article26611880.eceaccessed on 25th July 2019.

49. তদেব। দেখুন, লাকনউ, *অন পপুলিস্ট রিজন*, পৃষ্ঠা ১০০-১১৭।

50. মোদীত্বের লোকবাদী রাজনীতি বোঝার জন্য আমার বই দেখুনঃ *Indian Muslim(s) after Liberalization* (New Delhi: Oxford University Pres,, 2019), পৃষ্ঠা ১৩ এবং ২৪-৪৪।

রাজনৈতিক পন্থা হিসেবে 'জনপ্রিয়তাবাদ' : হিন্দি বলয়ে জাত এবং সামাজিক ন্যায়ের একটি নিরীক্ষা

মনীশ ঝা

জনপ্রিয়তাবাদকে সাধারণত সংজ্ঞায়িত করা হয়, 'দরিদ্রদের এলিট শ্রেণীর বিরোধিতা' হিসেবে। এটা মনে করা হয় যে, গণতন্ত্রে জনপ্রিয়তাবাদের দ্বারা সাধারণ জনগণকে সুযোগ দেওয়া হয় যাতে প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতাশীল এলিট শ্রেণীর বিরোধিতা করা যায়। তবে, গণতন্ত্রের সাথে জনপ্রিয়তাবাদের একটি জটিল সম্পর্ক রয়েছে এবং এটি দ্ব্যর্থকও হতে পারে বিশেষ কিছু রাজনৈতিক বক্তব্যের জন্য। 'ক্ষমতাশীল এলিট শ্রেণী'কে আক্রমণ ও 'সাধারণ জনগণ' এর স্বার্থরক্ষার নামে জনপ্রিয়তাবাদ বিকশিত হলেও এই বিষয়ে আরো বিশদ অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার গতিপথ এবং নির্বাচনী রাজনীতির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বেশ কয়েক দশক ধরেই এই জনপ্রিয়তাবাদের অস্তিত্ব রয়েছে। জাতীয় রাজনীতিতে গত ৫০ বছরে ইন্দিরা গান্ধী থেকে নরেন্দ্র মোদি এবং আঞ্চলিক রাজনীতিতে জয়ললিতা, লালুপ্রসাদ, মমতা ব্যানার্জীর মত নেতানেত্রীর মাধ্যমে জনপ্রিয়তাবাদ নানাভাবে আবর্তিত হয়েছে এবং তাদের প্রভাবের স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষরও রেখেছে। de Vreese (২০১৮) এর মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে জনপ্রিয়তাবাদ এখনকার রাজনৈতিক পরিসরে ক্ষমতাশীল এলিটদের কাছে সমাজের অশ্রুত নাগরিক গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর ও মুখের ভাষা পৌঁছে দিতে পারে এবং মূলস্রোতের রাজনীতিতে অনুপস্থিত বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু যে ভাবে দেশে দেশে জনপ্রিয়তাবাদের বিস্তার ঘটছে এবং রাজনীতিকে প্রভাবিত করছে, তাতে একদিকে সমাজের বিভিন্ন ধরণের সংখ্যালঘু অংশের মানুষের অধিকার খর্ব হওয়ার আশঙ্কা ও নাগরিক পরিসর সঙ্কুচিত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, অন্যদিকে, সমাজের প্রান্তসীমায় বসবাসকারী মানুষদের গণতান্ত্রিক অধিকারের বলয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ইতিবাচক সম্ভাবনাও অস্বীকার করা যায় না।

জাতপাত এবং সামাজিক ন্যায়কে ঘিরে যে রাজনীতি তা, প্রধানত প্রান্তিক মানুষজনের প্রতি গণতন্ত্রের প্রসারের রীতিকে বুঝতে সাহায্য করে। জনপ্রিয়তাবাদের ওপর আলোচনা

জনপ্রিয় ইচ্ছার ধারণার মূলে নিহিত এবং সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও মতাদর্শের সঙ্গে নৈকট্য স্থাপনে জনপ্রিয়তাবাদ স্বস্তি পায়।

জনপ্রিয়বাদের উত্থান ও সাফল্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রচুর তত্ত্ব উঠে আসে; অবশ্য এই ব্যাখ্যা বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্নরকমের হয়ে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে আমি জনপ্রিয়তাবাদকে একটি ব্যবহারিক রাজনৈতিক চর্চা হিসেবে দেখছি, যেখানে জাতপাতের মতো নানা উপাদানের সাহায্যে এটি সামাজিক ন্যায়ের ধারণাকে তুলে ধরে। ভারতীয় সংবিধানের মূল আদর্শ এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতীয় রাজনীতিতে উদার গণতন্ত্রের চাহিদা বিচিত্রভাবে ও গতিশীলভাবে জনপ্রিয়তাবাদের বিবর্তন প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে এই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির মধ্যে যে সব সুক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, তার নানাভাবে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করা যেতে পারে। জনপ্রিয়তাবাদের মতাদর্শগত ভিত্তি, তার নিজস্ব বাগভঙ্গিমা, এবং জনগণকে তার পতাকার তলায় জড়ো করার কর্মকৌশল ও পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

এই প্রবন্ধে, আমি হিন্দি বলয়ের রাজ্য, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে জনপ্রিয়তাবাদকে বিশ্লেষণ ও বোঝার চেষ্টা করছি। বিহারের ক্ষেত্রে বিষয়টি অতীতচারণায় বারবার ফিরে গেলেও উত্তরপ্রদেশের বিশ্লেষণ মূলত সমসাময়িক জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির মধ্যেই নিবদ্ধ। জনপ্রিয়তাবাদ বলতে আমরা কী বুঝি এবং জনপ্রিয়তাবাদের আঙ্গিনায় রাজনীতিকে আমরা কীভাবে প্রত্যক্ষ করি সেই বিষয় ছাড়াও উপরোক্ত দুই রাজ্যে জনপ্রিয়তাবাদের ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়ের ধারণা কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে, সেই বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিকভাবে আলোচনা করা দরকার। সামাজিক ন্যায়ের প্রকাশ এবং অভিব্যক্তি কীরকম হয়েছে এবং এই প্রকার রাজনীতির মধ্যে কীভাবে ও কখন জাতপাতের প্রশ্নটি প্রবেশ করে? ধারণাগতভাবে এবং কৌশলগতভাবে, এই রাজনীতি এলিট বিরোধী, এবং এর চেষ্টা থাকে জনসাধারণকে, অর্থাৎ, সাধারণ মানুষকে এলিটদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ করার। এই জাতপাতের অঙ্ক, এবং তাতে ক্ষমতার অংশীদারি পেতে নিজেদের অন্তর্ভুক্তি ও অন্যদের বর্জন করার প্রক্রিয়া কি গোটা বিষয়টিকে জটিল করে তোলে? সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নটির ভিত্তিতে নির্বাচনী রাজনীতি শুরু হওয়ায় জাতপাতের প্রচলিত সামাজিক কাঠামোকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর দরকার হয়ে পড়ল। এক বা একাধিক সমচরিত্রের জাতভিত্তিক যে জনসংহতি নির্মাণ করা হতে লাগল, তা সামাজিক বর্ণপ্রথাকে রাজনৈতিক বর্ণপ্রথায় পরিণত করল। ১৯৬০ এর দশকের শেষের বছরগুলির সময় থেকে সামাজিক ন্যায়ের কথা বলতে গিয়ে অগ্রগণ্য সমাজতন্ত্রী নেতারা যে সব স্লোগান, ভাষা ও বাগশৈলী ব্যবহার করেছিলেন তা এই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির স্বরূপ বুঝতে সহায়ক হয়ে ওঠে। হিন্দিবলয়ের রাজ্যগুলিতে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এগিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে জাতপাতের জটিলতা সামলে সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে এগনো এই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিকে কীভাবে বুঝব? এটা ঠিক যে এই জনপ্রিয়তাবাদের বিভিন্ন দিককে খতিয়ে দেখতে হলে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাকে দেখাই বিচক্ষণতার

কাজ হত। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধে কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই অতীত ও সমসাময়িক কালের মধ্যে অনবরত যাতায়াত করে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে রাজনীতি কীভাবে বার বার বাঁক নিয়েছে, সেটা বোঝার চেষ্টা হয়েছে।

হিন্দি বলয়ের রাজনৈতিক ইতিহাসে নানা সময় নানা ধরণের জাতপাতভিত্তিক জোট গঠনের উদাহরণ রয়েছে। অতীতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তি এমনভাবে জাতপাতকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করত যাতে ক্ষমতাসীন এলিটরা নিজেদের শাসনকে বৈধতা দিতে পারে এবং সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন অর্জন করতে পারে। নিজেদের সমর্থনে এই জনভিত্তির মূল শক্তি ছিল উচ্চবর্ণ, দলিত ও সংখ্যালঘু মুসলমান।

কংগ্রেসের এই অভিজাততান্ত্রিক পরিচালন কৌশলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, ১৯৬০ এর দশকের মধ্যভাগে সমাজতন্ত্রীরা জনসাধারণের দ্বারা রাজনীতির সম্ভাবনাকে তুলে ধরে একটি বিশেষ ধরনের জনপ্রিয়তাবাদকে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে নিয়ে আসে। জাতপাতের রাজনীতিকে সামনে ঠেলে আনা হয় যাতে বিশেষত অনগ্রসর এবং প্রান্তিক মানুষজন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পুঁজি ও সম্পদের ভাগিদার হতে পারে। তাহলে কি এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভ অথবা বঞ্চনাসঞ্জাত ঘৃণার যুক্তিকে উসকে দিয়ে জনপ্রিয়তাবাদ কাজ করে বলে ধরে নেওয়া উচিত? এই প্রশ্নগুলি বিবেচনা করলে উপলব্ধি হয়, বিহারের অনগ্রসর এবং দলিত গোষ্ঠিগুলির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে তারা যথেষ্ট সংগঠিত হয়ে উঠলেও নির্বাচনী লড়াইয়ে তেমন সাফল্য পায় নি। রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখের প্রচারিত সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে জোরালোভাবে ধনিকশ্রেণী ঘেঁষা বলে অভিহিত করে এবং কংগ্রেস বিরোধিতাকেই রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে গ্রহণের প্রস্তাবনা করে। ১৯৭০ এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অন্যান্য 'পিছড়ে বর্গ' (OBC) এবং দলিত দলগুলিকে জোটবদ্ধ করে প্রথম যে অ-কংগ্রেসি গোষ্ঠীর জন্ম হয় তা সমাজতন্ত্রী, ভারতীয় জনসংঘ এবং কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু অংশকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। বিভিন্ন বিপরীতধর্মী রাজনৈতিক শক্তির এই জোট কী ভাবে কতদূর যেতে পারল, এবং সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে গড়ে তোলা রাজনীতিই বা পরবর্তী দশকগুলোতে কতটা কি করতে পারল? সংরক্ষণের রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তের বাইরে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিকে নিয়ে যাবার ব্যাপারে পূর্বতন সমাজতন্ত্রীদের অক্ষমতা এবং কংগ্রেস দলের ক্রমাবনতির ফলে রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদ নানা ছিদ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করে। এই সমসাময়িক দশকের রাজনৈতিক বিকাশ দক্ষিণপন্থী রাজনীতির একটি সুচারু মূল্যায়ন দাবী করে। কীভাবে এই দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদ জাতপাতের রাজনীতিকে ব্যবহার করে এবং তার সাহায্যে একটি বৃহৎ নির্বাচনী সমর্থনের ভিত্তি গড়ে তোলে?

হিন্দি বলয়ের এই রাজনৈতিক আন্তঃক্রিয়ার একটি চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে এই প্রবন্ধে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে যে এই জনপ্রিয়তাবাদ কি আসলে যেমনটা তাত্ত্বিক আলোচনায় দাবি করা হয়, একগুচ্ছ ধারণার সমষ্টি? এটাও দেখা যাচ্ছে যে জনপ্রিয়তাবাদের ভাবনার

মূলে রয়েছে 'জনগণ' এর একটি ধারণা, এবং সেই জনগণের সঙ্গে একজন জনপ্রিয়তাবাদী নেতার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের সম্পর্ক, যার মাঝখানে প্রশাসন বা রাজনৈতিক দলের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কোনও ভূমিকা নেই। কুর্ট ওয়েল্যান্ড (Kurt Weyland– 2001-14) মনে করেন, ''জনপ্রিয়তাবাদকে রাজনীতির একটি রণকৌশল হিসাবে দেখা ভালো, যেখানে একজন শক্তিশালী নেতা সরকারি ক্ষমতার প্রয়োগ করেন সরাসরি সাধারণ মানুষের সমর্থনের ভিত্তিতে। এই জনসমর্থন জোগায় সংখ্যায় বিপুল, কিন্তু অসংগঠিত অনুগামীরা।''

এই সব নেতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাদের নীতি ও কৌশলকে কী ভাবে বুঝব? কী করে এরা নিজেদের অনুগত 'জনগণ' তৈরি করে, কী করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে? ১৯৯০ থেকে শুরু করে যে রাজনীতি উত্তরোত্তর দেশের রাজনৈতিক পরিসর দখল করতে শুরু করল, সেখানে জাতপাতের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের বিন্যাস ও এদের রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসার লড়াই যত তীব্র হল, ততই তাদের নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট ফাটল সামনে এল। এতদিন যে জাতপাত ছিল প্রধানত সামাজিক ক্ষেত্রে, এবার তা রাজনীতির পরিসরে জায়গা করে নিল। দেশের রাজনীতির দিকে তাকালে বোঝা যায়, নেতারা প্রায়শই সমাজে জমে থাকা নানা বঞ্চনাজনিত হতাশা ও ক্ষোভকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি করে থাকে। এই জনপ্রিয়তাবাদ ''জনগণের ইচ্ছা এবং সামাজিক ন্যায় ও নৈতিকতা'' (Shils 1956.18)-কে, ন্যায় ও নৈতিকতার আদর্শকে তাদের রাজনীতির মধ্যে কৌশলের সঙ্গে ব্যবহার করে। বর্তমান নিবন্ধে কয়েকজন জনপ্রিয়তাবাদী নেতার রাজনৈতিক কৌশলকে ভালো করে খুঁটিয়ে বিচার করার চেষ্টা করা হবে। বিশেষ করে দেখা হবে বিহারের কর্পূরি ঠাকুর ও লালুপ্রসাদ যাদব এবং বৃহত্তর পরিসরে নরেন্দ্র মোদির রণকৌশলকে। একই সঙ্গে দেখা হবে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির মাধ্যমে নির্মিত 'জনগণ'এর নিহিতার্থকেও। যদি এই 'জনগণ' শুধুই গরিব ও অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে তৈরি হয়, তা হলে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি বামঘেঁষা হতে বাধ্য। তখন রাজনীতির ঝোঁকটা আয় বা সম্পদের পুনর্বন্টন ও কল্যাণকামী নীতিনির্ভর হতে বাধ্য। অন্যদিকে, ধর্মীয়, জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়কেন্দ্রিক বা জাতিশ্রেষ্ঠত্বের দাবিভিত্তিক রাজনীতির ক্ষেত্রে 'জনগণ' তৈরি করলে তখন রাজনীতিও দক্ষিণপন্থী হতে বাধ্য। বিষয়টিকে এ ভাবে ব্যাখ্যা করটাই যথেষ্ট, নাকি আরও খতিয়ে এর মধ্যে নিহিত সুক্ষ্ম তারতম্যগুলি লক্ষ্য ও বিশ্লেষণ করা দরকার?

বর্তমান নিবন্ধটির মূলে থাকা ধারণা এবং গবেষণার সাহায্যে এটা বলার চেষ্টা হয়েছে যে জনপ্রিয়তাবাদকে নিছক একটি রাজনৈতিক নীতি বা কৌশল হিসাবে দেখা ঠিক নয়, বরং এর সামাজিক ক্ষেত্রে এবং বহু ক্ষেত্রে উপস্থিতি রয়েছে। আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি নেতারা কি ভাবে 'জনগণ'এর নাম ব্যবহার করে তাদের হয়ে কথা বলার দাবি করে থাকে, এবং তাদের রাজনীতিতে এটাও প্রতিফলিত হয় যে কি ভাবে তারা নিজেদের পক্ষে সমাজের সমর্থন জোগাড়ের তাগিদে ওই 'জনগণ'এর দোহাই দিয়ে থাকে। এই

রাজনীতিতে জাতপাতের সমস্যার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম দিকগুলিকে সামলে নিয়ে ব্যবহার করে দেখানোর চেষ্টা হয় যে এই 'জনগণ' সমস্ত জাতপাত, শ্রেণী, পরিচয়কেন্দ্রিক দাবির উর্ধে উঠে একান্তই নিজেদের সামাজিক অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তনের অভিলাষী ছাড়া আর কিছুই নয়। হিন্দিবলয়ের রাজনীতিতে এ ভাবে একজন নেতাকেই দেশ বা রাষ্ট্রের প্রতীক বলে ধরে নেওয়ায় তার বিরুদ্ধে কোনও প্রশ্ন তোলাটাই অবৈধ বলে গণ্য হয়ে থাকে। এই নেতার প্রভাব এমনই যে যাবতীয় পরিচয়কেন্দ্রিক রাজনীতি চাপা পড়ে, সমাজে জাতপাতের রাজনৈতিক অঙ্ক ও সামাজিক ন্যায়ের দাবিও চাপা পড়ে যায়। এটা মনে করা কি ঠিক যে জাতপাত ও সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নগুলিই এখন নতুন ভাবে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির আকারে আত্মপ্রকাশ করছে? এই জনপ্রিয়তাবাদী নেতারা মনে করে থাকে যে গণতান্ত্রিক সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি ও রাজনৈতিক সহবৎ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই, কারণ এ সব বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের দায়। তারা বরং যা অবাস্তব বলে মনে করা হয়, তাকেই বাস্তব রাজনীতির অঙ্গনে নামিয়ে আনার দাবি তোলে।

আঞ্চলিক রাজনীতিতে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির বিভিন্ন প্রকাশ ঃ

সামাজিক ন্যায়ের প্রকাশ অনেক সময়েই সম্পদের পুনর্বন্টনের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। শুধুই রাষ্ট্রের আর্থিক সম্পদের ন্যায্য অধিকারের দাবি নয়, 'স্বীকৃতির রাজনীতি'র মধ্যেও তা প্রচ্ছন্ন। ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেকার সম্পর্ক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই 'স্বীকৃতির রাজনীতি' ও জাতপাতের রাজনীতি গণতান্ত্রিক পরিসরে প্রভাব বিস্তার করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দুই দশক পর থেকেই সমাজতন্ত্রী নেতারা অভিযোগ করতে থাকেন যে ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর দেশে যাবতীয় ক্ষমতা তখনকার এলিট শ্রেণীর হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে পড়েছে। তার জেরে 'জনগণ'এর গণতান্ত্রিক আকাঙ্খা ব্যাহত হচ্ছে। যৌথভাবে রাজনৈতিক স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে সমাজতন্ত্রী নেতা কর্পূরি ঠাকুর বিভিন্ন জাতপাতে বিভক্ত গোষ্ঠীদের একত্র করে একটি রাজনৈতিক জোট করার উদ্যোগ নেন। বিহারে এই বিকল্প রাজনীতিতে উচ্চবর্ণকে 'অপর' বলে চিহ্নিত করে এতদিন সমাজের এককোণে পড়ে থাকা নিম্নবর্ণের মানুষদের রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি আদায়ের নতুন আখ্যান তৈরির চেষ্টা শুরু হয়। ''সংসপা (সংযুক্ত সমাজতান্ত্রিক পার্টি)- নে বান্ধি গাঁঠ, পিছড়ে পাওয়ে সঔ মে সাথ'' এবং ''সঔ সে কম না, হজার সে জ্যাদা, সমাজবাদ কা এহি তাকাজা'', এই দুই স্লোগান নিম্নবর্ণের জনগণের নজর কাড়ে। এ ভাবেই তারা 'অপর' এবং এলিটদের চরিত্র সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে। তাদের প্রতিহিংসামূলক মনোভাব ধরা পড়ে সমাজতন্ত্রী নেতা জগদীশ প্রসাদের আরও প্ররোচনামূলক স্লোগান ''অগলে সাল ভাদো মে, গোরে হাথ কাদো মে'' (সামনের বার থেকে, উঁচুজাতের লোকেরা নিজের হাতে মাটি কাটবে) এর মধ্যে। এ ভাবেই রাস্তার স্লোগান এবং বিধানসভার মধ্যে বিতর্কের মাধ্যমে স্বাধীনতা পরবর্তী দু-তিন দশকের মধ্যেই বিহারে নিজস্ব জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির সূত্রপাত হয়।

কিন্তু তাদের রাজনীতির জনপ্রিয় আবেদনকে সরকারি প্রশাসনের পরিচালনার মধ্য দিয়ে মূর্ত করতে গিয়ে সমাজতন্ত্রীরা সত্যিকারের কঠিন পরীক্ষার সামনে পড়েন। যে সময় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী নিজেদের মধ্যে আঁতাত গড়তে গিয়ে, রাজনীতিতে কে শত্রু, কে মিত্র তা বাছতে হিমসিম খাচ্ছিল, তখন সরকার গঠন করার ক্ষেত্রে নীতির চাইতে কৌশলের দিকটাই বড় হয়ে উঠেছিল। মিথিলেশ কুমার দাবি করেন, ওই পরিস্থিতিতে কর্পূরি ঠাকুর সরকার পরিচলনার কাজে জনপ্রিয়তাবাদী চিন্তার আমদানি করেছিলেন। (Kumar 2017.16) কর্পূরি ঠাকুর পিছড়ে বর্গ বা জাতপাতের বিন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে পিছনে পড়ে থাকা অংশের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে জাতপাত ও সংরক্ষণকে সরকারি কাজের অঙ্গ করে তোলেন। কর্পূরি সূত্র হয়ে ওঠে তাঁর অধীনে জনপ্রিয়তাবাদী সরকার গঠনের এক বিশেষ মুহূর্ত। সমাজের অনুন্নত জাতগোষ্ঠীর মানুষদের জন্য সরকারি চাকরি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসন সংরক্ষণের এই নীতি সমাজতন্ত্রীদের সামাজিক ন্যায় আদায়ের জনপ্রিয়তাবাদী আকাঙ্খার সঙ্গে মিলে যায়। তাঁর সরকারের গৃহীত নানা স্তরে বিন্যস্ত সংরক্ষণের নীতি সমাজে অনুন্নত মানুষদের একটা বড় সাফল্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। একই সঙ্গে, রামমনোহর লোহিয়ার বক্তব্য অনুযায়ী সমাজতন্ত্রীদের রাজনীতির ঘরানা ও নিম্নবর্ণের আন্দোলনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আসলে 'সামাজিক ন্যায়ের দাবিতে ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমাজে নিচুতলার মানুষদের বেশি করে সংঘবদ্ধ করার রাজনৈতিক সম্ভাবনাকেই স্বীকৃতি দেয়।" (Jha 2019)। সংরক্ষণের পরে পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিম্নবর্ণের মানুষদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখে কর্পূরি ঠাকুর দাবি করেন। উচ্চবর্ণদের সরিয়ে নিম্নবর্ণের মানুষরা এখন বিহারের রাজনীতিতে মুখ্য শক্তি হয়ে উঠছে। সেই সঙ্গে এটাও মনে করিয়ে দেন যে গ্রাম থেকে শুরু করে বিধানসভা পর্যন্ত সর্ব স্তরে বর্ণহিন্দুদের ছড়ি ঘোরানোর দিন চিরতরে শেষ। বর্ণহিন্দুরাও অশনি সংকেত বুঝতে দেরি করেনি। তাদের আধিপত্যের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারার আতঙ্ক ও ক্রোধমিশ্রিত প্রতিক্রিয়ার প্রকাশও হতে লাগল। (Blair 1980)

১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে ভাষাকেন্দ্রিক রাজনীতি আর একটি জনপ্রিয়তাবাদী দাবি হয়ে ওঠে, এবং রাজ্য সরকার তা নিয়ে হস্তক্ষেপও করে। কর্পূরি ঠাকুর ইংরেজিকে সমাজের এলিট শ্রেণীর ভাষা বলে চিহ্নিত করেন। সরকারের ক্ষমতায় এসে ঠাকুর বলেন, সরকারি কাজে ইংরেজির আধিপত্যের জন্য বিহারের সাধারণ মানুষকে প্রবল দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। এই ইংরেজি ভাষা সরকার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে রেখেছে। (Aryavarta 2970) সাধারণ মানুষকে এটা বুঝতেই দিচ্ছে না যে তারা গণতান্ত্রিক দেশে বাস করছে। ইংরেজির বিরুদ্ধে জনপ্রিয়তাবাদী স্লোগান ''আংরেজি মে অব কাম না হোগা, ফির সে দেশ গুলাম না হোগা" এবং ''রাষ্ট্রপতি কা বেটা ইয়া চাপরাশি কা সন্তান, ভাঙ্গি ইয়া ভবম হো, সবকি শিকসা এক সমান" ওই সময় সাধারণ বিহারবাসীর মনে দাগ কেটেছিল। (Jha 2019)।

মিথিলেশ কুমার আরও দাবি করেন, কর্পূরি সূত্র এবং সমাজের মধ্যে বর্ণহিন্দুদের সরিয়ে নিম্নবর্ণের উত্থানে তাঁর ভূমিকার মধ্য দিয়ে তিনি একটি জনপ্রিয়তাবাদী সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় 'জনগণ' বা 'রাজনৈতিক প্রজাবর্গ' নির্মাণ করার চেষ্টা করছিলেন। সরকার পরিচালনার কাজে এবং তার বিরোধিতার মধ্যেও কর্পূরি ঠাকুর যে ভাবে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে সমাজের সবচেয়ে উপেক্ষিত নিম্নবর্ণের মানুষের কল্যাণের উপর গুরুত্ব দিতে থাকেন, তা সবারই নজর কাড়ে। (Jha 2019)।

জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি সমাজের নিচুতলার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ায় সমাজে এই রাজনীতির ভিত মজবুত হয়। ফলে ওই মজবুত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে ১৯৯০ এর দশকে পরবর্তী প্রজন্মের নেতারা সরকারি প্রশাসনেরর কাজে হাত দিতে পারেন। কর্পূরি ঠাকুরের সামাজিক ন্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি থেকে লালুপ্রসাদ যাদবের আরও নির্দিষ্ট করে নিম্নবর্ণকেন্দ্রিক রাজনীতির কারণে, এখন জাতপাতের সমীকরণ ভিত্তিক রাজনীতিকে আঞ্চলিক ভাষা ও ক্ষেত্রের জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিরই প্রকাশ বলে মনে করা হয়। বিহারে রাজনীতি ও সরকারি প্রশাসনিক কর্মকান্ড দীর্ঘকাল বর্ণহিন্দুর আধিপত্যাধীন ছিল। শুধু মাঝের দুই ব্যতিক্রমী সময় (১৯৬৯-১৯৭১) এবং ১৯৭৭- ১৯৭৯ ছাড়া। এই দীর্ঘ সময়কালকে বিহারে জনগণের উপর এলিটদের আধিপত্যের যুগ বলে চিহ্নিত করে তাকে উল্টে দেওয়ার ভাবনা শুরু হয়। যুগ যুগ ধরে নিচু জাতের মানুষকে উঁচু জাতের মানুষ অবমাননা, অবহেলা, নিপীড়ন ও ঘৃণা করে আসছিল যেমন, অস্পৃশ্যতার মতো ঘৃণ্য অপরাধকে সামাজিক প্রথা হিসাবে সবার উপর চাপিয়ে দিচ্ছিল। একই সঙ্গে তাদের আর্থিক ভাবে 'দাস' বানিয়ে রাখছিল, যা থেকে পরিত্রাণের রাস্তা ছিল না। এই নতুন নেতারা সামনে উঠে এসে সেই গোটা ব্যবস্থাকেই চ্যালেঞ্জ করে বসল। (Jha and Pushpendra 2015)

১৯৯০ এর দশকে যেটা ঘটল, তা এক কথায় সমাজের বর্ণপ্রথার (caste social) রাজনীতির বর্ণপ্রথায় (caste political) রূপান্তর। সমাজতন্ত্রী নেতারা প্রায় সবাই নিম্নবর্গ থেকে আসা মানুষ, তারা কংগ্রেসের এলিট রাজনীতির তীব্র বিরোধিতা করল। তার জোর দিয়ে বলল, এলিটদের জায়গায় সাধারণ মানুষকে রাজনীতি ও সরকারি প্রশাসনের ক্ষমতার কেন্দ্রে বসাতে হবে। জাতপাত তখন নতুন চেহারায় 'রাজনৈতিক জাতপাত' হিসাবে অবতীর্ণ হল। এই নিম্নবর্ণের জাত পরিচয় তখন হয়ে উঠল রাজনৈতিক দাবি তোলার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

ওই ১৯৯০ এর দশকেই কংগ্রেসের পরাজয়ের সঙ্গে বিহারের রাজনীতিতে একটা অধ্যায়ের অবসান ঘটে, যাকে সামন্ততান্ত্রিক গণতন্ত্র (feudal democracy – Witsoe 2011) বলে অভিহিত করা যায়। সেই সঙ্গে সামাজিক ন্যায়ের জনপ্রিয়তাবাদী আবেদনকে হাতিয়ার করে নতুন রাজনৈতিক গোষ্ঠীবিন্যাস শুরু হল, যা জনসাধারণের সমর্থন এবং নির্বাচনী সাফল্যও পেতে শুরু করল। এই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির প্রকাশ ফুটে উঠতে থাকল নতুন সরকারি নিয়মাবলী প্রণয়ণ, সরকারি প্রশাসনিক কাঠামোর সংস্কার, উপযুক্ত

স্লোগান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। এতদিন এলিটদের সুবিধার দিকে তাকিয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, এবার তা পাল্টে যেতে লাগল। আগেকার সুচারু প্রশাসনের জায়গায় অনেক আপাতভাবে রুক্ষ উপাদান প্রশাসনে আমদানি হল। জনগণের নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত লালুপ্রসাদ যাদব রাজ্যের উচ্চবর্ণের প্রভাবশালী নেতাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ইচ্ছে করেই বিগত দিনের এলিট ঘেঁষা প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে খর্ব করতে লাগলেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর এলিটবিরোধী মনোভাব গোপনের চেষ্টা করেননি। ১৯৯০ পর্যন্ত রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোয় উচ্চবর্ণের আমলাদের আধিপত্য ও প্রভাব কায়েম ছিল, এবার সেখানে ধারাবাহিকভাবে তাদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া শুরু হল। এ সব করতে গিয়ে আইন, সরকারি নিয়ম ও কাজের পদ্ধতি কোথাও কোথাও ভাঙ্গা হল, কখনও এড়িয়ে যাওয়া হল, কখনও উপেক্ষা করা হল। (Jha and Pushpendra 2015) লালুপ্রসাদের রাজনীতিতে এলিট শ্রেণীর সরকার পরিচালনার শৈলীর অনুকরণ ছিল না। বরং সচেতনভাবেই তিনি তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এলিটদের পরিশীলিত অনুভূতিকে ধাক্কা দিতে নিজেদের সাধারণ সামাজিক প্রেক্ষিত নিয়ে গর্ব বোধ করতে আহ্বান জানান।

এই জাতপাতকেন্দ্রিক রাজনীতির জনপ্রিয়তাবাদী সম্ভাবনার গুরুত্ব অনুধাবন করে লালুপ্রসাদ তাঁর ভাষণ, স্লোগান এবং সরকারি প্রশাসনিক নির্দেশের মাধ্যমে সচেতনভাবে সমাজে ও রাজনীতিতে উচ্চবর্ণের আধিপত্যকে খর্ব করতে থাকেন। এর ফলে, 'জনগণ', যাদের মুখে একেবারেই নানা আঞ্চলিক কথ্য ভাষা, যারা শিক্ষা, বিত্ত সবদিক থেকেই নিঃস্ব এবং ভূমিসত্বাধিকারী, সম্পদশালীদের সমাজের সঙ্গে তাদের দূরত্বও অনেক, তারাও মনে করতে লাগল যে উন্নয়ন নিয়ে হৈচৈ করার চাইতেও সামাজিক ন্যায়ের দাবি তোলা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। লালুপ্রসাদের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ছিল, উন্নয়নের ফাঁকা দাবির বদলে সম্মান, মর্যাদা ও আওয়াজ তোলার অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজকে গুরুত্ব দেওয়া, আর এটা তিনি কোনও রাখঢাক না করেই করেছিলেন। এই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির প্রসারের কারণে এবং নির্বাচনী গণতন্ত্রের সুবাদে আধিপত্যের পুরনো কাঠামো কিছুটা হলেও দুর্বল হয়, যাকে উইটসো অভিহিত করেন 'জমিদখলের গণতন্ত্র' (territorial democracy) বলে। (Witsoe 2009:65)

সমাজের নিচুতলার মানুষের কাছে ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকারটি নাগরিকত্ববোধ প্রতিষ্ঠার পবিত্র অঙ্গ। এর মাধ্যমে তারা যেমন নিজেদের পছন্দানুযায়ী কারও পক্ষে এবং কারও বিপক্ষে ভোট দিতে পারে, তেমনই এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে কোনও আর্থিক লাভ না হলেও তার ক্ষমতায়ণ ঘটে। এর ফলে, তফশিল ও অন্য অনুন্নত (OBC) সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে চেতনার যে জাগরণ হল, লালুপ্রসাদ তাদের উচ্চবর্ণের প্রতি তীব্র বিরাগকে রাজনৈতিক ফসল তোলার কাজে লাগান। ১৯৯০ সালে সরকারে এসেই তিনি ওবিসিদের সংরক্ষণের মাত্রা আগের ২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৭ শতাংশ করেন, যা আইনে পরিণত হয় ১৯৯২ সালে। আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা শ্রেণীর

(Annexure 1 as per Mungeri Lal Commission report) জন্য সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৪ শতাংশ করে দেন। পরে বিহার ভেঙ্গে ঝাড়খন্ড তৈরি হলে তিনি ওই কোটা আরও বাড়িয়ে ১৮ শতাংশে নিয়ে যান। একই সঙ্গে তিনি আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা শ্রেণী থেকে একাধিক নেতাকে রাজনীতির সামনের সারিতে তুলে নিয়ে আসেন। রাজ্যের বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালক করা হয় ওবিসি থেকে। ফলে, এতদিন উচ্চবর্ণের অধিকারে থাকা এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর হল। লালুপ্রসাদের সরকার আরও এক ধাপ এগিয়ে আইন করে সংরক্ষিত কোটার অবহেলাকে দন্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করে। (Witsoe 2006 15) এ ছাড়া পাসি সম্প্রদায়ের পেশাগত জীবিকা গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে তাড়ি বানানোর উপর সরকারি কর ও সেচ ব্যবস্থা তুলে দেন, যে ছেলেমেয়েরা গোরু ছাগল চরায়, তাদের জন্য 'চরওয়াহা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজে নিম্নবর্ণের অন্তর্ভুক্তির কাজকে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে তিনি দলিত ও সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদে মনোনীত সদস্য করে পাঠান।

রাজনৈতিক নীতি ও কৌশলকে বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহার করে বিধানসভা ও সরকারি প্রশাসনে জাতপাত বা নিম্নবর্ণের প্রতিনিধিত্বের অনুপাত বৃদ্ধির সঙ্গেই সরকারি নীতি প্রণয়ণে ও প্রকল্প রূপায়ণে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। ফলে, সমাজের নিচুতলার মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যেতে লাগল। এক কথায়, জনগণের সার্বভৌমত্বের যুক্তিতে রাজনীতির আখ্যানটাই পাল্টে দেওয়া গেল। লালুপ্রসাদের এই রাজনীতি সাধারণ মানুষের মর্যাদা, সম্মান, সামাজিক ন্যায় এবং সম্পদে অংশীদারি দেওয়ার প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে করা হয়েছে।

জাতপাতের রাজনীতির দর্পণে দেশে জনপ্রিয়তাবাদ এবং সামাজিক ন্যায় ঃ

সমসাময়িক ইউরোপে ও লাতিন আমেরিকায় জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিকে খতিয়ে দেখে Mudde ও Kaltwasser (২০১৩) মনে করেন, জনপ্রিয়তাবাদী নেতারা একদিকে বলে দিচ্ছেন সমাজের এলিট শ্রেণীর বিরুদ্ধে কে বা কারা তাঁদের 'জনগণ', তাদের মধ্যে সমাজের কোন কোন অংশের মানুষ জায়গা পাচ্ছে, অন্যদিকে, তাঁদের মতাদর্শগত অবস্থান ও তার বৈশিষ্ট্যগুলিও তাঁরা স্পষ্ট করে দিচ্ছেন। আমাদের দেশের হিন্দিবলয়ে মন্ডল আন্দোলন পরবর্তী কাল থেকে শুরু করে দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির উত্থানকে খতিয়ে দেখে বলা যায়, জাতপাত ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কেন্দ্রিক জোটবন্ধন থেকেই 'জনগণ' এর নির্মাণ হয়েছে, যা এলিটদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এই আন্দোলনের মধ্যে কোনও সামাজিক গোষ্ঠীকে বাদ দেওয়া, অন্য কোনও গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়াকে কী ভাবে দেখা উচিত?

মতাদর্শের দিক থেকে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি এলিট শ্রেণীর বিরুদ্ধে এমন এক 'জনগণ' কে দাঁড় করায়, যা নৈতিক দিক থেকে উন্নত, সমচরিত্রের এবং আকারে বিশাল। তাদের বিপক্ষে রয়েছে সেই ক্ষমতাবান শ্রেণী যারা দীর্ঘদিন ধরে জনগণের ন্যায্য অধিকার, প্রাপ্য

মর্যাদা, উন্নয়নের অধিকার, থেকে বঞ্চিত করে চলছিল। এই বিপজ্জনক 'অপর' শ্রেণী জনগণের পরিচিতি এবং কথা বলার অধিকারও অপহরণ করেছিল। এই সংঘাতের মধ্যে সমাজতন্ত্রীদের পুরনো সামাজিক ন্যায় কেন্দ্রিক লড়াই কী ভাবে হারিয়ে গেল? জাতপাতকে ভিত্তি করে যে জোট তৈরি হয়, তাতে ফাটল ধরতে শুরু করে। ১৯৯০ থেকে ২০০০ পর্যন্ত সময়ে জাতপাতকেন্দ্রিক গোষ্ঠী ও মুসলমানদের নিয়ে জোট অটুট ছিল। কিন্তু মুসলমানদের 'অপর' হিসাবে জোটের বাইরে ঠেলার প্রবণতা শুরু হওয়ার পরে সামাজিক ন্যায়ের সুফল কারা ভোগ করার অধিকার পাবে, সেই বিষয়টি নতুন করে বিবেচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। ইতিহাসের বিশদে না গিয়েই মনে করিয়ে দেওয়া যাক, ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকের রাজনীতিতে একদিকে সচতুর কৌশলে অযোধ্যায় রামজন্মভূমি বাবরি মসজিদ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা ও বিভাজন 'সৃষ্টি' অন্যদিকে, মন্ডল আন্দোলনের সুবাদে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই অনেক নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীর জাতপাতকেন্দ্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জাহির করার চেষ্টা জনগণকে নানাভাবে ভাগ করছিল। হিন্দুদের মধ্যে জাতপাতের সমীকরণকে রাজনৈতিক রঙ লাগানোর পরে একধরণের অন্তর্ভুক্তির ধারণা তৈরি হয়। এটাই দক্ষিণপন্থী রাজনীতি মাথা তোলার সুযোগ করে দেয়। যদিও তখনই তা তুঙ্গে ওঠার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে না। কিছুটা মধ্যপন্থা ঘেঁষা বামপন্থীরা এবং নিম্নবর্গ থেকে আসা পুরনো সমাজতন্ত্রীরা দ্রুত মন্ডল কমিশনের সংরক্ষণ সংক্রান্ত সুপারিশ কার্যে পরিণত করে তখনকার মতো ওই দক্ষিণপন্থী অভ্যুত্থানকে ঠেকিয়ে দিতে সক্ষম হয়। আগেই বলা হয়েছে, কিভাবে আঞ্চলিক স্তরের অনুন্নত শ্রেণীর জনপ্রিয়তাবাদী নেতারা রাজনীতির আঙ্গিনায় নতুন পরিভাষা যোগ করেছে, এবং আঞ্চলিক বা স্থানীয় ভাষাকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে ওই রাজনীতি দুর্বল হয়ে পড়ার সঙ্গেই দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদীরা তা থেকে শিক্ষা নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন রাজনৈতিক চাল দিল। তাদের রাজনীতিতে সমাজের কিছু অংশের অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে অপর অংশকে বর্জনের ব্যাপারটি আগেই ছিল, এবার তার সঙ্গে যোগ হল আধুনিকতা ও সনাতন ঐতিহ্যের ককটেল। এই অভিনব কৌশল দেশের গোটা রাজনীতিটাকেই আমূল বদলে দিল।

মনে রাখা দরকার, দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি বাস্তবের জমিতে পা দিতে পারল, কারণ, বি জে পির তরফে দেশের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে জনসংযোগের জন্য তাদের বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রেখে অসাধারণ স্ট্র্যাটেজি নেওয়া হয়েছিল। এটা লক্ষ্য করে Mcdonell ও Cabrera (2019) মন্তব্য করেন, বি জে পির জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি মুখ্যত এই জনসংযোগ এবং তাদের নেতা নরেন্দ্র মোদির প্রচারের কৌশলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৈরি হয়েছিল। এই প্রচারে সোশ্যাল মিডিয়াকে দারুণভাবে ব্যবহার করে দুটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়। প্রথমত, মোদির নেতৃত্বে গুজরাতের উন্নয়ন নিয়ে প্রচার করে 'গুজরাত মডেল'কে তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মোদিকে তার যাবতীয়

কৃতিত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, মোদিকে একজন শক্তিশালী নেতা হিসাবে তুলে ধরা দেখানোর সঙ্গে বোঝানো হয় যে দেশের এখন একজন এমনই শক্তিশালী নেতা দরকার (ibid:486)। তবে বি জে পির নির্বাচনী সাফল্যের সিংহভাগ কৃতিত্ব আধুনিক গণসংযোগ প্রযুক্তিকে দিলে ভুল করা হবে। ২০০৪ থেকে ২০১৪ কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মিতবাক, পরিশীলিত মনমোহন সিংহ, যাঁকে ''ভাগ্যক্রমে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন'' বলা হত। মোদি নির্বাচনী প্রচারে নেমে কংগ্রেসকে লাগাতার এই বলে আক্রমণ করে যান যে এরা দুর্নীতিগ্রস্ত, ক্ষমতাবান একটা এলিটগোষ্ঠী। একই সঙ্গে তিনি অন্য এক 'অপর' শ্রেণীর মানুষজনের বিরুদ্ধে এই বলে বিষোদ্গার চালিয়ে যান যে এরা 'সত্যিকারের ভারতীয় জনগণ' থেকে বিচ্ছিন্ন। ২০১৪ এবং ২০১৯, দুবারই লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে এই এলিট ও 'জনগণ'এর মধ্যে দূরত্ব ও বিরোধকে সুকৌশলে নির্মাণ করা হয়। 'নামদার' বনাম 'কামদার' (এলিট ও শ্রমজীবি শ্রেণী) জাতীয় বাক্যবন্ধ তখনই তৈরি হয়। শাহজাদা ও চায়ওয়ালা বা চৌকিদারের (রাজবংশ বনাম সাধারণ মানুষ) তুলনাও তখনই জোরকদমে প্রচারে তুলে ধরা হয়। যদিও এই এলিট বনাম 'জনগণ'এর মধ্যে জাতপাতের সমস্যাটির ঊর্দ্ধে ওঠার প্রয়াস ছিল, মনে রাখতে হবে যে এই কপটতার আড়ালে বিভিন্ন জাতগোষ্ঠীর মধ্যে বি জে পি এবং আর এস এস কর্মীদের নিরলস প্রচার ও সাংগঠনিক কাজও ছিল।

একাধিক গবেষক মনে করেন যে ক্ষমতাশীল শক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের আশঙ্কা ও ভয়ের ধারণাকে উসকে দেওয়ার প্রবণতা, এবং জনগণের জন্য ক্ষমতায় বদল আনার কথা বলাটার মধ্যেই জনপ্রিয়তাবাদের নিজস্ব চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নিহিত। রাজনীতি ও সমাজের উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ নেই, এবং সেই নিয়ন্ত্রণটা ফিরিয়ে আনতে হবে, এটাই জনপ্রিয়তাবাদের মূল বার্তা (Kriesi 2014:363)। এই বার্তাকেই বি জে পি দক্ষতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিল। টেলিভিশনে আন্না হাজারের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন দেখার পরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এরকম বহু ছোট ছোট আন্দোলন হয়েছে। তা থেকে সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রমশ এই ধারণার নির্মাণ করা হয় যে জনগণের হাতে রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ নেই এবং তা আদায় করা দরকার। ২০১৪ সালে নির্বাচনের আগে দেশের রাজনৈতিক আসর গরম করা হয় এই বলে যে একজন বুদ্ধিজীবি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এলিট ক্ষমতাশীল চক্রই কাজ করছে, এবং প্রধানমন্ত্রীকে 'রাজবংশ' (গান্ধী-নেহরু পরিবার) দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই আখ্যান জনগণের নিয়ন্ত্রণ হারানোর আখ্যানের সঙ্গে মিলে যায়। এবার এই নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের জন্য নতুন ভাবমূর্তি নির্মাণ ও সামাজিক ক্ষেত্রে জাতপাতের সমস্যাকে দক্ষতার সঙ্গে সামলানো দরকার হয়ে পড়ে। 'জনগণ'এর কাছে জনপ্রিয়তাবাদী আবেদন পৌঁছে দিতে বাকচাতুর্যভরা বক্তৃতা, সব শ্রেণীকে একত্র করার রাজনীতির কথা এবং কোনও নির্দিষ্ট চরিত্র বোঝা যাচ্ছে না, এমন ধরণের নতুন কিছু রাজনৈতিক দলকে জোটবদ্ধ করার প্রক্রিয়ার মধ্যেও জনপ্রিয়তাবাদের ছায়া দেখছেন গবেষকরা। (Albertazzi and McDonell 2008)।

বাস্তবে, মোদি নানান কথা সাজিয়ে নিজেকে একজন কর্মবীর হিসাবে মানুষের সামনে তুলে ধরেন। একই সঙ্গে তিনি বিকাশ বা উন্নয়নের প্রতীক হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। এ ছাড়াও কর্পোরেট দুনিয়া বা শিল্পমহল, জাতীয় স্তরে নতুন পরিকল্পনা এবং হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গী হয়ে প্রতিভাত হন। জেফ্রেলট (Jeffrelot 2015) দাবি করেন, নরেন্দ্র মোদি গুজরাতে তাঁর সরকার পরিচালনায় স্বঘোষিত সাফল্যকে গোটা দেশের উপর চাপিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর নির্বাচনী প্রচার জনপ্রিয়তাবাদ এবং নিজেকে কেন্দ্র করে তৈরি। নিজেকে, একজন বলিষ্ঠ পুরুষ হিসাবে, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্তত করেন না এবং কাজের মানুষ হিসাবে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেন। একজন ধুরন্ধর রাজনীতিক হওয়ার কারণে মোদি সহজেই প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে জনগণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন। তার সুযোগে নিজেকে সাধারণ মানুষেরই একজন এবং এলিটদের বিরোধী বলে জাহির করতে পারেন। তাঁর এই এলিট বিরোধিতার অন্য মাত্রাটিও গুরুত্বপূর্ণ, যে উদারপন্থীরা (যেমন শিল্পী, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ) তাঁর সরকারের সমালোচনা করেন, তাঁদের তীব্র সমালোচনা করে দেশবিরোধী তকমা দেওয়া হয়। (Ranjan 2018)

হিন্দি বলয়ে এই রাজনীতির দুটি নির্দিষ্ট চেহারা লক্ষ্য করা যায়। সুচতুর প্রচার কৌশলের সাহায্যে সাধারণভাবে জাতপাতকেন্দ্রিক রাজনীতিকে উপেক্ষা ও খর্ব করার প্রয়াস চলল, যা উচ্চবর্ণকে ২৫ বছর পরে হিন্দিবলয়ের রাজ্যগুলিতে হারানো ক্ষমতা উদ্ধারের আশায় উল্লাসিত করে তুলল। পাশাপাশি, প্রচারের ময়দানে নেমে মোদি এই জাতপাতের রাজনীতির নেতাদের নিশানা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, জাতপাতের ভিত্তিতে রাজনীতির দিনের অবসান হয়েছে, এখন অর্থনৈতিক মাপকাঠিকে ভিত্তি করে সমাজের বিভিন্ন অংশকে জোটবদ্ধ হতে হবে। হিন্দুসমাজের বর্ণপ্রথা যে তফশিল জাতি ও উপজাতি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের দুর্বল অংশকে ধারাবাহিকভাবে অন্যায় ও বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে, তা সচেতন ভাবে মোদি উপেক্ষা করে যান। তিনি বরং দাবি করেন, যে জাতপাত কেন্দ্রিক রাজনীতির নেতারা আর সংরক্ষণের মতো দাবি তুলতে পারবেন না। বলাবাহুল্য, মোদির এ সব কথা উচ্চবর্ণের মানুষের কানে মধুর সঙ্গীতের মতো বেজেছিল।

অন্যদিকে, সমাজের নিচুতলায় জাতপাতের সমস্যাকে সামাল দিতে আর এস এস কর্মীরা এবং দলীয় সংগঠনের মাধ্যমে বি জে পি কর্মীরা নিখুঁত পরিকল্পনায় কাজ করে চলেছিল। এক একটা নির্বাচনী কেন্দ্র ধরে ধরে বিভিন্ন ছোট ছোট জাতকেন্দ্রিক গোষ্ঠীকে তারা নিজেদের দিকে নিয়ে আসে, এবং ভোটদানে উৎসাহিত করে। বর্ণকাঠামোর নিচুতলায় পড়ে থাকা যে সব ছোট ছোট গোষ্ঠী উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন সমাজ পার্টি, এবং বিহারে আর জে ডি ও কংগ্রেস দলের কাজে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল, বিজেপি তাদের নিজেদের কাছে টানতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, এই নতুন সমীকরণে যাদব, জাতভ ও মুসলমানরা নির্বাচনী ক্ষেত্রে কোনঠাসা হয়ে পড়ে। দল হিসাবে জাতপাতের সমস্যার ঊর্দ্ধে উঠে সবাইকে নিয়ে চলার (সব কা সাথ, সব কা বিকাশ) কথা বলার সঙ্গেই

বি জে পি প্রকাশ্যেই তার পুরনো জনভিত্তির (উচ্চবর্ণ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়) প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছিল। মন্ডল আন্দোলনের পরে বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে নিম্নবর্ণের শক্তিশালী গোষ্ঠীর (যেমন যাদব) সঙ্গে মুসলমানদের আঁতাতের পরে উচ্চবর্ণের মানুষ কংগ্রেস ছেড়ে বি জে পির দিকে ঝুঁকে পড়ে। নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ও জাতপাত কেন্দ্রিক দলগুলির ভবিষ্যতের সরকার গড়ার জন্য মহাগাঁঠবন্ধনের প্রসঙ্গে বি জে পি প্রচারে জোর দিয়ে বলে যে কংগ্রেস আসলে উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে জাতপাতের রাজনীতির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। উচ্চবর্ণকে সঙ্গে পেতে শুধু বিরোধীদের সমালোচনা করেই বি জে পি ক্ষান্ত হয় নি, বরং ভোটের আগে একটা বড় চাল দেয় উচ্চবর্ণের মধ্যে আর্থিক দিক থেকে দুর্বলদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ঘোষণা করে। দেখাই যাচ্ছে, এই সংরক্ষণের হাতিয়ার ক্ষমতার রাজনীতিতে গুরুত্ব পাচ্ছে, এবং বি জে পি দাবি করছে যে ধনী শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণ এর স্বার্থরক্ষায় (তা উচ্চবর্ণের মধ্যে থেকেই গরিবদের জন্যই হোক, বা নিম্নবর্ণের ছোটখাটো গোষ্ঠীর জন্য হোক) তারা সদা সচেষ্ট।

এ ভাবে বহু অনুন্নত ওবিসি গোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করে জোট তৈরির মাধ্যমে বি জে পি কার্যত যাদবদের প্রভাবকে খর্ব করার চেষ্টা করে। তাদের এই নতুন জোটে বেশ কিছু দলিত সম্প্রদায়ের মানুষকেও সামিল হতে দেখা যায়। এদের দেখিয়ে বি জে পি এক নতুন সামাজিক ন্যায়ের আখ্যান নির্মাণ করা শুরু করে। ওবিসিদের মধ্যে যাদবদের মতো প্রভাবশালী সম্প্রদায়কে সামাজিক ন্যায়ের সব সুফল ভোগ করার অভিযোগ তুলে তাদের অন্য ওবিসিদের (যারা অনেক বঞ্চিত ছিল) থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চলে। সামাজিক গোষ্ঠীগুলির নিয়ে কাটাছেঁড়া করে নতুন সমীকরণ তৈরির সুফল ২০১৪ সালের নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে বি জে পি হাতেনাতে পেয়ে যায়। ২০১৭ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও সেই ধারা অব্যাহত থাকে। বিহারে ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও একই ধারা দেখা যায়। ভোটের সমীকরণে যেহেতু সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ এবং যাদব, জাতভ ও মুসলমানদের মিলিত শক্তি মোট ভোটদাতাদের ৪০ শতাংশ, তাই বি জে পি সচেতনভাবে তাদের বিরুদ্ধে বাকি ৬০ শতাংশকে জড়ো করার চেষ্টা চালিয়েছিল। সে জন্যই উচ্চবর্ণ, যাদব বাদে বাকি সব ছোটবড় জাতগোষ্ঠী, জাতভ বাদে সব দলিতকে এক জায়গায় এনে এই নতুন মহাজোট তৈরি করে। দলের ভাবমূর্তিতে প্রয়োজনীয় রদবদল আনতে বেশ কিছু নিম্নবর্ণ ও দলিত নেতাকে দলীয় সংগঠনে দায়িত্ব দিয়ে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু এভাবে নিম্নবর্ণের অন্তর্ভুক্তি যাতে উচ্চবর্ণের অসন্তোষের কারণ না হয়, সে জন্য কাউকে বাদ দিয়ে নয়, বরং সংগঠনের কাঠামোর প্রসার ঘটিয়ে নতুন নতুন পদ তৈরি করে তাদের আনা হয়। এই সব কৌশলের কারণে আগে যা যাদবদের কুক্ষিগত ছিল সেই নিম্নবর্ণের কম ক্ষমতাশালী বা কম প্রভাবশালী গোষ্ঠীদের সমর্থন অনেকাংশে বি জে পি প্রার্থীদের দিকে সরে আসে (Kumar 2019)। বি জে পির এই রণকৌশলে জাতগোষ্ঠী ও দলিতদের মধ্যে ধানুক, মৌর্য, সাখ্য, ধোবি, খটিক, রাজভর, পাসি প্রমুখ উপকৃত হয়। এমনিতে এরা ছোট ছোট গোষ্ঠী

হলেও একজোট হওয়ার কারণে সহজেই যাদব বা জাতভেদের মতো প্রভাবশালীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। এ ছাড়াও 'সমগ্র হিন্দুত্ব' (Narayan 2019) এর ধারণাকে চারিয়ে দিয়ে এবং সাংস্কৃতিক বন্ধন তৈরির মাধ্যমে তফশিল এবং ওবিসিকে 'হিন্দুত্ব' পরিবারের মধ্যে নিয়ে আসা শুরু হয়। এ জন্য নিম্নবর্ণের বহু নিজস্ব দেবতা, স্থানীয় ও জাতীয় বীর নায়কদের ঘিরে উৎসব, তাদের চিরাচরিত নানা রীতির উদযাপনের সঙ্গে আর এস এস কর্মীরা সামিল হতে শুরু করে। তবে, হিন্দুদের কাছে টানতে রামমন্দির, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপের বিষয়গুলি বি জে পি রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতেই থেকে যায়।

বি জে পির পক্ষে তাদের সামাজিক জনভিত্তির বিস্তার ঘটাতে একাধিক কৌশল নেওয়া হয়েছিল। ওয়াংখাড়ের মতে, বি জে পি লক্ষ্য করেছিল যে জাতপাত কেন্দ্রিক আন্দোলনে সম্মিলিত হলেও ভিন্ন ভিন্ন জাতগোষ্ঠীর মধ্যে অবিশ্বাস, ঈর্ষা, দ্বেষের সম্পর্ক বিদ্যমান। সেটা বুঝেই তারা এদের মধ্যে ফাটল ধরাতে উদ্যোগী হয়, যাতে সমস্ত নিম্নবর্ণ ও দলিত একজোট না হতে পারে। (Wankhade 2018) সে জন্য বেছে বেছে সেই সব জাতগোষ্ঠী ও দলিতদের একাংশকে উৎসাহ দিয়ে নিজেদের দিকে নিয়ে আসাটা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দলিতদের মধ্যে তারা খটিক, রাজভর, পাসি ও ধোবিদের একত্র করেছিল জাতভদের কোনঠাসা করতে, আর তফশিলদের মধ্যে যাদবদের কোনঠাসা করে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রতিষ্ঠা করতে ব্যবহার করে মৌর্য, কুর্মি ও লোধদের। (ibid)

মনে রাখা দরকার, গত দুই দশক ধরে অনুন্নত শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দূরত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্কে তিক্ততা বেড়ে যাচ্ছিল। ২০০১ সালের ২৮ জুন উত্তরপ্রদেশের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ ওবিসি অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সংরক্ষণের সুযোগসুবিধা ঠিকমতো পৌঁছনোর ব্যবস্থা করতে একটি সামাজিক ন্যায় কমিটি গঠন করেন। কমিটির রিপোর্ট কার্যকর করা না হলেও ওবিসির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের কাছে যে আনুপাতিক হারে সংরক্ষণের সুবিধা পৌঁছনো দরকার, তা সবার মনে গেঁথে যায়। বি জে পি এ নিয়ে চর্চা চালিয়ে যায়। এ ভাবে সংরক্ষণের নীতিকে দুভাগে বিভক্ত করার জন্য বি জে পি আগ্রহ গোপন করে না। তাদের বক্তব্য ছিল, কিছু গোষ্ঠী সংরক্ষণের যাবতীয় সুবিধা কুক্ষিগত করছে, তাই সংরক্ষণ নীতির সংস্কার করে সবচেয়ে অবহেলিত বঞ্চিতদের জন্যও সুযোগ তৈরি করা দরকার। বি জে পির কৌশল স্পষ্ট, একদিকে সমাজে প্রভাবশালী কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল উচ্চবর্ণ, অন্যদিকে, সামাজিক দিক থেকে প্রান্তিক ও রাজনীতিতে কোনঠাসা, অথচ সংখ্যায় বিপুল ছোট ছোট জাতগোষ্ঠী ও দলিত, এই দুইকে এক জায়গায় নিয়ে এসে নতুন জোট তৈরি করা। (Jha 2017)

অন্যভাবে দেখলে বলা যায়, বি জে পি এই রণকৌশলে বিভিন্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা ওবিসি এবং দলিতদের একত্র করেছিল। উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে গুজ্জর, ত্যাগি, ব্রাহ্মণ, সাইনি ও কাশ্যপদের জাতপাতের রাজনীতিতে তেমন গুরুত্ব ছিল না। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে সেখানে জাঠ, মুসলমান ও দলিত জোট (ওই এলাকায় যাদবরা নেই

বললেই চলে) সক্রিয়। বি জে পি এই সব পড়ে থাকা ছোট ছোট গোষ্ঠীর সংখ্যার গুরুত্ব বুঝেছিল। কিন্তু আর এস এস এর চিন্তায় যাদবদের পুরোপুরি বাদ দেওয়ার ভাবনা ছিল না। বরং তারা হিন্দুদের প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করতেই বেশি আগ্রহী ছিল। বি জে পি এবং আর এস এস এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ায় এসে এই নতুন জোট সমীকরণ তৈরি করে। এর সুবাদে বি জে পির রাজনীতিতে প্রধান উপাদান হয়ে উঠল জাতীয়তাবাদ, বিকাশ বা উন্নয়ন এবং মোদির ব্যক্তিপূজা। এটা দরকার হয়েছিল কারণ, তারা এমন অনেক সামাজিক গোষ্ঠীকে একসঙ্গে নিয়ে এসেছিল, যাদের সব বিভেদ ভুলে বি জে পিকে ভোট দিতে একটা জাতীয়তাবাদী আবেগ তৈরির প্রয়োজন ছিল। (Gurjar 2019)

আমরা দেখেছি যে দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদ জাতপাতের রাজনীতিতে আবদ্ধ মানুষদের মধ্যে একটা উদ্বেগ ও ক্ষোভ বঞ্চনাজনিত রাজনীতির সূচনা করেছিল। এটা সংরক্ষণের আওতায় পড়া এবং বাইরে থাকা মানুষ, সবার জন্যই সত্যি। দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদের রাজনৈতিক পরিসর খতিয়ে দেখে শাঁতাল মুফ বলেন, ''দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির প্রতি প্রচলিত ধারার রাজনৈতিক দলগুলির যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তা সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে''। Chantal Mouffe (2005:72) । দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদ সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার এক বিকল্প উপায় তুলে ধরে। এর ফলে সমাজের নিচুতলার মানুষের অবস্থার পরিবর্তনের আশা জাগে। পাশাপাশি, সমাজে প্রতিপত্তি হারানো উঁচুতলার মানুষদেরও সহমর্মিতা দেখায়। প্রশান্ত ঝা (Pranshant Jha 2017:178) মনে করেন, ''তারা চেষ্টা করেছিল, যাতে যা তারা পাচ্ছিল না সে কথা মনে করে হিন্দুরা ক্ষিপ্ত হয়, তারা চেয়েছিল যাতে মুসলমানদের বেশি তোয়াজ করার অভিযোগে হিন্দুদের অসন্তোষ আরও বাড়ে। তারা চেয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে যত সম্ভব বেশি সামাজিক গোষ্ঠীকে একত্র করা যায়। তারা চেয়েছিল, একটা সমধর্মী নাগরিকত্বের মধ্য দিয়ে একটি রাষ্ট্র নির্মাণ করতে, কিন্তু আসলে তারা সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।''

জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির এই আবহে দেশের ভোটদাতারা সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে ও আশঙ্কায় ভোগে। জনপ্রিয়তাবাদী নেতারা তাদের ক্রমাগত প্রতিষ্ঠানবিরোধী কথাবার্তা, ঢজনগণ প্রতারিত হয়েছে', সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য প্রকল্পের অর্থ ক্ষমতাসীন এলিট শ্রেণী লুঠ করছে, ইত্যাদি বলে ভোটদাতাদের মনে সন্দেহ ও শঙ্কা আরও বাড়িয়ে দেয়। তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে মোদি নিজেকে তাদেরই একজন বলে তুলে ধরে দাবি করেন, তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ছেন।

মোদির প্রচারের সুক্ষাতিসুক্ষ কায়দাগুলি বোঝার জন্য দেখা দরকার কীভাবে প্রতীককে ব্যবহার করা হচ্ছে? এ রাজা দেখিয়েছেন, 'নিজেকে তিনি গরিবের স্বার্থ ও ধনীর স্বার্থ, বাস্তব জগৎ ও স্বপ্নের জগৎ, এই দুই বৈপরীত্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকারী হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। (Raja 2018)। এটা একটা পরাবাস্তব জগৎ সৃষ্টির চেষ্টা,

যেখানে মোদি তাঁর জাদুকাঠি দিয়ে সবাইকে নিয়ে আসবেন।" (ibid)। আধুনিকতা, উন্নয়ন এবং নয়া উদারনৈতিক চিন্তা, সব মিলিয়ে মিশিয়ে তৈরি জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির এই আবেদন জাতীয়তাবাদী ও নয়া উদারবাদী ভোটদাতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। (Kinnvall 2019) । নিজেকে আধুনিক ভারতের রূপকার হিসাবে জাহির করার সঙ্গেই মোদি তাঁর গড়ে তোলা ভাবমূর্তিতে আরও যে সব রঙ লাগান, তা একজন প্রগতিশীল মানুষের, যিনি একইসঙ্গে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়েন ও বাজার অর্থনীতির পক্ষে দাঁড়ান। মোদির জনপ্রিয়তাবাদী নীতি রাষ্ট্রকে একটা পৌরুষ চরিত্র দেয়, যা স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে নিজের অস্তিত্ব জোর গলায় ঘোষণা করতে পারে। একদিক থেকে দেখলে গোটা দেশের মানুষকে তাদের নানা বৈচিত্র, নানা বিভেদ মিটিয়ে এক অভিন্ন 'জনগণ' (এক দেশ, এক জাতি, এক প্রাণ) তৈরির জন্য মোদির জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি চেষ্টা করেছে ঠিকই, কিন্তু তা সফল হয়নি। তবে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে ''এই সেতুবন্ধনের প্রচেষ্টাটাই সামাজিক পরিচয়ের গন্ডিকে রাজনীতির পরিসরে তুলে ধরার কাজকে সংজ্ঞায়িত করে,'' (Laclau– 2007, p.154) এবং এতদিন যারা রাজনীতির পরিমন্ডলে ছিল না, তাদের সেখানে নিয়ে আসার কাজ করে। সমাজকে দুই বিবাদমান পক্ষে বিভক্ত করে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি শেষ পর্যন্ত একটা 'জনগণ' তৈরি করে, ''যা কিন্তু গোটা সমাজ থেকে আকারে ছোট। অথচ, একই সঙ্গে প্রচার চালায় সেটাকেই পূর্ণ সমাজের বৈধতা দেওয়ার চেষ্টায়,'' (Laclau 2005, 81)। দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি 'জনগণ'এর মধ্যে জমে থাকা অপূর্ণতার ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক পরিসরকে পুরোপুরি দখল করতে চায়। কিন্তু তাদের এই লক্ষ্যে ব্যবহৃত বাগশৈলী, স্লোগান ইত্যাদি অনেকাংশেই জনগণের কাছে অর্থবহ হয়ে পৌঁছায় না।

উপসংহার ঃ

এই প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, একদিকে বামপন্থী বা সমাজতন্ত্রী এবং অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী ও জাতীয়তাবাদী, এই দুই ধরণের জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিই জনগণকে কাছে টানতে জাতপাতের সমীকরণের অঙ্ক কষে এগোয়, সেই সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী বা গোষ্ঠীকে নিয়ে জোট গঠনের চেষ্টা করে। আর এটা করা হয় সামাজিক ন্যায়ের পতাকা তুলে ধরে। এ থেকে বোঝা যায়, জনপ্রিয়তাবাদ আসলে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার, যার সাহায্যে বিভিন্ন দাবিদার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের পরিকল্পনা হাসিল করার চেষ্টা করে থাকে। সাধারণ মানুষের মনে জনপ্রিয়তাবাদ যে সহজেই বিপুল সাড়া জাগাতে পারে, তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে এই আকাঙ্ক্ষাগুলি সমাজের একটা বড় আংশের মধ্যে আগে থেকেই কোনও না কোনও আকারে জায়মান ছিল। জনপ্রিয়তাবাদ একই সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন অংশকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসে, আর সমাজের বঞ্চিত আবহেলিত শ্রেণীর মানুষের মনে আশা জাগাতে পারে। মোদির দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রী কর্পূরি ঠাকুর লালুপ্রসাদের সামাজিক ন্যায়কেন্দ্রিক জনপ্রিয়তাবাদ, দুটোই দেখা যাচ্ছে ল্যাকলাউয়ের দেওয়া লক্ষণ বা

বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। যেমন ক) প্রচলিত রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবস্থার প্রতি তীব্র বিদ্বেষ, খ) এতদিনকার রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে প্রতি চরম অবিশ্বাস, গ) সমাজের এক বা একাধিক শ্রেণীর ভিত্তিতে রাজনীতি নয়, 'সাধারণ মানুষ'কে কাছে টানার চেষ্টা, এবং ঘ) বুদ্ধিজীবিদের প্রতি অসহিষ্ণুতা (Laclau 1979)। জনপ্রিয়তাবাদী নেতাদের নিজেকে অত্যন্ত সাধারণ মানুষ ও অত্যন্ত সাধারণ দরিদ্র পরিবার থেকে আসা বলে পরিচয় তৈরির চেষ্টা, এবং প্রকাশ্যেই ইংরেজিভাষী এলিটদেরর প্রতি তাচ্ছিল্য ও বিরোধিতা প্রদর্শণ আসলে রাজনৈতিক পরিসরে 'সাধারণ মানুষ'এর দাবিকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হিসাবে দেখা যায়। এই দুই ধরণের জনপ্রিয়তাবাদের ক্ষেত্রেই জনগণই গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিষ্ঠান নয়। বরং, প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা করা ও তার পরিসরকে সংকুচিত করার কাজটা জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির কৌশলেরই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অন্যভাবে দেখলে বলা যায়, এই দুই ধরণের জনপ্রিয়তাবাদই গণতন্ত্রের পরিচালন ব্যবস্থায় চিরাচরিত উদারনৈতিক রীতিনীতিকে অগ্রাহ্য করে তার জায়গায় রাষ্ট্রের পরিচালন ব্যবস্থায় ইচ্ছেমতো অপ্রচলিত রীতি তৈরি করে সেই মতো কাজ করে থাকে, এবং তা অবশ্যই জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির আলোচনা, বাস্তবে তার অনুশীলন দেখে বোঝা যায় যে আদতে এটা রাজনীতি গণতন্ত্রের পরিচালনব্যবস্থায় একধরণের দক্ষতা নিয়ে আসে। একই সঙ্গে ভুললে চলবে না যে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি অনেক গণতান্ত্রিক, এবং সমস্ত মানুষের সমঅধিকারের কথা অনেক বেশি করে বলে। যদিও তাদের সমর্থক বা তাদের রাজনীতিতে অনুরক্ত গোষ্ঠীগুলি সাধারণত ভিন্ন, তবুও মনে রাখতে হবে যে বাম ও দক্ষিণ উভয় জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিই নিজের নিজের জনগণের মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে আশঙ্কা, ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠার বীজ বপন করে তাকে অন্য রাজনৈতিক দলগুলির রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা করে। স্বৈরাচারী, অগণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় আসা রাজনীতিকদের বিপরীতে জনপ্রিয়তাবাদী নেতারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের বৈধতা অর্জন করে নেয়। তারপর তারা নিজেদের দেশের সমস্ত জনগণের ইচ্ছার একমাত্র প্রতিনিধি হওয়ার দাবি তোলে। তবে, এ ধরণের রাজনীতির বৈশিষ্ট্যই হল, তা অনেকটা অস্পষ্টতা নিয়েই এগিয়ে চলে। জনপ্রিয়তাবাদী নেতারাও তাদের কাজেকর্মে এবং কথাবার্তায় এই অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতাকে বহন করে চলে।

অনুবাদক ঃ শুভম মাইতি

References

1. Albertazzi D., McDonnell D. (2008) Introduction: The Sceptre and the Spectre. In: Albertazzi D., McDonnell D. (eds) Twenty-First Century Populism. Palgrave Macmillan, London
2. Aryavarta, (25 December 1970). Patna.
3. Blair. Harry. W. (1980). "Rising Kulaks and Backward Classes in Bihar: Social Change in the Late 1970s". Economic and Political Weekly, vol. 15, no. 2, (12 January)
4. Ernesto Laclau, (1979). Politics and Ideology in Marxist Theory, London: Verso Publications.
5. Gurjar, Vishesh Pratap. (2019). Why Caste Matters: Reading Electoral outcomes through the optics of caste. Economic and Political Weekly, vol.15, no.2 (12 January)
6. Gupta, Dipankar. (2019). Caste and Electoral Outcomes Misreading Hierarchy and the Illusion of Numbers. Economic and Political Weekly. Vol 54, No 32. Pp 76-78
7. Inglehart, Ronald. (2016). "Inequality and Modernization: Why Equality Is likely to Make a Comeback." Foreign Affairs 95(1): 2–10.
8. Jaffrelot, Christopher. (2015). The Modi-centric BJP 2014 election campaign: new techniques and old tactics. Contemporary South Asia, 2015Vol. 23, No. 2, 151–166
9. Jaffrelot, Christophe and Louise Tillin. (2017). Populism in India. The Oxford Handbook of Populism
10. Edited by Cristóbal Rovira Kaltwasser, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and Pierre Ostiguy. Online publication 10.1093/oxfordhb/9780198803560.013.7
11. Jansen, Robert S. (2011). Populist Mobilization: A New Theoretical Approach to Populism. Sociological Theory, Vol. 29, No. 2 (June 2011), pp. 75-96

12. Jha, Manish K and Pushpendra Kumar. (2015). Governing Caste and Managing Conflicts: Bihar, 1990-2011, in Ranabir Samaddar (ed.) "Government of Peace: Social Government, Security and the Problematic of Peace", Surrey: Ashgate Publishing.

13. Jha, Manish K. (2019). Bihar in the Sixties and Seventies: The Enigmatic Figure of Karpoori Thakur. In Ranabir Samaddar (Ed.), From Popular Movements to Rebellion: The Naxalite Decade, New York: Routledge.

14. Jha, Prashant (2017): How the BJP Wins, Delhi: Juggernaut.

15. Kinnvall, Catarina. (2019). Populism, ontological insecurity and Hindutva: Modi and the masculinization of Indian politics. Cambridge Review of International Affairs,

16. Vol. 32, No. 3, 283–302,

17. Kinnvall, Catarina and Ted Svensson (2019) 'Differentiated citizenship: multiculturalism, secularism and Indian foreign policy' in Johannes Dragsbaek Schmidt and Shantanu Chakrabarti (eds) The Interface of Domestic and International Factors in India's Foreign Policy. Delhi: Oxford University Press.

18. Kishore, Roshan. (28 July 2019). Locating Class, or lack of it, in Indian Politics. Hindustan Times. https://www.hindustantimes.com/editorials/locating-class-or-lack-of-it-in-india-s-politics/story-DImS03yZXBZ2atTxE8Na8J.html Accessed on 30th July 2019.

19. Kriesi, Hanspeter. (2014). "The Populist Challenge." West European Politics 37, no. 2: 361–378.

20. Kumar, Mithilesh. (2017). Making of a Populist Government: A Study of Karpoori Thakur's Regime. People, Politics and Protests VI. Kolkata: Policies and Practices. Pp 15-20.

21. Kumar, Sajjan. (April 18, 2019). The limits of Populism. https://www.thehindu.com/opinion/lead/the-limits-of-populism/article26867609.ece accessed on 20th April 2019

22. Laclau, Ernesto. (2005) On populist reason. London; New York: Verso.

23. Laclau, Ernesto. (1979). Politics and Ideology in Marxist Theory, London: Verso Publications.

24. McDonnell, Duncan & Luis Cabrera. (2019). The right-wing populism of India's Bharatiya Janata Party (and why comparativists should care), Democratization, 26:3, 484-501.

25. Mouffe, Chantall (2005): On the Political, London: Routledge.

26. Moffitt, B. (2016). The global rise of populism. Stanford, CA: Stanford University Press.

27. Mudde, Cas, and Cristobel Rovira Kaltwasser. (2013). Exclusionary vs Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe and Latin America. Government and Opposition. Vol 48 No 2. Pp 147-74.

28. Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). Populism: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press.

29. Narayan, Badri. (November 19, 2018). It is back to The Hindutva Card in Uttar Pradesh. The Hindustan Times. https://www.hindustantimes.com/analysis/it-is-back-to-the-hindutva-card-in-uttar-pradesh/story-m8Sym8XEFxkwWXZvCUlsON.html Accessed on 30th July 2019.

30. Palshikar, Suhas and K.C. Suri. (2017). Critical Shifts in 2014 Election in Suhas Palshikar, Sanjay Kumar and Sanjay Lodha Eds Electoral Politics in India: The Resurgence of Bhartiya Janata Party. New York: Routledge.

31. Raja, A. (2018). Mr Modi: Deliberately Appearing Dionysian. International Journal of Research and Analytical Reviews, 5 (4), 70-73.

32. Ranjan, Prabhash. (2018). Is Populism Synonymous with Right wing? The Wire. 28th November. https://thewire.in/politics/populism-india-narendra-modi-indira-gandhi Accessed on 9th August 2019

33. Richards, Barry (2013) 'Extreme nationalism and the hatred of the liberal state' in N. Demertzis (ed) Emotions in politics: the

affect dimension in political tension. Basingstoke: Palgrave, 124–142

34. Shils, Edward. (1956). The Torment of Secrecy. Melbourne: Heinemann.

35. Vreese, Claes H. de, Frank Esser, Toril Aalberg, Carsten Reinemann, and James Stanyer. (2018). "Populism as an Expression of Political Communication Content and Style: A New Perspective." The International Journal of Press/Politics 23, no. 4 (October 2018): 423–38.

36. Wankhade, Harish S. (3rd August 2018). The BJP's New Caste Politics in Uttar Pradesh. https://thewire.in/politics/caste-politics-bjp-uttar-pradesh-2019-elections Accessed on 31st July 2019

37. Weyland, K. (2001), 'Clarifying a Contested Concept. Populism in the Study of Latin American Politics', Comparative Politics, 34(1): 1–22

38. Witsoe, Jeffrey (2006): 'Social Justice and Stalled Development: Caste Empowerment and the Breakdown of Government in Bihar', India in Transition, Philadelphia: Centre for the Advanced Study of India, University of Pennsylvania

39. Witsoe, Jeffrey. (2009). "'Territorial Democracy: Caste, Dominance and Electoral Practices in Postcolonial India", PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, vol. 32, no. 1.

40. Witsoe, Jeffrey (2011). "Corruption as Power: Caste and the Political Imagination of the Postcolonial State", American Ethnologist, vol. 38 no. 1, pp 73-85

সমসাময়িক ভারতে রাজনৈতিক দল এবং জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি: আম আদমি পার্টি

সুমনা দাশগুপ্ত

ভূমিকা ঃ

'জনপ্রিয়তাবাদ'এর সংজ্ঞা নিয়ে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রয়েছে। যদিও গত দশক থেকেই উক্ত পরিভাষাটির ব্যবহার বেড়েছে, তবুও সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে পরিভাষাটির ব্যবহার হয় মুখ্যত নিন্দাসূচক এবং শঙ্কাজনিত মনোভাব থেকে। কারণ, এটা প্রায়শই দেখা যায় যে, কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক নেতারা তাদের তৎকালীন লাভের আশায় জনগণের ভয় এবং উদ্বেগকে কাজে লাগিয়ে এই রাজনীতি করে থাকে। । জনপ্রিয়তাবাদ নিয়ে একটি আরও অর্থবহ ছবি পাওয়া যায় পুঁজিবাদ সম্পর্কে শ্রমজীবি শ্রেণীর মোহমুক্তির প্রেক্ষাপটে, পুঁজিবাদের এই সঙ্কটকে ন্যান্সি ফ্রেজার দেখেছেন, বিশ্বজুড়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকামী মূলধনী পুঁজির সঙ্কট হিসাবে। অনেকে আবার জনপ্রিয়তাবাদকে দেখে থাকেন অনিয়ন্ত্রিত পুঁজি ও পুঁজির স্বাধীন গতিবিধির নয়া উদারনৈতিক রাজনীতির পাল্টা ব্যবস্থার একটা স্বীকৃতির রাজনীতি হিসাবে (Fraser 2018)। জনপ্রিয়তাবাদকে যে ভাবেই দেখা হোক না কেন, এই জনপ্রিয়তাবাদ কিভাবে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, তা নিয়েও নানা মতামত রয়েছে।

এই প্রবন্ধে আমরা মতবাদ হিসাবে 'জনপ্রিয়তাবাদ'-এর সংজ্ঞা তৈরি করার চেষ্টা না করে ভারতের রাজনীতির প্রেক্ষিতে এটিকে বোঝার চেষ্টা করব। যেমন সেই সব নীতি, কৌশল ও আন্দোলনের দিকে তাকানো হবে, যারা একদিকে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে সমাজের দরিদ্রতম মানুষদের স্বার্থে সম্পদের পুনর্বন্টনের উপর জোর দেয় অন্যদিকে, সমাজের ক্ষমতাবান এলিট শ্রেণী বা বৃহৎ পুঁজির স্বার্থের বিপরীতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ায়। জনপ্রিয়তাবাদী নীতি বা আন্দোলন মতাদর্শগতভাবে দক্ষিণপন্থী, নাকি বামপন্থী, এর শিকড় কি গণতন্ত্রে, নাকি স্বৈরতন্ত্রে, এটি কি শুধুই রাজনৈতিক আন্দোলন, না কি নিছক চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা কিছু বাক্‌শৈলীর আখ্যান, সেই আলোচনার মধ্যে ডুবে

যাওয়ার বদলে এটা মনে রাখা দরকার যে 'জনগণ' ও 'এলিট', এই দুইয়ের পারস্পরিক বৈসাদৃশ্যের সম্পর্কের মধ্যেই জনপ্রিয়তাবাদ কথাটির অর্থ অনেক স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

বর্তমান প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে আম আদমি পার্টি (সংক্ষেপে, আপ)-র নির্দিষ্ট কিছু জনপ্রিয় নীতি খতিয়ে দেখার মাধ্যমে এই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিকে বোঝার চেষ্টা করা হবে। রাজনৈতিক দল হিসাবে আপ এর জন্মই হয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি জনপ্রিয় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। উক্ত দলের নামের মধ্যেই 'আম আদমি' বা সাধারণ মানুষকে সচেতনভাবে জায়গা করে দিয়ে 'জনগণ' এবং এলিট শাসকশ্রেণীর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য তৈরি করা হয়েছে। এর সূচনাপর্ব, রাজনৈতিক অবস্থান এবং জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি ঝোঁক এবং কিছু নির্দিষ্ট নীতির মধ্য দিয়ে বোঝার চেষ্টা হবে, কি করে 'সাধারণ মানুষের জন্য' একটি আন্দোলন পরে রাজনৈতিক দলের রূপান্তরিত হয়, এবং সেই দল 'আম আদমি'-র জন্য ইতিবাচক নীতি তৈরি করতে উদ্যোগী হয়। এই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি সরকারি নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে, এবং তার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিসরে কতটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে, সেটাও দেখা দরকার।

জনপ্রিয়তাবাদ একটা ব্যবহারিক সংজ্ঞা নির্মাণের প্রচেষ্টা ঃ

'জনপ্রিয়তাবাদ' পরিভাষাটি ব্যবহারের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে যা এই প্রবন্ধে বিবেচ্য নয়। শুধু মনে রাখা যেতে পারে যে এই কথাটির সৃষ্টি উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকায় ব্যাঙ্কগুলির তরফে মজুত সোনার অনুপাতে বাজারে টাকা ছাড়ার অধিকার (gold standard) এর বিরুদ্ধে কৃষক-শ্রমিক এবং খনি শ্রমিকদের আন্দোলন এবং লাতিন আমেরিকার পেরোনিজম আন্দোলন (আর্জেন্তিনার জনপ্রিয় নেতা হুয়ান পেরনের নেতৃত্বাধীন আন্দোলন) থেকে (Roderik 2018)। সমসাময়িক জনপ্রিয়তাবাদ ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মাথা তুলেছে। উদাহরণ হিসাবে ইউরোপের অভিবাসন বিরোধী দল এবং তাদের নীতি, দেশের বাসিন্দাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ট্রাম্পের বাণিজ্য বিরোধী চুক্তি, লাতিন আমেরিকারতে উগো সাভেজের অর্থনৈতিক জনপ্রিয়তাবাদ, ব্রিটেনে ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টির উত্থান এবং ভারতে ২০১১ সালের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের কথা বলা যায়। রডরিকের মতে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের সুবাদে গোটা দুনিয়াকে একসূত্রে গাঁথার ফলে সমাজে যে ধাক্কা লেগেছে, তার মধ্যে জনপ্রিয়তাবাদের সূচনার একটা উৎস রয়ে গেছে। রডরিক এটাকে বলছেন 'globalization shocks'। তাঁর যুক্তি, প্রযুক্তির দুনিয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন, অন্যায্য বাজার ব্যাবস্থা, শ্রমিকদের কাজের নিরাপত্তা হারানো এবং আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যবৃদ্ধি ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ার কারণেই এখনকার জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি মাথা তুলছে। এই জনপ্রিয়তাবাদের বিভিন্ন ধারার মধ্যেই উপস্থিত চারটি বৈশিষ্ট্যকে তিনি চিহ্নিত করছেন; যথা- প্রতিষ্ঠান বিরোধী ঝোঁক, এলিট অংশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের জন্য লড়াই করার

দাবি, উদারনৈতিক অর্থনীতি বিশ্বায়নের বিরোধিতা, এবং স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার প্রতি ঝোঁক।

জনপ্রিয়তাবাদের ভিন্ন ভিন্ন ধারার সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা যতটা সহজ, জনপ্রিয়তাবাদের একটা সর্বজনগ্রাহ্য ধারণা ও একটা ব্যবহারিক সংজ্ঞা তৈরির কাজটা মোটেই তত সহজ নয়। দেখা যাচ্ছে যে গত দশকে জনপ্রিয়তাবাদকে কেউ কেউ একটি মতাদর্শ হিসেবে দেখতে চাইছেন (Mudde and Kaltwasser 2012), কারও মতে এটি আন্দোলন সংঘটিত করার পদ্ধতি মাত্র (Taggard 1995), আবার কারও কারও মতে, এটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জনগণের সঙ্গে জনসংযোগের একটা কৌশল (Shils 1972; Laclau 2005)।

দীর্ঘ দিন ধরে এই পরিভাষাটি নানা অর্থে ব্যবহার হওয়ার কারণে কিভাবে এটি তার নিজের অর্থের তাৎপর্যকে ধরে রাখতে পারবে, সে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। সম্ভবত, একটিই উপায় আছে, সুব্রামনিয়ামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী (Subramanyam 2007) জনপ্রিয়তাবাদের মধ্যে নিহিত বিরোধাত্মক ধারণা (oppositional concept) দিয়ে তাকে বোঝা সম্ভব।। তাঁর মতে, যদি জনপ্রিয়তাবাদ জনগণের মধ্য থেকেই এসে থাকে, এবং তার কর্মসূচি, আন্দোলন, নীতি সবই জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়, তাহলে সেখানে বিরোধাত্মক ধারণায় জনগণের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে থাকে ক্ষমতাশীল এলিট শ্রেণী। তিনি (Subramanyam (2007) বলছেন, বাস্তবে এটি রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সম্পদের পুনর্বন্টনের দাবিতে আন্দোলনের চেহারা নিতে পারে। আবার গণতান্ত্রিক পরিসরে জনপ্রিয়তাবাদ জনগণ ও তার নেতা বা সরকারের মধ্যে কোনও মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পছন্দ করে না, বরং, এই দুইয়ের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ দেখায়। এর প্রকাশ কখনও গণভোট বা অন্য কোনও জনপ্রিয় উদ্যোগের মধ্য দিয়ে ঘটতে পারে, যেমন আমেরিকার কিছু রাজ্যে হয়েছে, এবং সুইজারল্যান্ডের মত প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দেশে আরও সরাসরি প্রক্রিয়ায় হয়েছে। আবার স্বৈরাচারী ব্যবস্থায় একজন জনচিত্তজয়ী নেতাকে কেন্দ্র করেই জনপ্রিয়তাবাদ সক্রিয় হয়, নিজের শক্তি সংহত করতে সেই নেতা দাবি করেন যে তাঁর কাজের মধ্য দিয়েই জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হচ্ছে। যেমন, লাতিন আমেরিকার হুয়ান পেরন এবং উগো সাভেজের মতো নেতারা করেছেন। এই ধরনের জনপ্রিয়তাবাদের এই শেষতম দৃষ্টান্তই সাধারণের চোখে জনপ্রিয়তাবাদ বলতে একটা সস্তা নেতিবাচক ধারণা হয়ে দাঁড়ায় এবং তা ব্যবহার করা হয় কোনও রাজনৈতিক দল, প্রকল্প বা কর্মসূচি ও নীতিকে হেয় করার জন্য (Lara 2018)।

অর্থনৈতিক পুনর্বন্টনের প্রশ্নে জনপ্রিয়তাবাদ পরিভাষাটি ব্যবহার হয়ে থাকে সমাজের নূন্যতম সুবিধাভোগীদের মধ্যে সম্পদের পুনর্বন্টনের নীতির ক্ষেত্রে। এটা হতে পারে প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা চালু করা, বা আরও সরাসরি গরিবদের সুযোগসুবিধা পাইয়ে দিতে কিছু কল্যাণকামী প্রকল্প করার ক্ষেত্রে। যেমন, গরিবদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান, নানা ক্ষেত্রে নগদে অর্থসাহায্য করা, ভর্তুকি প্রদান, ঋণ মকুব করা ইত্যাদি

(Subramanyam 2007)। এই ধরণের জনপ্রিয়তাবাদী নীতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর বেড়ে চলা ঋণ ও মুদ্রাস্ফীতির চাপের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়া নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তা প্রাপ্তির লাভকেই বড় করে দেখতে চায়।

বর্তমান প্রবন্ধে জনপ্রিয়তাবাদের এই ধারণাকে ভিত্তি করে তুলনামূলকভাবে নতুন রাজনৈতিক দল আম আদমি পার্টি বা আপ-কে বোঝার চেষ্টা হবে। আপাতভাবে একটি জনপ্রিয়তাবাদী আন্দোলন থেকে উঠে আসা এই দলের নীতি ও কর্মধারার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে জনপ্রিয়তাবাদের সম্পর্কের বিচার করারও চেষ্টা হবে। একদিক থেকে দেখলে লাতিন আমেরিকার মার্কসবাদী চিন্তাবিদ ল্যাকলাউ তাঁর বিখ্যাত অন পপুলিস্ট রিজন (On Populist Reason, 2005) বইয়ে যেমন ভাবে জনপ্রিয়তাবাদী আন্দোলনকে চিহ্নিত করেছিলেন, দিল্লির আপ সম্ভবত তার একটা আদর্শ নমুনা। ল্যাকলাউ মনে করেন, বিশেষ কোনও ঐতিহাসিক মুহূর্তে সমাজে একই সঙ্গে বহু দ্বন্দ্ব বা বৈরিতার সম্পর্ক থাকতে পারে, যার সঙ্গে শ্রেণীচেতনার কোনও সম্পর্ক নেই। এই সব বৈরিতার কারণেই সাধারণ মানুষ সম্মিলিতভাবে একটা নতুন পরিচয়কে আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হয়। ল্যাকলাউ এটাকে বলছেন প্রতীকি অর্থবাহী (empty signifier or floating signifier)। তাঁর মতে, এই অবস্থা থেকেই জনগণ রাজনীতির পরিসরে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সাধারণ মানুষ যখন এই প্রতীকি অর্থের সঙ্গে নিজে একাত্মবোধ করে, তখন সে এর রাজনৈতিক বক্তব্যকেও আত্মস্থ করে, যার পরিণামে জনপ্রিয়তাবাদী আন্দোলন জন্ম নেয় এবং সেই আন্দোলন বৈপ্লবিক আন্দোলন থেকে আলাদা। (Sampath 2015)

যে প্রতীকি অর্থবাহিতার মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে, তা কোনও নির্দিষ্ট মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং, তা স্বৈরাচারী ধারণা থেকে শুরু করে যে কোনও মতাদর্শেরই জনপ্রিয়তাবাদী ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। অর্থাৎ, কোনও বিশেষ মুহূর্তে কোনও একটি মতাদর্শের রাজনীতি জনপ্রিয়তাবাদী ধারণাকে আশ্রয় করতেও পারে, নাও করতে পারে। মতাদর্শ হিসাবে দেখার বদলে ল্যাকলাউ জনপ্রিয়তাবাদকে এক ধরণের রাজনীতির নির্মাণ বলে দাবি করেছেন, যা কিনা সমাজকে দুটি পৃথক স্তরে, যুযুধান শিবিরে বিভক্ত হিসাবে দেখতে চায়। একটি সমাজের উপরের দিকে অবস্থিত, অন্যটি সমাজের নিচুতলায়। আর নিচুতলায় অবস্থিতরা সমাজের মাথার উপরে উঠে আসতে চায়। যে প্রক্রিয়ায় নিচুতলার বহুধাবিভক্ত মানুষ এক জায়গায় জড়ো হয় বা হতে পারে, তাকে ল্যাকলাউ অভিহিত করেছেন সমমানে পৌঁছনোর যুক্তি (logic of equivalence) বলে। এর ফলে, এতদিন ধরে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, পানীয় জল, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি সাধারণ মানুষের যে সব দাবিদাওয়া বিচ্ছিন্নভাবে রাষ্ট্রের কাছে তোলার চেষ্টা হচ্ছিল, এবার সে সবই একত্র হয়ে একটা সার্বজনীন চেহারা পেয়ে যায় এবং সোচ্চার হয়। তার পরেও যদি সরকারি প্রশাসন তাতে কর্ণপাত না করে, তখন ওই না মেটা দাবির সমবেত চেহারা বদলে যায় সবার শত্রুর বিরুদ্ধে আন্দোলনে। (Laclau 2005)

আপ এর ক্ষেত্রে এই প্রতীকি অর্থবাহীতা (empty signifier বা floating signifier) ছিল নাগরিকদের একটি নতুন চেতনার পরিচয়ের মধ্যে, যা তাদের নিষ্ক্রিয় জনতা থেকে সক্রিয় জনগণে রূপান্তরিত করে। ফলে তা এলিট শ্রেণীর অপশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উৎসাহিত করে । সমাজে যে বৈরিতার সম্পর্কের কথা ল্যাকলাউ বলেন, তা আপ এর জন্মদাতা দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের সূচনাপর্ব থেকেই দৃশ্যমান ছিল। যে আম আদমি এতদিন এলিটদের কুক্ষিগত সরকারি ক্ষমতায় নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাচ্ছিল না, তাদেরই এবার ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে সমবেত করা হয়। তার পরিণামে দুর্নীতিই জনগণের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, এবং সেই দুর্নীতির প্রতীক হয়ে ওঠে এলিট রাজনৈতিক শ্রেণী। মনে রাখতে হবে যে এই দুর্নীতির শিকার হিসাবে 'আম আদমি'কে সনাক্ত করার ফলে ''তা সমাজের মধ্যে থাকা বিভাজনকেই খুঁচিয়ে তুললেও তা শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতির দিকে মোড় নেয় না।" (Sampath 2015)। কারা এই 'আম আদমি'? তারা কৃষক হতে পারে, নির্মাণশিল্পে যুক্ত শ্রমিক হতে পারে, আবার একজন ব্যাঙ্কার বা সাংবাদিকও হতে পারে। অর্থাৎ, ল্যাকলাউ বর্ণিত লক্ষণগুলি আপ এর মধ্যে ভালোভাবেই বিদ্যমান। কারণ, এই 'আম আদমি' ধারণাটা পরিবর্তনশীল।" একদিকে তা সমাজের একেবারে নিচের তলায় পড়ে থাকা মানুষের কথা বলে, আবার একই সঙ্গে তা সমগ্র জনগণকে বোঝায় (Sampath 2015)। এ জন্যই আম আদমি পার্টি সমাজের সব শ্রেণীর, বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী সবার সমর্থন জোগাড় করতে সফল হয়েছিল।

আপ যে পথ ধরে এগিয়েছে ঃ

কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের আমলে নানা দুর্নীতি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত সরকারের বিরুদ্ধে ২০১১ সালের এপ্রিলে আন্না হাজারের নেতৃত্বে India Against Corruption, সংক্ষেপে IAC, (দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভারত) ব্যানারের তলায় নাগরিক সমাজের যে আন্দোলন হয়, সেখান থেকেই আপ এর পথ চলার শুরু। নানা স্তরের বিভিন্ন মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে গড়ে ওঠা এই যৌথ আন্দোলনের দাবি ছিল পার্লামেন্টে জন লোকপাল বিল পাস করে দুর্নীতিকে খতম করতে হবে।

আপ এর ওয়েব সাইটে নিজেদের ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে তারা এই আন্দোলনের বিবরণ দিয়ে জানিয়েছে কিভাবে তা রূপান্তরিত হয়েছে রাজনৈতিক দলে।[১] তাদের ব্যাখ্যায় ঃ

দীর্ঘ দুবছর ধরে অসংখ্য ছোট শহর, গ্রাম ও বড় শহরে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই আন্দোলনের জন্য নিজেদের সংগঠিত করেছে। তাদের উদ্যোগেই রাজনৈতিক নেতাদের ঘেরাও, প্রতিবাদ মিছিল, স্যোশাল মিডিয়ায় প্রচার শুরু হয়। হাজার হাজার মানুষ আন্না হাজারের নেতৃত্বে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জন লোকপাল বিলের সর্মথনে অনশনে বসে এবং সরকারকে মানুষের দাবি মেনে কাজ করতে চাপ সৃষ্টি করে। তৃতীয় এবং শেষ অনশনের পর, আই এ সি-র তরফে সবরকম চেষ্টার পরেও, পার্লামেন্টে জন লোকপাল বিল পাশ করানো যায়নি।

তখন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বে আই এ সি-র কিছু কর্মী ঠিক করে রাজনীতিতে যোগ দেবে এবং সরকারে এসে গোটা ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করবে। এটাই ছিল দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের রাজনৈতিক বিপ্লব যা আম আদমি পার্টি নামে পথচলা শুরু করে।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে আরও যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যোগেন্দ্র যাদব, আনন্দ ঝা, প্রশান্ত ভূষণ এবং শান্তি ভূষণ বিশিষ্ট। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে কাজ করে থাকেন। গোড়ায় আপ-এর কাজের ধারার মধ্যে একটা যৌথ নেতৃত্বের ভাবনা প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন ধরণের মানুষকে নেতৃমন্ডলীর মধ্যে নিয়ে আসার ফলে আপ এর মধ্য দিয়ে তার জনপ্রিয়তাবাদী ভাবমূর্তির সঙ্গে সংগতি রেখেই সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটার সম্ভাবনাও জাগে। যদিও কিছুদিনের মধ্যেই এই যৌথ নেতৃত্বের ব্যবস্থা ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যায়, গোড়ার দিকের বেশির ভাগ নেতাই দল ছেড়ে চলে যান, এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল দলে যৌথ নেতৃত্বের ধারণাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে একছত্র নেতা হিসাবে সামনে উঠে আসেন। তার পর থেকে এ পর্যন্ত কেজরিওয়াল দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখেই তার সঙ্গে আরও একগুচ্ছ জনপ্রিয়তাবাদী প্রকল্প যোগ করে চলেছেন। এভাবেই আপ তার 'বিকল্প রাজনীতি'র আশা জিইয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে।

আপ-এর ওয়েব সাইটয়ে[২] তুলে ধরা তাদের জন্মের যে ইতিহাস রয়েছে, তাতে কিভাবে তারা নিজেদের অবস্থান ও গতিপথকে বর্ণনা করছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায়। তাদের আখ্যান একটি ভাবনাকে ঘিরেই তৈরি। একদিকে সমাজের ক্ষমতাবান এলিট শ্রেণী বিশাল দুর্নীতির থেকে বিরাট মুনাফা করে চলেছে, অন্যদিকে সাধারণ নাগরিকরা ক্রমাগত বঞ্চনার শিকার হয়ে চলেছে। এই দুইয়ের মধ্যে যে শত্রুতার সম্পর্ক রয়েছে, তাকে ঘিরেই আপ এর রাজনীতি তৈরি হয়েছে। এটা বোঝার জন্য ২০১৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আপ এর জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে তাকানো যেতে পারে

ক) দলীয় সদস্যপদ 'জনগণ', বা সাধারণ মানুষেরা যে কেউ ইচ্ছে করলেই আপ এর সদস্যপদ পেতে পারে। এ ভাবে আম অওরত ও আম আদমির জন্য দলে সদস্যপদ লাভের জন্য দরজা খুলে দিয়ে আপ এক ব্যতিক্রমী নজির তৈরি করে, যা ভারতের অন্য রাজনৈতিক দলগুলির ইতিহাসে কখনই করার কথা ভাবা হয়নি। দেশের জাতিগোষ্ঠী, সম্প্রদায়কেন্দ্রিক দলীয় রাজনীতির যে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, আপ সেই প্রথা ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে পুরুষ ও নারী, যুবক যুবতী ও বৃদ্ধ বৃদ্ধা, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে রাজনীতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে এবং এতদিন ধরে চলে আসা রাজনীতির ধারাকে বদলানোর জন্য কাজ করতে একটা সুযোগ উপহার দেয়।

খ) দলীয় তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ এই অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতিকে পূর্ণ রূপে স্বচ্ছ করে তোলা হয়। একবার সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে আপ নেতৃত্বের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় তাদের মতাদর্শের

সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটা পদ্ধতিতে তহবিল সংগ্রহ করা। সেটা একমাত্র অর্থসংগ্রহের পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা এনেই করা যায়। এ ক্ষেত্রে আপ জনগণের কাছ থেকে অল্প অল্প অর্থসাহায্য চেয়ে আবেদন করতে শুরু করে। দলের কাজকর্মের ব্যয় মেটাতে এ ভাবে প্রকাশ্যে অল্প অল্প পরিমাণের অর্থ সংগ্রহ (crowd sourcing) করায় সহজেই তাদের হিসাবপত্রেও স্বচ্ছতা আনা সম্ভব হয়। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এ কাজে আপ-ই পথিকৃৎ।

গ) দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনে আপ প্রথমবার লড়াই করে ২০১৩ সালে। তখন তারা নির্বাচনী প্রচারে সাধারণ মানুষের বিদ্যুতের এবং পানীয় জলের জন্য অস্বাভাবিক চড়া হারে বিল আদায়ের বিষয়কে জোরের সঙ্গে তুলে ধরে। এই অস্বাভাবিক চড়া হারের বিলের জন্য তারা কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থাগুলি ও পানীয় জলের ট্যাঙ্কার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মাফিয়াদের গোপন আঁতাতের অভিযোগ তোলে। লক্ষ্যণীয়, জল ও বিদ্যুৎ, সমস্ত মানুষের কাছে জরুরি এই দুই বিষয়কে তুলে ধরে তারা ব্যাপকহারে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয় এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিজেদের জেহাদি ভাবমূর্তি জনগণের মনে গেঁথে দিতে পারে।

এই জনপ্রিয় দাবিকে নির্বাচনী প্রচারের হাতিয়ার করে আপ দল প্রথমবার ভোটে অংশ নিয়েই দিল্লির মোট ৭০টি আসনের মধ্যে ২৮টি জিতে নেয়। জনগণের সঙ্গে সলা পরামর্শ করার পরে আপ একটি সংখ্যালঘু সরকার গঠন করে এবং ২০১৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর অরবিন্দ কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। কিন্তু বিধানসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যা না থাকায় জন লোকপাল বিল পাশ করাতে পারে না, যার জেরে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেজরিওয়াল সরকার ইস্তফা দিয়ে নতুন করে জনাদেশ চেয়ে নির্বাচনে যায়। কিন্তু দিল্লি বিধানসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন হওয়ার আগেই ২০১৪ সালে লোকসভার নির্বাচন হলে সেখানে আপ দিল্লির সাতটি আসনের মধ্যে সাতটিতেই হেরে যায়। তা সত্ত্বেও আপ আবার তার হারানো ক্ষেত্র ফিরে পায় দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে। তারা মোট ৭০টি আসনের মধ্যে ৬৭টিতেই জয়ী হয় এবং মোট ৫৪% ভোট পায়, যা একটা রেকর্ড।

নির্বাচন পরবর্তী সময়ে আপ এর জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির কিছু তথ্য ঃ

আপ-এর জনপ্রিয়তাবাদের প্রতি ঝোঁক নির্বাচন পরবর্তী সময়ে নানা দিকে বিস্তার লাভ করে। এখানে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হচ্ছে ,

১. দলীয় সংবিধান রচনা।
২. দিল্লি সংলাপ, সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে সংবিধান রচনার চেষ্টা।
৩. সরকারি প্রশাসনের কাজের ক্ষেত্রে নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরির চেষ্টায় গ্রামসভা ও মহল্লাসভার ক্ষমতায়ণ করা।
৪. নির্বাচনের সময় ছাড়াও বিভিন্ন ইস্যুতে জনগণের মতামত নিয়ে কাজ করার চেষ্টা।

৫. নাগরিকদের প্রত্যক্ষ বা সরাসরি ভূমিকাকে উৎসাহ দান।

৬. স্বচ্ছ এবং দায়বদ্ধ প্রশাসন উপহার দেওয়ার জন্য নতুন করে অঙ্গীকার করা।

আপ তাদের দলীয় সংবিধানের দুই নং ধারায় বলেছে, গণতন্ত্র আসলে স্বশাসনের জনপ্রিয় ধারণা মাত্র। কিন্তু গণতন্ত্রের যে ধারা এ দেশে চলছে, তাতে এই ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে নাগরিকদের নিছক প্রজায় পরিণত করে দেওয়া হয়। সে কারণেই আপ এই ''জনগণের হাতে ক্ষমতা পুনরায় ন্যাস্ত করতে'' আগ্রহী। এ ভাবেই তারা সংবিধানে প্রদত্ত স্বরাজের প্রতিশ্রুতিকে পূরণ করার কথা ভাবে। আপ এর এ সব কথাবার্তার সঙ্গে জনপ্রিয়তাবাদ সম্পর্কে তাত্ত্বিক বক্তব্যের মিল যথেষ্ট।[৩]

''জনগণের হাতে ক্ষমতা পুনরায় ন্যস্ত করা''র মতাদর্শগত অবস্থান থেকেই আপ তাদের দলীয় সংবিধানে রাজনীতিকে ''সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় এবং ধারাবাহিক কথোপকথনের প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে। ২০১৪ সালের নভেম্বরে দিল্লি বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার পর পরই আপ তাদের ''দিল্লি সংলাপ'' শুরু করে। এই সংলাপের প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষকে তাদের দলীয় সংবিধান রচনার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে উৎসাহিত করার মধ্য দিয়ে নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ পেতে শুরু করে। তার সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের মতামত ও পরামর্শ জুড়ে দিল্লির সমস্ত বাসিন্দাদের জন্য একটি ৭০ দফা কর্মসূচি তৈরি হয়। তাতে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ, যুবসমাজ, মহিলা, ব্যবসায়ী, শিল্পোদ্যোগী, গ্রামীন ও শহুরে এলাকার মানুষ, সাফাই কর্মী, সংখ্যালঘু, বেআইনী কলোনি, ঝুগগি ঝুপড়ির বাসিন্দা, সমবায়ের ভিত্তিতে গড়া আবাসন, আবাসিক কল্যাণ সমিতি ইত্যাদি সবার জন্য প্রকল্পের কথা বলা হয়। এই দিল্লি সংলাপের উদ্দেশ্য ছিল, এমন একটি কর্মসূচি তৈরি করা যা দিল্লির সব শ্রেণীর নাগরিকদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করতে পারবে, বিশেষ করে সবার জন্য কর্মসৃজন, উন্নত মানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা, মহিলাদের সুরক্ষা, আরও ভালো রাস্তাঘাট, যাতায়াতের ব্যবস্থা, উন্নত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সস্তা দরে বিদ্যুৎ ও পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়। এমন এক দিল্লির কথা ভাবা হয়, যেখানে সমস্ত নাগরিকই মহানগরীর উন্নতির সমান অংশীদার হতে পারে। (Party Manifesto 2015)[4]

রাজনীতিতে প্রবেশ করার সময়েই আপ এর ভাবনায় স্বরাজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কেমন হওয়া উচিত সে ব্যাপারে তাদের একটা ধারণা ছিল। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের 'স্বরাজ' (২০১২) বইয়ে তার প্রমাণ রয়েছে। ওই বইয়ে তিনি যুক্তি দেন, গ্রামসভা ও মহল্লা সভাকে ক্ষমতা দিতে হবে যাতে তারা সরকারি কর্মী নিয়োগ ও প্রয়োজনে প্রত্যাহার করতে পারে। গ্রামের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই গ্রামসভার সদস্য হিসাবে কাজে অংশ নেওয়ার অধিকারী। কেজরিওয়ালের মতে, ''যে দিন ভারতের প্রতিটি গ্রামে গ্রামসভার হাতে এই ক্ষমতা আসবে, সেদিন থেকেই জনগণ সংসদের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারবে'' (Kejriwal 2012)। সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় এই পরিবর্তন আনার পিছনে কেজরিওয়ালদের ধারণা ছিল যে নিচুতলার এই প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্নীতিমুক্ত থাকবে,

আর নিতান্তই দুর্নীতি হলেও তা প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তর থেকে শুরু করে সর্বত্র যে ব্যাপক দুর্নীতি রয়েছে, তার তুলনায় নগণ্য হবে। এই চিন্তার সারমর্ম কেজরিওয়ালের 'স্বরাজ' (২০১২) বইয়ে রয়েছে।

''অনেকের বিশ্বাস, গ্রামসভার হাতে সরাসরি টাকা দিলে মানুষ তার অপপ্রয়োগই করবে। এ ব্যাপারে আমাদের প্রশ্ন অপপ্রয়োগটা কী ভাবে হবে? ধরে নেওয়া যাক, এমন তো হতে পারে যে যদি প্রতিটি গ্রামসভাকে তিন কোটি টাকা করে দেওয়া হল এবং গ্রামের লোকজন সেই টাকা হয় রেখে দিল বা নিজেরা ভাগ করে নিল। নিজেদের উন্নয়নের কাজে ওই টাকা লাগালো না। এখানেই আমাদের বক্তব্য, এমন যদি হয় তো সেটাই হোক। এমনিতেই তো এখনও প্রতিদিনই উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ সমস্ত টাকা রাজনীতিকরা, আমলারা, কলেক্টর, বি ডি ও, তহশিলদার, সবাই মিলে লুঠ করছে। যদি গ্রামবাসীরা সভা করে সবাই মিলে বরাদ্দ অর্থ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে চায়, সে ক্ষেত্রে তাই করতে দেওয়া হোক।''

আপ বিশ্বাস করত যে যেহেতু জনগণ নিজেদের উন্নয়নের প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখবে, তাই বাস্তবে সরকারি অর্থের অপব্যবহার হবে না। যদি দুর্নীতি হয়, তা হলে তা ঠেকানোর জন্য কি ধরণের ব্যবস্থা রাখা দরকার সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ধারণা তাদের নথিতে পাওয়া যায় না। জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির মূল সুর অর্থাৎ ''জনগণ বনাম এলিট শ্রেণী'', এর ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আপ নেতা মনে করেন, যদি নিচুতলায় একটু আধটু দুর্নীতি ঘটেই তা হলে তা নিয়ে অত মাথা না ঘামালেও চলবে। কেজরিওয়াল এটা স্বীকার করেন যে এমন হতেই পারে যে গ্রামসভা অর্থের অপব্যবহার করল বা সরপঞ্চ তহবিল তছরুপ করল। কিন্তু ''নতুন ব্যবস্থায় আমরা চাই যে কত টাকা কোন খাতে বরাদ্দ করা হচ্ছে, এবং গ্রামবাসীদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে নির্দিষ্ট প্রকল্পে ওই টাকা খরচ করার ক্ষমতা কাদের হাতে থাকবে, সে সবই স্পষ্ট ও স্বচ্ছ করে বলা থাকুক। একবার জনগণ সরপঞ্চ, বি ডি ও, কলেক্টর এবং সরকারি কর্তাদের মুখের উপর কথা বলার সাহস দেখাতে পারলেই রাজনৈতিক নেতা ও সংশ্লিষ্ট সরকারি আমলাদের পক্ষে সরকারি বরাদ্দ অর্থ নয়ছয় করা কঠিন হয়ে যাবে।''

আপ এর জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি থেকে স্পষ্ট, সাধারণ মানুষের দুর্নীতিমুক্ত সরকারি পরিষেবা পাওয়ার অধিকার দিতে তারা আন্তরিক থাকলেও বিষয়টিকে তারা একটু বেশি সরলভাবে দেখেছিল। তাদের সপক্ষের যুক্তি একটাই, একবার দ্রুত গ্রামসভার বা পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু মতাদর্শের মূল দিকগুলি কি কি হবে, কী ভাবেই বা সেই অনুযায়ী কর্মসূচি (Action Plan) তৈরি হবে, বাজেটের উপর তার ধাক্কা কতটা পড়বে, --এ সব নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা অনুপস্থিত। উল্টে, আপ এর জোরালো দাবি, তারা তাদের জনপ্রিয়তাবাদী কর্মসূচি কী হবে তা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে বেশি সময় নষ্ট করার চাইতে কাজে নামার উপর জোর দিতেই বেশি আগ্রহী। এই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিতে তারা সাধারণ মানুষের স্বার্থে সম্পদের পুনর্বন্টন এবং তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশীদার করতে চেয়েছিল।

রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করার পরে আপ কী ভাবে কাজ করল, সেটাও দেখা দরকার। মনে রাখতে হবে, তাদের জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির আবশ্যিক অঙ্গ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের রীতি মেনে ২০১৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরে জনগণের সঙ্গে আলোচনায় বসে বোঝার চেষ্টা করেছিল যে আসনের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু জেনেও তাদের সরকার গড়ার সিদ্ধান্তে মানুষের সায় রয়েছে কিনা। কিন্তু ৪৯ দিন সরকার চালানোর পরেই কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার আগে কিন্তু জনগণের মতামত জানার চেষ্টা করেন নি। সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া এই রাজনৈতিক দল একটু একটু করে বুঝতে শুরু করছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি জনগণের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। জনপ্রিয়তাবাদী তত্ত্ব বা নীতি সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। আপ এর তরফে নাগরিকদের সক্রিয় ভূমিকা নিতে উৎসাহ দেওয়ার পরিণতি কী হতে পারে, তার একটা বেনজির দৃষ্টান্ত যখন তাদের দুর্নীতিপরায়ন সরকারি কর্মী ও অফিসারদের বিরুদ্ধে স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে স্টিং অপারেশন চালাতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ব্যাপারটা এতদূর গড়ায় যে শেষে দলের মধ্যেই একে অন্যের বিরুদ্ধে স্টিং অপারেশন শুরু হয়, যার প্রতিবাদে যোগেন্দ্র যাদব, শাজিয়া ইলমি প্রমুখ প্রথম সারির নেতারা দল ছেড়ে চলে যান। (Jayal 2016)।

এন জয়ালের মতে, জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার অধৈর্য মনোভাব। এ ছাড়া বিদেশি এবং অন্য জাতির মানুষের প্রতি বিরাগ ও অভিযোগের আঙুল তোলার প্রবণতাও দেখা যায়। এই মানসিকতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন ধরা পড়ে ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে দিল্লির খিরকি এক্সটেনশন এলাকায়, যখন আপ সরকারের তদানীন্তন আইনমন্ত্রী টিভি চ্যানেলের ক্যামেরাম্যানদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌঁছে পুলিশকে কোনও সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই উগান্ডার চারজন মহিলার বাড়িতে ঢোকার নির্দেশ দেন। মন্ত্রীর দাবি ছিল, উগান্ডার ওই মহিলারা মাদক চোরাচালান ও পতিতাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত। গোটা ঘটনাটাই বুঝিয়ে দেয় জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি যদি নাগরিককে নিজের হাতে আইন তুলে নিতে এবং সহনাগরিকদের উপর নজরদারি চালাতে উৎসাহ দেয়, তা হলে তা কীরকম বিপজ্জনক রকম হিংস্র ও জাতিদ্বেষী হয়ে উঠতে পারে। নিজের জনপ্রিয়তাবাদী অবস্থানে অনড় থেকে ওই মন্ত্রী কিন্তু দাবি করতেই থাকেন যে যখন তিনি ওখানে যান, তখন তাঁর সঙ্গে এলাকার সাধারণ মানুষরাও ছিলেন। এই ঘটনার প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া হয়, এবং আপ দলের মধ্য থেকেও, বিশেষ করে দলের মহিলা সদস্যদের তরফে প্রতিবাদ শুরু হয়। আপ প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম মধু ভাদুড়ি এর সমালোচনায় বলেন, ''মেয়েদের অধিকারের প্রশ্নে আপ এর মানসিকতার সঙ্গে খাপ পঞ্চায়েতের মানসিকতার মিল রয়েছে, তাই আপ নেতৃত্ব খাপ পঞ্চয়েতের কাজের সাফাই গায়।''[৫]

আপ দলের জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি শুধুই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই ও কাজের পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা আনার উপর দাঁড় করানো হয়েছিল। বাকি সব এই রাজনীতি থেকেই উদ্ভূত। তাদের রাজনীতিতে কাজের পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা আনার বিষয়টি কোনও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর

উপায় বা মাধ্যম নয়, বরং, স্বচ্ছতা বজায় রাখাই তাদের অভীষ্ট। এই ব্যাপারটা নিয়ে আপ নেতাদের মনে এতটাই চিন্তা ছিল যে তাঁরা দলের অর্থনৈতিক নীতির দীর্ঘমেয়াদী রূপরেখা কী হওয়া উচিত, তা নিয়ে ভালো করে ভাবনাচিন্তা করার অবসরই পান নি। এমনও হতে পারে যে এ নিয়ে দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে মতৈক্যের অভাব থাকার কারণেই দলের ইস্তাহারের (manifesto) খসড়া চূড়ান্ত করতে দেরি হচ্ছিল। (Jayal 2016)

আপ এর জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি যে ভাবে এগিয়েছে, তা থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়। প্রথমত, ক্রমশই বোঝা যাচ্ছিল, জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি মাত্রই যে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাজ করে, এটা বোধহয় ভুল ধারণা ছিল। দল হিসাবে আপের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ কেজরিওয়াল দলের প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন। টিভিতে সম্প্রচারিত বিজ্ঞাপনে কেজরিওয়ালকে দলের ত্রাতা বলে বর্ণণা করা শুরু হল। করদাতাদের বিপুল অর্থ খরচ করে কেজরিওয়ালের ছবি সহ বিজ্ঞাপন দেওয়া শুরু হল, যেখানে দলের নাম ও দলীয় প্রতীককে ছাপিয়ে বড় করে দেখানো হতে থাকে কেজরিওয়ালকে।[৬] যে দল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দাবি তুলে সরকার গড়েছে, তাদের নেতারাই ক্রমশ ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে শুরু করায় এ নিয়ে দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা বাড়তে থাকে। (Jayal 2016)। পি রাই মনে করিয়ে দেন, আপ দলের মধ্যে বেড়ে চলা ব্যক্তিপুজার বিষয়টি নজিরবিহীন, কারণ এটা যে কোনও মানুষের আত্মসম্মান তো বটেই, আত্মরতিকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির ইতিহাসে এটা নজিরবিহীন। ''এক দিকে দল হিসাবে আপ জনগণকে রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার করার ক্ষেত্রে ভারতের রাজনীতিতে পথিকৃৎ হওয়ার কৃতিত্ব দাবি করছিল, অন্যদিকে, তাদের দলীয় কাঠামোর মধ্যেই আন্তঃপার্টি গণতন্ত্র ছিল না (Rai 2017)। আপ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম মধু ভাদুড়ি সেজন্যই দল ছাড়ার সময় বলেছিলেন, আপ দলের মধ্যে বিরুদ্ধ মত প্রকাশের সুযোগ নেই। তিনি মনে করিয়ে দেন, খিড়কি এক্সটেনশনের বাড়িতে আপ মন্ত্রীর বেআইনী হানার ঘটনায় প্রতিবাদ করার জন্য দলের মধ্যে তাঁকে কী ভাবে কোনঠাসা করে দেওয়া হয়েছিল। (Bhaduri 2016)

দ্বিতীয়ত, দেখাই যাচ্ছিল যে মুখ্যত 'জনগণ' ও 'ক্ষমতাশীল এলিট শ্রেণী' এই দুইয়ের মধ্যে বৈরিতার সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই আপ এর জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে আপ শুধুই 'জনগণ' ও রাজনীতিকদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের অভাবের বিষয়টিকে জোর দিয়ে বলতে চেয়েছিল। কিন্তু দেশের রাজনীতির মধ্যে, ক্ষমতার টানাপোড়েনের মধ্যে যে অনেক জটিল সম্পর্ক থাকে, সেখানে সমাজের শ্রেণী, জাতপাত, ধর্ম, নারী-পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং এরকম আরও অনেক ব্যাপার মিশে থাকে, সে দিকে আপ আদৌ নজর দেয় নি।। ফলে, রাজনীতিকে দুর্নীতিমুক্ত ও জনগণকে ক্ষমতার অংশীদার করার জন্য আপ এর প্রস্তাব বাস্তবে প্রযুক্তিবিদদের মাধ্যমে রাজনীতির জটিল সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপ রাজনীতির একটা নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা করে শ্রীরূপা রায় (২০১৪) দেখিয়েছেন, আপ এর কার্যপদ্ধতি মোটামুটি

একটা নিয়মকেই আঁকড়ে ধরেছিল। আপ নেতাদের মতে, ছোট বড় যে সমস্যাই দেখা দিক, তার একটা সহজ সমাধান রয়েছে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে রুল বুক মেনে কাজ করতে বলা (See Madhu Bhaduri)। যেন, এটা করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। শ্রীরূপা বেশ কয়েকটি ঘটনা পরীক্ষা করে দেখেছেন। কোথাও একজন নাগরিক থানায় অভিযোগ নথিভুক্ত করতে গিয়ে অসুবিধায় পড়েছেন, কোথাও বা সাধারণভাবে গ্রাহ্য পরিচয়পত্র না থাকার কারণে ভোটার তালিকায় নিজের নাম নথিভুক্তকরতে পারছেন না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আপ কর্মীরা হস্তক্ষেপ করে সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করেছে। এ জন্য তারা প্রাসঙ্গিক আইনের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখে প্রশাসন ও সাধারণ মনুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছে।

আপ ও তার জনপ্রিয়তাবাদী নীতিসমূহ ঃ

আপ এর একগুচ্ছ নীতিসংক্রান্ত সিদ্ধান্তের মধ্যেই তার জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি প্রতিফলিত। যেমন,

১. দিল্লি জনলোকপাল বিল।
২. স্বরাজ বিল।
৩. বিদ্যুতের বিলের পরিমাণ হ্রাস।
৪. পানীয়জলে নাগরিকের অধিকারের স্বীকৃতি।
৫. নতুন নতুন সরকারি স্কুল।
৬. উচ্চশিক্ষার সুযোগের গ্যারান্টি।
৭. শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার।
৮. স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি ঘটানো।
৯. মহিলাদের নিরাপত্তায় আলাদা বাহিনী।
১০. ভূমি সংস্কার।
১১. খুচরো ব্যবসায় সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করা।
১২. উদ্বাস্তু কলোনির বাসিন্দাদের জমির মালিকানা প্রদান।
১৩. সরকারি স্বীকৃতি না পাওয়া কলোনিগুলিকে স্বীকৃতি দান।
১৪. সবার জন্য সুলভে বাড়ি।
১৫. বস্তি বা ঝুগ্গি ঝোপড়ি যেখানে রয়েছে, সেখানে রেখেই তাদের উন্নত পরিষেবা।

এই সব নীতিগত সিদ্ধান্ত ও কাজ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ বর্তমান প্রবন্ধে নেই। সে জন্য, এর মধ্য থেকে কয়েকটি ইস্যুকে বেছে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যেহেতু বিজলি-পানি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য আপ দলের রাজনীতির কেন্দ্রে অবস্থিত, তাই এই কয়টিকে একটু খতিয়ে দেখে বোঝার চেষ্টা হবে রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর তাদের অভিঘাত কি হয়েছিল।

বিজলি-পানি ঃ আপ প্রথমবার নির্বাচনে লড়েছিল এই দুই ইস্যুকে আঁকড়ে ধরে। সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় এই দুই জরুরি পরিষেবাকে ঘিরে ক্ষমতার উচ্চমহলে দুর্নীতি ও

মাফিয়ারাজ কীভাবে তাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে, সে কথাই নির্বাচনী প্রচারে তারা তুলে ধরেছিল। ২০১৫ সালের অগস্টে ক্ষমতায় এসে আপ সরকার দিল্লির অধিবাসীদের মাসে ২০,০০০ লিটার পর্যন্ত পানীয় জল বিনামূল্যে দিতে শুরু করে, সেই সঙ্গে যে সব পরিবারের বিদ্যুতের ব্যবহার মাসে ৪০০ ইউনিটের কম, তাদের বিদ্যুতের বিল কমিয়ে অর্ধেক করে দেয়। অবশ্যই এর প্রভাব পড়ল সরকারের অর্থভান্ডারের উপর। দলীয় ইস্তাহারে পূর্বঘোষিত এই দুই প্রতিশ্রুতি পালন করতে গিয়ে সরকারকে বিপুল ভর্তুকি দিতে হচ্ছিল। আপ স্বীকার করে যে বিনা মূল্যে জল সরবরাহ করতে গিয়ে সরকারকে বছরে ১৪০০ কোটি টাকা এবং বিদ্যুতের জন্য আরও ২৫০ কোটি টাকা গুনতে হচ্ছে।[৭] এহেন জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির জন্য যে আর্থিক ক্ষেত্রে চড়া মাশুল দিতে হয়, সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের মন্তব্য, দিল্লির অধিবাসীদের বিনামূল্যে পানীয় জল দেওয়ার জন্য আপ সরকারের নীতির ফলে ''সরকারি অর্থের বিশাল অপচয় হবে।''[৮] দিল্লি হাইকোর্টও বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়ায় আপত্তি জানিয়ে বলে, ''কোনও কিছুই বিনামূল্যে দেওয়া উচিত নয়, শুধু একমাত্র যাদের সত্যিকারের দরকার, যেমন ঝুগগি ঝোপড়ি বাসিন্দাদের এটা দেওয়া যেতে পারে।'' বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার হিসাব অনুযায়ী আপ সরকারের পক্ষে এই নীতি দীর্ঘ মেয়াদে ধরে রাখা কঠিন। এর ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষমতা হ্রাস পেতে বাধ্য।[৯]

এই বিজলি-পানি ইস্যু প্রসঙ্গে কেজরিওয়ালের প্রতিক্রিয়া থেকে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি নিয়ে এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হয়েছে তার সমর্থন মেলে। দ্য হিন্দু পত্রিকায় (২ অগস্ট, ২০১৯) কেজরিওয়াল বলেন, ''আমি জানি, বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়ার জন্য টেলিভিশন বিতর্কে আমার তীব্র সমালোচনা করা হবে। দেশের রাজনীতিকরা, মন্ত্রীরা, সাংসদ, বিধায়ক, উঁচু পদে আসীন আমলারা সবাই বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ পাচ্ছেন, কিন্তু তা নিয়ে তো কেউ হৈচৈ করে না! আমি তো শুধু সেই ব্যবস্থাকে যারা দিনরাত পরিশ্রম করে সৎভাবে পরিবার প্রতিপালন করে, সেই আম আদমিদের জন্য প্রসারিত করছি। দেশের রাজনীতিবিদ ও আমলারা যে সুবিধা পায়, সেটাই আম আদমিদের দিচ্ছি। এভাবে যদি আম আদমিদের খাস আদমির মর্যাদা দেওয়া হয়, তা হলে এর মধ্যে অন্যায়টা কোথায়?''[১০]

সমাজের ক্ষমতাবান এলিট শ্রেণীর বিরোধিতা যে রাজনীতির মূলে রয়েছে, তা এখানে কোনও রাখঢাক না করেই তুলে ধরে আম আদমি বনাম রাজনীতিক ও আমলা শ্রেণীর সমীকরণে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থনৈতিক বিবেচনায় এই নীতি যতই অবাস্তব বলে তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে দাবি করা হোক, সেই যুক্তির বিরুদ্ধে এটাই জনপ্রিয়তাবাদের পাল্টা যুক্তি।

শিক্ষা ও সরকারি স্কুল ঃ

দিল্লির বেসরকারি স্কুল ও সরকারি স্কুলের মধ্যে পরিকাঠামো, পঠনপাঠনের মান ইত্যাদির মধ্যে যে বিশাল ফারাক, তা সংশোধন করে একটা ভারসাম্য আনার জন্য আম আদমি

পার্টির চেষ্টা তাদের আর একটা জনপ্রিয়তাবাদী নীতি। সরকারি স্কুলেই রাজ্যের বহু ছাত্রছাত্রী পড়ে, আর তাদের মধ্যে বেশিরভাগই প্রথম প্রজন্মের ছাত্রছাত্রী। শিক্ষা দফতরের ভারপ্রাপ্ত রাজ্যের উপ মুখ্যমন্ত্রী মনীশ শিশোদিয়া সরকারি স্কুলের জন্য বরাদ্দ এক ধাপে ৩৩ শতাংশ বাড়িয়ে দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটান। তারপরে ১০০০টি সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের সিঙ্গাপুর ও ফিনল্যান্ডে পাঠিয়ে তাঁদের আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিয় করান, যাতে তাঁরা নিজেদের স্কুলে তা প্রয়োগ করতে পারেন। স্কুলের পরিচালন সমিতিতে নির্বাচিত অভিভাবকদের ও সমাজকর্মীদের এনে ছাত্রছাত্রীদের অঙ্ক ও পড়তে শেখার প্রাথমিক দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেন। এটা করা হয় মিশন চুনৌতি (২০১৬) ও মিশন বুনিয়াদ (২০১৮) নামে দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে। স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং পরিচালন সমিতিতে প্রথম বার অভিভাবকদের জায়গা করে দেওয়ার মতো কাজ সকলের বাহবা পেলেও ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতার তারতম্যের ভিত্তিতে তাদের আলাদা আলাদা গ্রুপে ভাগ করার ব্যাপারটা নিয়ে অনিতা রামপালের মতো অনেক শিক্ষাবিদ কড়া সমালোচনা করেন। তাঁদের বক্তব্য, এটা ভুল শিক্ষণপদ্ধতি।[১১] তবে সামগ্রিকভাবে আপ সরকারের স্কুলশিক্ষার উন্নতির জন্য কর্মসূচি ছাত্র ও অভিভাবকমহলে প্রশংসিত।[১২] বিনামূল্যে বিজলি পানি দেওয়ার তুলনায় ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে শিক্ষায় এই বিনিয়োগের সুফল ইতিমধ্যেই ফলতে শুরু করেছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা ঃ

আপ তাদের দলীয় ইস্তাহারেই (২০১৫) সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নীতি ঘোষণা করেছিল। প্রথমত, স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হবে।[১৩] দ্বিতীয়ত, ৯০০টি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হবে, সেই সঙ্গে হাসপাতালে ৩০,০০০ অতিরিক্ত শয্যার ব্যবস্থা করে মোট জনসংখ্যার প্রতি ১০০০ মানুষ পিছু পাঁচটি শয্যা, এই হারে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আন্তর্জাতিক মাপকাঠি মেনে সমতুল্য করে তোলা হবে। তৃতীয়ত, সমস্ত নাগরিক যাতে সুলভে প্রয়োজনীয় কিন্তু উন্নত মানের ওষুধ পান, সে জন্য সরকারি উদ্যোগে যাবতীয় ওষুধ কেন্দ্রীয়ভাবে কেনার ব্যবস্থা হবে। তাতে দুর্নীতিও এড়ানো যাবে।

কিন্তু, শিক্ষাক্ষেত্রের আপ সরকারের কাজকর্ম যেমন সবার চোখে পড়েছে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তা হয়নি। বরং, আপ সরকারের ঘোষিত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ খুবই ধীর গতিতে চলছে। ২০১৯ সালের হিসাব মতে, স্বাস্থ্য বিভাগের ৫৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৩১টির কাজ পিছিয়ে রয়েছে।[১৪]

আপ এর জনপ্রিয়তাবাদী নীতি দিল্লির দরিদ্র মানুষদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করার চেষ্টার মধ্যে প্রতিফলিত। গরিবদের বিনামূল্যে বেসরকারি হাসপাতালে বিভিন্ন পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া, পথ দুর্ঘটনায় আহতদের ও অ্যাসিড আক্রান্ত মেয়েদের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয় সরকার বহন করার দায়িত্ব নেওয়ার মধ্যে তাদের

অগ্রাধিকার স্পষ্ট। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, ঝুগ্গিঝোপড়ির অভ্যন্তরে মহল্লা ক্লিনিক চালু করা। এর ফলে গরিব ও সবদিক থেকে উপেক্ষিত মানুষরা, বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা দ্রুত চিকিৎসা ব্যবস্থার নাগাল পেতে পারল। সময় নষ্ট না হওয়ায় তাদের দৈনিক রোজগার থেকেও তারা তুলনায় কম বঞ্চিত হল। যেটা দিনমজুরদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন বসু ও বারিয়া (Basu & Barria. 2018)।

মোটমুটিভাবে আপ সরকারের কাজে দিল্লির শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রভূতি উন্নতি ঘটে। যদিও, সরকারের বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধ সমালোচনা সবসময়ই জারি থাকবে। এ ব্যাপারে সরকারের সাম্প্রতিক সংযোজন, মহিলাদের জন্য মেট্রো ও বাস পরিষেবা ফ্রি করা। সমালোচকদের বক্তব্য, যদি সরকারি পরিষেবা বিনামূল্যে দেওয়া হয়, তা হলে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে ধীরে ধীরে পরিষেবার মান পড়তে বাধ্য। শেষ পর্যন্ত, সরকার পরিষেবার দাম বাড়াতে, নয়তো ব্যবহারের সুযোগের উপর লাগাম টানতে বাধ্য হবে (Stiglitz and Rosengrad)। এখনই অর্থনীতির উপর এই সব জনপ্রিয়তাবাদীন নীতির প্রভাব কি হবে, তা বলার সময় হয়নি। তবে জনগণের জন্য বিনামূল্যে বা ভর্তুকি দিয়ে সরকারি পরিষেবা কতদিন চালোনো যাবে, সে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা অব্যাহতই থাকবে।

উপসংহার ঃ

আপ এর রাজনীতির মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব নিহিত। এই দ্বন্দ্ব জনগণকেন্দ্রিক রাজনীতি বনাম বাস্তব কান্ডজ্ঞান ভিত্তিক রাজনীতির। আপ পার্টি জনগণকেন্দ্রিক রাজনীতিকে তুলে ধরে ক্ষমতায় আসে। তাদের রাজনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি ও প্রচলিত আইনের প্রতিবন্ধকতার সামনে দাঁড়িয়ে তাদের অসহিষ্ণুতাও বোধগম্য। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পরে তাদের বাস্তব রাজনীতির মুখোমুখি হতে হয়। তখন তারা বুঝতে পারে যে চাইলেও তারা আইনের শাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিকতার রাজনীতিকে পরিত্যাগ করতে পারবে না। এই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের ভাবনার মধ্যেই একটা দ্বন্দ্ব রয়ে গিয়েছে। একদিকে তারা রাজনৈতিক দল গঠন করে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে অন্যদিকে, সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই প্রশ্ন করছে (Jayal 2016)। নেতা ও জনগণকে এক করে দেখার ফলে তারা ধরেই নিয়েছিল যে জনগণের মধ্যে কোনও স্তরভেদ নেই। তারা সবাই একসুরে কথা বলে থাকে। এই সব বৈপরীত্য থেকে দলের মধ্যে নানা মতবিরোধ দেখা দিয়ে দলে ফাটল ধরতে লাগলো। এই ফাটল আরও চওড়া হল যখন ২০১৫ সালে আপ দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে উদ্যত হল।

আপ-রাজনীতির চিন্তার মধ্যেকার অস্বচ্ছতা এবং তাদের জনগণকেন্দ্রিক রাজনীতির সঙ্গে বাস্তব কান্ডজ্ঞান ভিত্তিক রাজনীতির দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও আপ এমন একটা নতুন রাজনীতির ধারণা উপহার দিতে পেরেছিল যা দেখে মনে হতে পারে যে এই চিন্তা গণতান্ত্রিক উদ্যোগেরই প্রতিনিধিত্ব করার শক্তি রাখে। এই রাজনীতি সমাজের সামনে একটি নতুন চিন্তা হাজির

করল, যেখানে সমষ্টিগত চিন্তায় সবার সঙ্গে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সরকারি পরিষেবা সবার নাগালের মধ্যে থাকবে, সরকারি প্রশাসনের কাজে আরও স্বচ্ছতা থাকবে, আর দুর্নীতি নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। এই রাজনীতি মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে প্রত্যাশা করল এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা, যেখানে নাগরিকদের খাদ্য, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষার সুযোগ, বিদ্যুৎ পরিষেবা ও পরিবহনের মতো দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসে নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার থাকবে। তাদের রেশন কার্ডের জন্য, ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য কাউকে ঘুষ দিতে হবে না। তারা ন্যূনতম নিরাপত্তা পাবে। এ সবই ভিন্ন ধরণের দাবি বা আকাঙ্ক্ষা, যা রাজনৈতিক দলের দিতে পারার বা না পারার ক্ষমতার উপর নির্ভর করছে না। কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ, এই আকাঙ্ক্ষাকে জনমানসের সামনে নিয়ে আসার কাজ এবং তার প্রতি সাধারণ মানুষের ইতিবাচক সাড়া। দেখে মনে হয়, ভারতীয় গণতন্ত্রে জনগণের ক্ষমতায়ণের মধ্য দিয়ে স্বল্পস্থায়ী হলেও প্রকৃত নাগরিক নির্মাণের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় নি।

অনুবাদক ঃ শুভদীপ ঘোষ

Notes

1. https://aamaadmiparty.org/about/our-history/
2. আরো তথ্যের জন্য দেখুন AAP our History on https://aamaadmiparty.org/about/our-history/, last accessed 25 September 2019
3. See the cpnstitution of the Aam Aadmi Party, https://aamaadmiparty.org/about/constitution/last accessed 25 September 2019
4. https://aamaadmiparty.org/wp-content/upload/2017/10/AAP-Manifesto-2015 70-pt-Action-Plan:compressed.pdf last accessed 25 September 2019
5. See Madhu Bharati. "How Kejriwal's Aap has no woman leaders in the top rung", https://www.firstpost.com/politics/how-kejriwal-aap-has-has no-woman-leaders-in-the-top-rung-1657507.html last accessed 25 September 2019
6. https://www.epw.in/journal/2017/17/web-exclusives-/aap-has-decimated-historic-mandate-alternative-politics.html?0=ip login no cache%3D09b005b98c850652ee55a86dd50b991c last accessed 25 September 2019
7. See AAP government announces free water cheap electricity for Delhi residents, https://www.downtoearth.org.in/news/aap-governmentannounces-free-water-cheap-electricity-for-delhi-residents-48745 last accessed 25 September 2019
8. See The Hindu, "AAP government water scheme: NGT directs DJB to prevent misuse of resource" https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/aap-govt-water-scheme-ngt-directs-djb-to-prevent-misuse-of-resource/article29395908.ece last accessed 25 September 2019
9. See Business Standard, Power, Water: The cost of AAP's promise, https://www.business-standard.com/article/economy-policy/power-water-the-cost-of-aap-s-promises-115022600048 1.html last accessed 25 September 2019
10. See The Hindu, "No Major increase in cost to exchequer

expected: https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/no-major-increase-in-cost-to-exchequer-expected-kejriwal/article28789070 last accessed 25 September 2019

11. See The Wire, "As AAP turns government schools around question about learning linger", https://thewire.in/education/as-aap-turns-government-schools-around-questions-about-learning-linger last accessed 25 September 2019

12. See Business Standard, "huge transformation in school education in Delhi in two years of AAP", https://www.business-standard.com/article/news-ians/huge-transformation-in-school-education-in-delhi-two-years-of-aap-117021200305

13. AAP increased allocation in this sector from 9.9% in 2012-2013 to 12.7% in 2017-2018. See https://www.epw.in/journal/2018/49/commentary/aaps-health-policy-reforms-delhi.html last accessed 25 September

14. See Indian Express, "Delhi AAP government health facility reforms hospitals", https://indianexpress.com/articles/delhi-aap-government-health-facility-reforms-hospitals-5957197/ last accessed 25 September 2019

References

1. Basu, A and S. Barria. 2018. 'AAP's health policy reforms in Delhi', Economic and Political Weekly 53 (49): 16-21.
2. Bhaduri, M. 'AAP High Command allows no dissent', Economic and Political Weekly 49(8).
3. Conovan, M. 1999. 'Trust the People! Populism and the two faces of Democracy', Political Studies XLVIII: 2-16.
4. Fraser, N.2018. 'Can we understand populism without calling it Fascist', Economic and Political Weekly. 53 (22).
5. Jayal, N. 2016. 'Contending representative claim in Indian Democracy', India Review. 15(2):172-195.
6. Laclau, E. 2005. 'On Populist Reason', London: Verso.
7. Lara, M.P. 2018. 'A conceptual analysis of the term 'populism', Thesis Eleven. 149(1):31-47.
8. Mudde, C and C.R Kaltwasser, eds. 2012. Populism in Europe and the AmericasThreat or Corretcive for Democarcay. Cambridge: Cambridge University Press.
9. Roderik, D. 2018. Populism and the economics of globalization. Journal of International Business Policy.
10. Rai, P. 2017. 'AAP has decimated a historic mandate for Alternative Politics'', Economic and Political Weekly, 52(17).
11. Roy, S. 2014. 'Being the Change: the Aam Aadmi Party and the politics of the extraordinary in Indian Democracy', Economic and Political weekly XLIX.
12. Sampath, G. 2015. 'The Populist Reason of the AAP' https://www.livemint.com/Opinion/txCqp6qNqbPY1KXZ04zR9I/The-populist-reason-of-the-AAP.html
13. Last accessed on 25 September, 2019.
14. Shils,E. 1972. 'The Intellectuals and the Powers', Chicago: Chicago University Press.

15. Stiglitz, J.E. and J.K Rosengrad. 'Economics of the Public Sector', New York: W.W Norton & company Inc.

16. Subramanyam, N. 2007. 'Populism in India', SAIS Review 27: 81-91.

17. Weyland,K. 2001. 'Clarifying a Contested Concept: Populism in the context of Latin American Politics', Comparative Politics 34(1): 1-22.

প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্রের আবহে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি সমীক্ষায় ছত্তীশগঢ়

রজত রায়

বিশ্বজুড়েই এখন জনপ্রিয়তাবাদী (Populist) রাজনীতির জোয়ার। বলা যায়, গোটা দুনিয়াতে জনপ্রিয়তাবাদেরই জয়জয়কার। এই জনপ্রিয়তাবাদের অমোঘ আকর্ষণে প্রায়শই প্রচলিত বাম, দক্ষিণ ও মধ্যপন্থী রাজনীতির নিজেদের মধ্যেকার সীমারেখা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ১৯৭০ এর দশকে আমরা ইন্দিরা গান্ধীকে দেখেছি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও রাজন্যভাতা বিলোপের মতো একগুচ্ছ জনপ্রিয়তাবাদী পদক্ষেপ করতে, সর্বোপরি, 'গরিবি হঠাও' এর মতো জনমোহিনী স্লোগান দিতে। পাকিস্তানে জুলফিকার আলি ভুট্টো এবং বাংলাদেশে মুজিবুর রহমানও বিভিন্ন সময়ে এই জনপ্রিয়তার রাজনীতির রাস্তায় পা ফেলেছিলেন। এখন বিশ্বের বিভিন্ন জননেতা নিজের নিজের দেশের মানুষকে পাশে টানতে এমনই সব জনমোহিনী স্লোগান দিচ্ছেন। কখনও সেই স্লোগান একান্তই উগ্র জাতীয়তাবাদী, বর্ণ বা জাতিদ্বেষপূর্ণ, যেমন, আমেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্প বা ফ্রান্সের লা পেন। আবার কখনও বা তা ব্রিটেনের জেরেমি করবিন ও আমেরিকার বার্নি স্যান্ডার্সের মতো নেতা বা ফ্রান্সের 'ইয়েলো জ্যাকেট' আন্দোলনের মতো উদার গণতান্ত্রিক রাজনীতির অনুসারী। ভারতেও এখন এই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির ঝোঁক প্রবল। এতটাই, যে তা এখন শ্রেণীভিত্তিক বাম রাজনীতি বা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রচলিত ধারাকে রীতিমত চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করেছে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় নরেন্দ্র মোদির প্রচারের স্লোগানগুলির কথা মনে করা যেতে পারে। একদিকে 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' অন্যদিকে তথাকথিত 'অনুপ্রবেশকারী' বলে দেশের নির্দিষ্ট এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ। পার্থ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, ''জনপ্রিয়তাবাদ এমন একটা রাজনীতি যা গণতন্ত্রের পরিসরের মধ্যেই ক্রিয়া করে, যেখানে কোনও রাজনৈতিক নেতা বা দল জনমোহিনী বুলি দিয়ে সমাজের বিভন্ন অংশের মানুষকে একসূত্রে গাঁথতে সক্ষম হয়। এটা করতে গিয়ে এই বলে যুক্তি দেওয়া হয় যে এই সবই সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবি, কিন্তু ক্ষমতাসীনরা তাদের বঞ্চিত করে চলেছে।''[১]

জনপ্রিয়তাবাদের তাত্ত্বিকরা এই চিন্তাধারাকে সাধারণভাবে একটি প্রতিবাদী রাজনীতির প্রকাশ হিসাবেই দেখার কথা ভেবেছেন, যা জন আন্দোলনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ জানাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে আধিপত্য কায়েম করে থাকা ক্ষমতাসীনদের। ভারতের ক্ষেত্রে এই রাজনীতির প্রকাশ কিছুটা ভিন্ন বলেই মনে হতে পারে। কারণ, এখানে প্রতিবাদী রাজনীতির চাইতেও সরকারি প্রশাসনকেন্দ্রিক রাজনীতির মধ্যেই তা বেশি করে প্রতিফলিত হতে দেখা যাচ্ছে। তাই ইতিমধ্যেই মাথা তোলা এই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির 'ভারতীয় চরিত্র' বুঝতে হলে বোধহয় বেশি করে তাকাতে হবে কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলগুলির সরকার পরিচালনার কাজকর্মের দিকে। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি, পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল বা ছত্তীশগঢ়ে রামন সিংহের প্রমুখের সরকার পরিচালনার অভিমুখের দিকে।

বিষয়টিকে ভালো করে অনুধাবন করতে আমাদের কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন। যেমন, ভারত সহ এই উপমহাদেশে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিকে শুধুই সরকারি প্রশাসনিক কাজকর্মের নিরিখেই বোঝার চেষ্টা করব? নাকি, এ ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তাবাদ আসলে অভীষ্ট লক্ষ্য নয়, তা নিছকই লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায় মাত্র। একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, যা দিয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সরকার সমাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়াস করে। আবার, জনকল্যাণমূলক (welfare) প্রকল্পগুলির ভূমিকা কী? সেগুলি কি জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিরই অচ্ছেদ্য অংশ? না কি তাদের ভূমিকা স্বতন্ত্র? জনপ্রিয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে চিরাচরিত মতাদর্শভিত্তিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সম্পর্কই বা কী? একের উপর অন্যের প্রভাব কতটা পড়ে? এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টায় ছত্তীশগঢ় রাজ্যকে, বিশেষ করে বি জে পির রমন সিংহ সরকারের ১৫ বছরের শাসনকালকে (২০০৩-২০১৮) নেওয়া হয়েছে সমীক্ষার জন্য।

এই গবেষণার জন্য একদিকে যেমন গত ২০ বছরের বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছত্তীশগঢ় সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও সংবাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, তেমনই বিভিন্ন সরকারি নথিপত্র, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র দেখার চেষ্টা হয়েছে। সেই সঙ্গে জনপ্রিয়তাবাদ বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা সমৃদ্ধ বই ও গবেষণাপত্র দেখারও চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি, ছত্তীশগঢ়ের সরকারি কর্তাব্যক্তি, ওই রাজ্যে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত কিছু এন জি ও কর্মী এবং কতিপয় সাধারণ মানুষের মতামতও জানার চেষ্টা হয়েছে। সর্বোপরি, দেশের কিছু বিশেষজ্ঞ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও গবেষকের মতামত শোনা ছাড়াও তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে, ভারতের মাটিতে, বিশেষ করে ছত্তীশগঢ়ে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি কী ভাবে শিকড় ছড়াচ্ছে। বিশেষ করে ছত্তীশগঢ়কেই সমীক্ষার জন্য বেছে নেওয়ার কারণ একটাই, একদিকে বিপুল আয়তনের জমি, তার তুলনায় জনসংখ্যা অনেক কম, বিশাল বনসম্পদ ও খনিজভান্ডার সমৃদ্ধ রাজ্য, অন্যদিকে রাজ্যের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মানুষই প্রচন্ড দরিদ্র। এই বৈপরীত্যের রাজ্যে গত

প্রায় দুই দশক ধরে বিপুল পরিমাণ জনকল্যাণমূলক ও জনপ্রিয়তাবাদী প্রকল্প শুরু হয়েছে, যার সিংহভাগই করেছে রমন সিংহের সরকার (২০০৩-২০১৮)। সেই ধারা কংগ্রেস জমানাতেও অব্যাহত। বর্তমান প্রবন্ধে রমন সিংহ জমানার বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ও জনপ্রিয়তাবাদী প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য মোচনের কাজে কীরকম সাফল্য এসেছিল, তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বোঝার চেষ্টা হবে জনপ্রিয়তাবাদের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে। এ ছাড়া, দেখা হবে এই শক্তিশালী জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির মোকাবিলায় প্রচলিত ধারার রাজনীতিতে অভ্যস্ত কংগ্রেস কোন রণকৌশল নিয়ে সাধারণ মানুষের মন জয় করে রমন সিংহকে ভোটে হারিয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

ছত্তীশগঢ় ঃ

মধ্যপ্রদেশ ভেঙ্গে ২০০০ সালের নভেম্বরে ছত্তীশগঢ়ের জন্ম। আয়তনে রাজ্যটি দেশের মধ্যে দশম, কিন্তু জনসংখ্যা অনেক কম, ২০১১ সালের জনগণণা অনুযায়ী মাত্র দুই কোটি ৫৬ লক্ষ। অর্থাৎ, জনবসতির ঘনত্বের নিরিখে গোটা দেশে যেখানে গড়ে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৮২ জন মানুষ বসবাস করেন, তুলনায় ছত্তীশগঢ়ে বাস করেন মাত্র ১৮৯ জন। বিশাল এই রাজ্যের প্রায় অর্ধেক এলাকা, ৪৪ শতাংশ জমিই বনাঞ্চল, খনিজ সম্পদের বিশাল ভান্ডার। কয়লা উৎপাদনে দেশের মধ্যে দ্বিতীয়, লৌহ আকরিক উৎপাদনে তৃতীয়। এ ছাড়া বক্সাইট, চুনাপাথর, টিন প্রভৃতি নানা খনিজ সম্পদের বিপুল সঞ্চয় রয়েছে। পাশাপাশি, বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত, শিল্পায়নে এগিয়ে। ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম কারখানা, এক গুচ্ছ সিমেন্ট কারখানা, খনি অঞ্চল এবং নানা অনুসারী শিল্প রয়েছে। ছত্তীশগঢ়ের যদিও ধানচাষের জন্য খ্যাতি রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ জমিই একফসলা, বৃষ্টিনির্ভর চাষ।[২] অন্যদিকে, এত দিকে এক দশক আগেও সেখানে ৪৮.৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য রেখার নিচে বাস করতেন, তুলনায় গোটা দেশে গড়ে এই সংখ্যাটা ছিল ২৭.৫ শতাংশ। অর্থাৎ, রাজ্যের মোট দুই কোটি ৫৬ লক্ষ মানুষের মধ্যে এক কোটি ২০ লক্ষ মানুষই দারিদ্র্য রেখার নিচে।[৩] যে হেতু বর্ষার একফসলি চাষের কাজ থেকে সারা বছর দিন গুজরান করা অসম্ভব, তাই বছরের বাকি সময় বহু মানুষই ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হন অদক্ষ বা স্বল্প দক্ষ শ্রমিক হিসাবে রোজগারের আশায়। এ ভাবেই রেলের লাইন পাতা বা রক্ষণাবেক্ষণের কাজে, নির্মাণ শিল্পে এঁরা 'বিলাসপুরি কুলি' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

রমন সিংহ ও রেশন ব্যবস্থার ঢালাও সংস্কার ঃ

ভারতের মতো দেশে যেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষ স্থায়ীভাবে দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে, সে দেশে সাধারণ মানুষের মন জয় করতে খাদ্যকেন্দ্রিক রাজনীতি রাজনৈতিক দলগুলির কাছে সবসময়ই একটা আকর্ষণীয় হাতিয়ার। ১৯৮০-র দশকের গোড়ায় এন টি রাম রাও অন্ধ্র প্রদেশে দুই টাকা কিলো দরে চাল দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মোটামুটি ওই সময়েই তামিলনাড়ুতে এম জি রামচন্দ্রন দেশের মধ্যে প্রথম স্কুলে স্কুলে 'মিড ডে মিল' চালু করেন, পরে যা গোটা দেশের জাতীয় কর্মসূচি হিসাবে গৃহীত।

আরও পরে এম জি আর এর শিষ্যা জয়ললিতা তামিলনাড়ুতে 'আম্মা কিচেন' চালু করে সেই ধারা বজায় রাখেন। জনপ্রিয়রতাবাদী রাজনীতির এই খেলায় জয়ললিতার এ আই এ ডি এম কে এবং বিরোধী দল করুণানিধির ডি এম কে কেউই পিছু হঠতে রাজি না থাকায় ভোটের মুখে ওই রাজ্যে ভোটদাতাদের মন পাওয়ার জন্য কখনও রঙীন টিভি, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, এমনকি প্রেশার কুকার পর্যন্ত বিলি করতে দেখা গেছে।

ছত্তীশগঢ়ে বি জে পি ২০০৩ সালে নির্বাচনে জেতার পরে যখন রমন সিংহকে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসায়, তখন কেউই ভাবতে পারে নি যে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি রাজ্যের গরিবের মসীহা হয়ে উঠবেন এবং চাওর ওয়ালা বাবা (ছত্তীশগঢ়ী ভাষায় এর অর্থ, যিনি চাল দেন) নামে খ্যাত হবেন। ক্ষমতায় এসেই তিনি দীর্ঘদিন ধরে চূড়ান্ত অবহেলা ও দুর্নীতিতে ধুঁকতে থাকা রেশন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেন। এ জন্য ২০০৪ সালে রাজ্য সরকার ছত্তীশগঢ় পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (কন্ট্রোল) অর্ডার জারি করে। আগের জমানায় অজিত জোগীর কংগ্রেস সরকার রেশন পরিচালনার ব্যবস্থাকে কার্যত বেসরকারি হাতে তুলে দিয়েছিল। রমন সিংহ সেই ব্যবস্থা বাতিল করে রেশন ব্যবস্থা পরিচালনার ভার তুলে দেন গ্রাম পঞ্চায়েত, মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী, প্রাথমিক সমবায় সমিতি, বন সুরক্ষা সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের হাতে। ফেয়ার প্রাইস শপের (রেশন দোকান) সংখ্যা ৮৪৯২ থেকে বাড়িয়ে ১০,৪৬৫ করা হয়। সেই সঙ্গে সরকারি গুদাম থেকে চাল গম রেশনের দোকানে পৌঁছনো ও বন্টনের গোটা ব্যবস্থাটাকে কম্পিউটার যোগাযোগের মধ্যে নিয়ে এসে নজরদারির ব্যবস্থাকেও আঁটোসাটো করা হয়।

২০১১ সালে রাজ্যের আটটি ব্লকে রেশন ব্যবস্থার সমীক্ষা করে জঁ দ্রেজ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ছত্তীশগঢ়ে রেশন ব্যবস্থার পরিচালনা খুবই ভালোভাবে চলছে। রেশনকার্ডধারীদের ন্যূনতম ৮৫ শতাংশ উপভোক্তা মাসে ৩৫ কিলো খাদ্যশস্য পাচ্ছেন। বাকিরা পাচ্ছেন ২৫ কিলো করে। মাত্র দুই শতাংশ রেশন কার্ড ভুয়ো বলে জানা যায়। জঁ দ্রেজ আরও লক্ষ্য করেন, ''২০০৭ সালের মধ্যে রমন সিংহ সরকার রাজ্যের ৮০ শতাংশ মানুষকে রেশন ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসতে পেরেছেন। রেশন ব্যবস্থাকে বেসরকারি ডিলারদের হাত থেকে উদ্ধার করে গ্রামের গরিব মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া, সরকারি প্রশাসন ও সাধারণের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষার জন্য এস এম এস ব্যবস্থা চালু করায় গুদাম থেকে এলাকার রেশন দোকানে খাদ্যশস্য নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছচ্ছে কিনা, তার উপর নজরদারি রাখা সম্ভব হচ্ছে।'' দ্রেজের মতে, ''সাধারণ মানুষ যখন নিজেরাই তাদের রেশন ব্যবস্থা চালানোর দায়িত্ব নেয়, তখন দুর্নীতি করার তাগিদ কমতে বাধ্য। সাধারণ মানুষ গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তাদের উপর যতটা প্রভাব খাটাতে পারে, সরকারি আমলাতন্ত্র বা দুর্নীতিগ্রস্ত রেশন ডিলারদের উপর ততটা কিছুতেই পারে না।''[৪] দ্রেজের এই কথার সঙ্গে যোজনা কমিশনের (অধুনা অবলুপ্ত) প্রাক্তন সদস্য সচিব ও কেন্দ্রের খাদ্য নিরাপত্তা আইনের অন্যতম রূপকার নরেশ চন্দ্র সাকসেনাও একমত।[৫]

রমন সিংহ তাঁর রেশন ব্যবস্থার সংস্কার করতে শুধুই সরকারি আমলাদের উপর নির্ভর করেননি, সাধারণ গরিব মানুষ বা উপভোক্তাদেরও জড়ো করেছিলেন। রেশন পরিচালনা ও নজরদারির অনেকখানি দায়িত্বই তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁদের গোটা প্রকল্পের অংশীদার করে তোলেন। ফলে, রেশন ব্যবস্থাকে ঘিরে আমলাতন্ত্রের সমান্তরাল একটা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যা রেশন সরবরাহকে অনেকটাই স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করে তোলে। প্রাসঙ্গিকভাবে এটাও মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে দেশে ২০১২ সালে দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের আমলে খাদ্য নিরাপত্তা আইন হলোও রমন সিংহ অনেক আগেই এই কাজে নেমেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনিই পথিকৃৎ।

জনপ্রিয়তাবাদী প্রকল্পসমূহ ঃ

রমন সিংহ তাঁর ক্ষমতায় থাকার ১৫ বছর সময়ের মধ্যে রেশন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা ছাড়াও অনেকগুলি জনমুখী প্রকল্পের সূচনা করেন, তার মধ্যে কিছু জনকল্যাণমূলক, আবার কিছু জনপ্রিয়তাবাদী।

এর কয়েকটি এখানে উল্লেখ্য ঃ

১. দুই টাকা কিলো দরে মাসে ৩৫ কিলো চাল বি পি এল পরিবার পিছু। অন্ত্যোদয় কার্ডে চালের দর এক টাকা কিলো। এ ছাড়া বিনামূল্যে আয়োডিন সমৃদ্ধ লবণ।
২. গরিব পরিবারের মেয়েদের বিয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য।
৩. স্কুলের ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে সাইকেল।
৪. গরিব ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক।
৫. আদিবাসী ও অন্য গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েদের বেশি করে বৃত্তি।
৬. মহিলাদের প্রতিটি রান্নার গ্যাস সংযোগে ১০০ টাকা করে ভর্তুকি।
৭. পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার প্রতি স্তরে ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ।
৮. গরিবদের ৩ শতাংশ হারে ঋণ।
৯. গ্রামে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ।
১০. কৃষককে ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের অতিরিক্ত কুইন্টাল প্রতি আরও ২৭০ টাকা করে ভর্তুকি।
১১. জঙ্গলে তেন্ডুপাতা সংগ্রহের কাজে যুক্ত আদিবাসীদের জন্য জুতো।[৬]

এ সব প্রকল্প রমন সিংহ তাঁর ১৫ বছর মেয়াদকালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে চালু করেন। ২০১৮ সালে চতুর্থবার নির্বাচনের মুখে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, রেশনের খাদ্যশস্যের পুষ্টির মান বাড়াতে বিনামূল্যে ছোলা দেওয়া হবে, আর রাজ্যের ৫৫ লক্ষ মহিলাকে বিনামূল্যে মোবাইল ফোন দেবেন।

পাশাপাশি, মহিলাদের জন্য একটি পৃথক বাজেট[৭] বরাদ্দের ব্যবস্থাও রাজ্যের বাজেটের মধ্যে শুরু করেন। মহিলাদের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে ওই পৃথক বাজেটের আওতায় সরকারের ১৮টি দফতরে আলাদা আলাদা ২৩টি বিষয়ে বরাদ্দ করা শুরু হয়।

রাজ্য সরকারের আর্থিক হাল ঃ

রমন সিংহ তাঁর জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে তাল রেখে বিভিন্ন প্রকল্পে সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ বাড়িয়ে চলেন। ২০০৭-২০০৮ আর্থিক বছরে বিভিন্ন খাতে মোট সরকারি ভর্তুকি যেখানে ছিল ২০২ কোটি টাকা, তা ২০১১-২০১২ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১৮৭১ কোটি টাকায়। ওই সময় রাজ্যের মোট উৎপাদনের শতাংশের হিসাবে সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ছত্তীশগঢ় অনেকটাই এগিয়ে যায়।

উন্নয়ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ (কোটিতে) ঃ

২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
১০,৭৭৩	১২,৯৯৫	১৬,০০২	১৬,৮৫৭	২১,৩১০

কিন্তু, এই সময়ে রাজ্য সরকার লোকসানের সম্মুখীন হতে শুরু করে। সরকারি বিনিয়োগের উপর মাত্র ০.০৪ শতাংশ হারে আয় হচ্ছিল, অথচ সরকারি হিসাবেই দেখা যাচ্ছে, ২০১১-১২ সালে সরকারকে বাজার থেকে নেওয়া ধারের জন্য ৭.০৮ শতাংশ হারে সুদ দিতে হচ্ছিল।[৮]

ভর্তুকি চিত্র[৯]

এই সময়কালে (২০০৭-১২) সরকারি ভর্তুকির চিত্রের দিকেও তাকানো যাক। (কোটিতে)

বিষয়	২০০৭-২০০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
পুষ্টি	০.৪৪	৯৪৬.২৮	১২৮৮.৭৮	৮৮৬.৭৩	৭৫০.৫১
শস্য পালন	২৯.৩৫	৪১.২৩	৪১.০০	৪০.০৭	৪৬.৩৬
মৎস্য চাষ	০.৫৫	০.৪১	০.৪৭	০.৭৫	০.৬০
বন সংরক্ষণ	১৯.৫৩	১০.০৯	১০.০০	১০.০০	৮.১০
খাদ্যশস্য সংরক্ষণ	৬০৬.১৬	১০৯.৪৭	৪০৬.৬১	৪৮৮.৫৬	৩৮৩.৬৭
ক্ষুদ্র সেচ	৮.০৯	১০.৪৯	১০.৬২	১১.০১	১০.৮৮
বিদ্যুৎ	১০.১০	১২৮.০৪	১৫০.১০	২০২.১০	৩২১.১০
গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্প	৯.৬০	২৪.২৭	৩৯.২৬	৩৭.৭১	৫২.৫২

শিল্প	১.১৩	৪.৩৭	১.৪৬	৩.৭২	১.৮৭
মোট	**৮০২.৫৫**	**১,১৩৪.৬৮**	**১,৯৯৪.৩০**	**১,৭৬৩.৮১**	**১,৮৭০.৯৩**

লক্ষ্যণীয়, সরকারি ভর্তুকির অভিমুখ স্পষ্টই গ্রামের দিকে। শিল্পে ভর্তুকি নামমাত্র। চার বছরের মধ্যেই, অর্থাৎ ২০১৫-১৬ সালে রাজ্য সরকারের মোট ভর্তুকির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৭৩৯৭. ১২ কোটি টাকায়, যা কিনা ৩৯৫ শতাংশ বেশি।[১০] এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভর্তুকি অবশ্যই খাদ্যে (পুষ্টি) ও খাদ্যশস্য সংরক্ষণে। এ ছাড়াও বেশ কিছু ভর্তুকি রয়েছে, যা এই খাতে না দেখিয়ে অন্য খাতে দেখানো হয়েছে। যেমন, সমবায়ের খাতে বরাদ্দ ভর্তুকি আসলে কৃষকদের সুদে দেওয়া হয়। সরকার বছরে তিন শতাংশ হারে ঋণ দেয় চাষীদের। সমবায় ব্যাঙ্ক, গ্রামীন ব্যাঙ্ক প্রভৃতি থেকে নেওয়া ঋণের বাড়তি সুদটা সরকার ভর্তুকি হিসাবে ব্যাঙ্ককে মিটিয়ে দেয়। সরকার ধানচাষীদের কাছ থেকে ধান কেনার ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের অতিরিক্ত যে বোনাস দেয়, সেটাও ভর্তুকি খাতে দেখানো হয়নি। ২০০৮-০৯ সালে ওই ভর্তুকির পরিমান ছিল ৪৪০ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭৫০ কোটি টাকায়। একইভাবে বিদ্যুৎ খাতেও ভর্তুকির পুরোটা দেখানো হয়নি, ২০০৭-০৮ সালে পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগে ভর্তুকি ছিল ১০ কোটি টাকা, যা ২০১১-১২ সালে বেড়ে ১০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

পি ডি এস বা রেশনব্যবস্থা ঃ

সরকারি হিসাবে রাজ্যে মোট পরিবারের সংখ্যা ৫৫ লক্ষ। তাদের মধ্যে ১৩ লক্ষ পরিবার বি পি এল তালিকাভুক্ত। সরকার পরিবার পিছু কিলো প্রতি এক টাকা ও দুটাকা দরে মাসে ৩৫ কেজি করে চাল দেয়। এ ছাড়া দেয় সস্তা দরে ডাল ও বিনা পয়সায় আয়োডিন যুক্ত লবণ এক কেজি। ২০১২ সালে রাঘব পুরি ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলিতে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন এ বিষয়ে। সেখানে তিনি জঁ দ্রেজের সমীক্ষার তথ্য পরিসংখ্যান ব্যবহার করে দাবি করেন, রাজ্যের রেশন ব্যবস্থার আওতায় ৩২ লক্ষ ৩০ হাজার পরিবারকে আনা গিয়েছে। আরও পরে, ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংহ বিজনেস লাইন পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী খাদ্যায়ন সহায়তা যোজনা' প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের ৫৮ লক্ষ ৮০ হাজার পরিবারকে সস্তা দরে খাদ্য দেওয়া হচ্ছে।[১১] মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবি যথার্থ হলে বলতে হয় যে রমন সিংহ সরকার রাজ্যের সমস্ত মানুষকেই খাদ্য নিরাপত্তা দিতে শুরু করেছিল।

মাঝের বছরগুলিতে সরকারি ভর্তুকি বৃদ্ধির সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে লোকসান বাড়ছিল। ২০০৭-০৮ সালে সরকারের সিভিল সাপ্লাইজ কর্পোরেশনের লোকসানের পরিমান ছিল আট কোটি টাকা, ২০১০-১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৫০ কোটি টাকায়। একইভাবে, বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে গিয়ে রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা ডিসকম

(DISCOM) ক্রমাগত লোকসানে চলতে থাকে। বেহাল আর্থিক হাল ডিসকমকে দেউলিয়া করার দিকে ঠেলে দিতে থাকে।

রাজ্যের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হারেও এর প্রতিফলন ধরা পড়তে শুরু করে। ২০১৫-২০১৬ সালের হিসাব পরীক্ষার পর সি এ জি রিপোর্টে বলা হয়,

১. যদিও চতুর্দশ অর্থ কমিশন ইঙ্গিত দিয়েছিল, রাজ্যের মোট উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ১৪.৪২ শতাংশ হবে, বাস্তবে তা ৬.৪০ শতাংশে আটকে গিয়েছে।

২. কিন্তু তাই বলে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নের ভারপ্রাপ্ত সংস্থাগুলিকে রাজ্য সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থ কাটছাঁট করা হয়নি, বাড়ানো হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে বরাদ্দ ছিল ৩৩৫ কোটি টাকা, তা ২০১৫-১৬ সালে বেড়ে হয়েছে ৪৬৬ কোটি টাকা। এসবই সামাজিক ক্ষেত্রের প্রকল্প।

৩. এই এক বছরের মধ্যে মোট ভর্তুকির পরিমান যেমন বেড়েছে ৩৬৫০ কোটি টাকা, তেমনই বিপরীতে সরকার স্থানীয় প্রশাসন ও স্বশাসিত সংস্থাগুলিকে বরাদ্দ কমাতে হয়েছে। আগের বছর বরাদ্দ ছিল ১০,৫৭৩ কোটি টাকা, তা ২০১৫-১৬ সালে কমে দাঁড়ায় ৯৬৭৮ কোটিতে।

দেখাই যাচ্ছে, রাজ্যের অর্থভান্ডারে টান পড়তে শুরু করলেও রমন সিংহ সরকার জনপ্রিয়তাবাদী ও কল্যাণকামী প্রকল্পগুলিতে অর্থের জোগান কমাতে আগ্রহ দেখায় নি। বরং সাধারণ মানুষকে আরও বেশি করে কাছে টানার চেষ্টায় ওই প্রকল্পগুলি চালিয়ে গেছে। জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যে অন্য সব রাজনৈতিক দলের মতো তারা সরকারের আর্থিক শৃঙ্খলা (fiscal discipline) মেনে চলার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে রাজি নয়। বরং নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে তারা বাজার থেকে ধার করে বল্গাহীন খরচ করতেও পিছপা হয় না। এই ব্যাপারে রমন সিংহ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মধ্যে মিলও স্পষ্ট।

এইচ ডি আই-তে প্রতিফলন নেই কেন?

এই বিশাল জনহিতকারী উদ্যোগের ফলে আশা করা যেতেই পারে, সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য দূর হবে, বা তার প্রবণতা চোখে ধরা পড়বে। এটা বোঝার একটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মাপকাঠি এইচ ডি আই (Human Development Indicator), বা মানব উন্নয়ন সূচক।

রাষ্ট্রপুঞ্জের ইউ এন ডি পি (UNDP) ২০১১ সালে ভারতের ১৯টি রাজ্যের এইচ ডি আই চিত্র দিয়ে বলছে, ছত্তীশগঢ়ের অবস্থান ১৮ নম্বরে।

ক) ২০০৬ সালে ২৩টি রাজ্যের মধ্যে ছত্তীশগঢ় ছিল ২৩ তম স্থানে।

খ) নারী উন্নয়ন সূচকে ছত্তীশগঢ় ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ৩০তম স্থানে।

গ) ২০১১ সালের হিসাবে নারীর ক্ষমতায়ণের সূচকে ৩৫টির মধ্যে ১৯ স্থানে।

দারিদ্র্য ও ক্ষুধার নিরিখে ছত্তীশগঢ়ের অবস্থান ২০০৯-২০১০ সালে ঃ

রাজ্যের ৪৮.৭ শতাংশ মানুষই দারিদ্র্যপীড়িত, যখন একই সময়ে গোটা দেশে ওই হার ২৯.৮ শতাংশ। অর্থাৎ, রাজ্যের এক কোটি ২০ লক্ষ মানুষ দারিদ্র্যপীড়িত, গোটা দেশে ৩৫ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ।

মনে রাখা দরকার, রমন সিংহের ক্ষমতায় অবস্থানের মেয়াদ ১৫ বছর, ২০০৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত। দেখা যাচ্ছে, ২০০৫ থেকে ২০১৭, অর্থাৎ ১২ বছরের এই সময়কালের মধ্যে ছত্তীশগঢ়ের মানব উন্নয়ন সূচক সামান্য হলেও ০.৫৮৩ থেকে বেড়ে ০.৬০৫ হয়েছে। তবে তখনও দেশের ২৯টি রাজ্যের মধ্যে ছত্তীশগঢ়ের অবস্থান ২৪তম। রাজ্যের সামগ্রিক উৎপাদনের বৃদ্ধির হার পড়তির দিকে। ২০১৫-২০১৬ আর্থিক বছরে উন্নয়নের বৃদ্ধির হার আশা করা হয়েছিল ১৪ শতাংশ হবে, হয়েছে মাত্র ৬.৪০ শতাংশ। উল্লেখযোগ্য, মোটামুটি ওই সময়েই রাজ্যের রেশন সরবরাহ ব্যবস্থায় ৩০,০০০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি[১২] ধরা পড়ে।

২০১৮ সালের মানব উন্নয়ন সূচকের (এইচ ডি আই) রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর নীতি আয়োগের কর্ণধার (সি ই ও) অমিতাভ কান্তের হতাশ মন্তব্য, ''ছত্তীশগঢ়, উত্তর প্রদেশ, বিহারের জন্যই দেশ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে একেবারে পিছনের সারিতে পড়ে রয়েছে।''[১৩]

তবে মনে রাখা ভালো, জঁ দ্রেজের মতো অর্থনীতিবিদ কিন্তু মানব উন্নয়ন সূচককে উন্নয়নের একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে দেখতে রাজি নন। তিনি মনে করেন, বৃহত্তর প্রেক্ষিতে তৈরি মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে কোনও চটজলদি সিদ্ধান্তে না পৌঁছে, বরং যে সব সূচকের উপর ভিত্তি করে মানব উন্নয়ন সূচকের রিপোর্ট তৈরি হয়, সেগুলি খুঁটিয়ে দেখা দরকার। উদাহরণ হিসাবে দ্রেজ রাজ্যের উন্নয়ন হচ্ছে কি না তা বুঝতে শিশু স্বাস্থ্যের অবস্থা খতিয়ে দেখার পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, ছত্তীশগঢ়ে শিশুস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ভালোই কাজ হচ্ছে।[১৪] এই প্রসঙ্গে তিনি FOCUS Report এবং ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলিকে এই বিষয়ে প্রকাশিত তাঁর দুটি গবেষণাপত্রের উল্লেখ করেন।

ছয় বছরের কমবয়সী শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমীক্ষার FOCUS Report প্রকাশ হয় ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে। এই রিপোর্টে ব্যবহৃত যাবতীয় তথ্য ও পরিসংখ্যানই সরকারের ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিম (বা, আই সি ডি এস) এর তরফে করা ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে নেওয়া। ২০০৪ সালের মে-জুন মাসে ওই সমীক্ষা করা হয়েছিল ছত্তীশগঢ়, হিমাচল প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানে। ফোকাস রিপোর্টে দেশের শিশু স্বাস্থ্যের

একটা সামগ্রিক চিত্র দিয়ে বলা হয়, ভারতের মোট শিশুদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই অপুষ্টিতে, এবং অর্ধেকেরও বেশি শিশু রক্তাল্পতায় ভুগছে। রমন সিংহ সরকার যে হেতু ২০০৩ সালে ক্ষমতায় এসে পরের বছর, অর্থাৎ ২০০৪ সালে খাদ্য সুরক্ষা সহ বিভিন্ন কল্যানকামী ও জনপ্রয়তাবাদী প্রকল্প শুরু করেছিল, তাই এই ফোকাস রিপোর্ট যে রমন সিংহ সরকারের কাজের মূল্যায়ণে প্রাসঙ্গিক নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বরং শিশু স্বাস্থ্য চিত্রটা বুঝতে জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা ৩ (National Family Health Survey-3 বা NFHS-3) এবং জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা ৪ (National Family Health Survey-4 বা NFHS-4), এই দুই রিপোর্টকে তুলনা করে দেখা যেতে পারে। প্রথমটি হয়েছিল ২০০৫-২০০৬ সালে, আর দ্বিতীয়টি তার ১০ বছর বাদে ২০১৫-২০১৬ সালে। রক্তাল্পতা (anaemia) যেহেতু শিশু স্বাস্থ্যের ভালো মন্দ বোঝার গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি, তাই দুই রিপোর্টে এ বিষয়ে পাওয়া তথ্য পরিসংখ্যানের তুলনা করা যায়। এই দুই রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট, শিশু পুষ্টির ক্ষেত্রে এই ১০ বছরে দেশে ভালো কাজ হয়েছে। রক্তাল্পতাকে মাত্রা অনুযায়ী মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। অল্প মাত্রা, মাঝারি মাত্রা ও চরম মাত্রা। এন এফ এইচ এস-৩ এর সময় দেশের পাঁচ বছরের নিচের ৭১.২ শতাংশ শিশুই কোনও না কোনও মাত্রায় রক্তাল্পতার শিকার ছিল। তারমধ্যে ২৪ শতাংশ শিশু অল্প মাত্রায়, ৪৫ শতাংশ মাঝারি মাত্রায় এবং দুই শতাংশ চরম মাত্রায় রক্তাল্পতায় ভুগছিল।[১৫] এন এইচ এফ এস-৩ রিপোর্টে ছয় মাস বয়স থেকে ৩৫ মাস বয়সী শিশুর স্বাস্থ্যের সঙ্গে তার আগের এন এইচ এফ এস-২ রিপোর্টের তুলনা করে এটাও বলা হয় যে রক্তাল্পতার শিকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এন এইচ এফ এস-২ রিপোর্টে উপরে উল্লেখিত বয়সী শিশুদের রক্তাল্পতার হার ছিল ৭৪ শতাংশ, তা এন এইচ এফ এস-৩ এর সময় বেড়ে ৭৯ শতাংশ হয়েছিল।[১৬]

কিন্তু রক্তাল্পতার এই বৃদ্ধি এন এইচ এফ এস-৪ এর সময় দেখা গেল কমতে শুরু করেছে। এই ১০ বছরের ব্যবধানে শিশু শরীরের বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও উন্নতি দেখা গেল। অপুষ্টিজনিত কারণে শিশুর শরীরের বাড় ব্যাহত (stunting) হয়। এন এইচ এফ এস-৩ এর সময় ছত্তীশগঢ়ে পাঁচ বছর বয়সের নিচে ৫৩ শতাংশ শিশুই শরীরের এই বৃদ্ধি আটকে থাকার সমস্যার শিকার ছিল। এন এইচ এফ এস-৪ রিপোর্টে দেখা গেল, তা ১৫ শতাংশ কমে ৩৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আবার, এন এইচ এফ এস-৩ রিপোর্ট অনুযায়ী ছয় থেকে ৫৯ মাস বয়সসীমার মধ্যে থাকা শিশুদের ৭১ শতাংশ এবং নারীদের মধ্যে ৫৮ শতাংশ রক্তাল্পতায় ভুগছিল। ১০ বছর বাদে এন এইচ এফ এস-৪ রিপোর্টে দেখা গেল, সেটাও অনেকটাই কমছে। ওই একই বয়সের গ্রুপে থাকা শিশুদের ক্ষেত্রে তা নেমে এসেছে ৪১,৫ শতাংশে। অর্থাৎ, প্রায় ৩০ শতাংশ কমেছে। নারীদের রক্তাল্পতার সমস্যা কিন্তু প্রায় একই জায়গায় রয়ে গিয়েছে, তখনও ৫৩ শতাংশ রক্তাল্পতার শিকার।[১৭] বলাই বাহুল্য, আর্থিক দিক থেকে

সবচেয়ে অনুন্নত এলাকায় নারীদের মধ্যে যেহেতু রক্তাল্পতার সমস্যা বেশি দেখা দেয়, সেই সব এলাকায় শিশুদের মধ্যেও রক্তাল্পতা বাড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

শিশুপুষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরেও এন এইচ এফ এস-৪ রিপোর্টে সতর্ক করে বলা হয়েছে, এন এইচ এফ এস-৩ এর তুলনায় এন এইচ এফ এস-৪ সমীক্ষায় অবশ্যই শিশু স্বাস্থ্যের কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে, কিন্তু এখনও অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি হওয়া বাকি। এটা ঠিকই যে এই ১০ বছরে শিশু শরীরের বাড়ের সমস্যা (stunting) অনেকটাই কমেছে। আগে বয়সের সঙ্গে তাল রেখে যে সময় শিশুর যতটা ওজন হওয়া দরকার, তা বেশিরভাগেরই হচ্ছিল না। সেটাও কমার দিকে, ৪৭ শতাংশ থেকে কমে ৩৮ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু একই সময়ের মধ্যে শিশুশরীরে ক্ষয়ের (wasting) হার সামান্য হলেও বেড়েছে, ২০ থেকে বেড়ে ২৩ শতাংশ হয়েছে। এন এইচ এফ এস-৪ রিপোর্ট সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, শিশু দেহের বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃদ্ধি হওয়া, রক্তাল্পতা হ্রাস ও ওজন বাড়ার ক্ষেত্রে সমস্যা কমতে শুরু করা সত্ত্বেও রাজ্যে শিশুদের অপুষ্টির সমস্যাটি এখনও তীব্র আকারেই রয়েছে।[১৮]

ছত্তীশগঢ়ে অপুষ্টির এই জ্বলন্ত সমস্যার প্রতি অন্য অনেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ পোষন অভিযান কার্যক্রম (Partnership and Opportunities to Strengthen and Harmonise Actions for Nutrition in India বা সংক্ষেপে POSHAN) ছত্তীশগঢ়ের পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু এবং জননী হতে সক্ষম বয়সী নারীদের ব্যাপক অপুষ্টির দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছে। POSHAN রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যের মোট ২৭টি জেলার মধ্যে সবচেয়ে সঙ্কটজনক অবস্থা বস্তারের। সেখানে পাঁচের নিচের বয়সী শিশুদের মধ্যে ৪১.৬ শতাংশ শরীরের বাড় আটকে থাকার (stunting) সমস্যাক্রান্ত। ওই বয়সীদের মধ্যে শরীরের ক্ষয় (wasting) সমস্যা রয়েছে ৩৩.৯ শতাংশের, ৫০.৬ শতাংশের ওজন বয়সের তুলনায় কম (under weight) আর মহিলাদের মধ্যে রক্তাল্পতায় ভুগছে ৬৭.৬ শতাংশ। বস্তারের মতোই সরগুজা আর একটি জেলা যেখানে আদিবাসীরা জনসংখ্যার সিংহভাগ। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ৩১.৩ শতাংশের শরীরের বাড় আটকে রয়েছে, অপুষ্টির কারণে শরীরের ক্ষয়ে আক্রান্ত ২২.৩ শতাংশ, বয়সের তুলনায় ওজন কম ৩৪.৭ শতাংশের আর ৩৮.৬ শতাংশ রক্তাল্পতায় ভুগছে। মহিলাদের মধ্যে রক্তাল্পতার হার ৩৫.১ শতাংশ। বস্তারের তুলনায় সরগুজার চিত্র কিছুটা ভালো। অন্যদিকে, ধমতেরি জেলা, যা রাজধানী রায়পুর ও বস্তারের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত, তার অবস্থা ভালো নয়। সেখানে অপুষ্টি প্রবলভাবে উপস্থিত। ধমতেরি জেলায় পাঁচ বছরের নিচে শিশুদের মধ্যে ৩৪.২ শতাংশের শরীরের বাড় আটকে (stunting) রয়েছে। ২৭ শতাংশের শরীরে অসময়ে ক্ষয় হচ্ছে, ৪০.২ শতাংশ শিশুর বয়সের তুলনায় ওজন কম এবং ৫২.৭ শতাংশ রক্তাল্পতার শিকার।[১৯]

শিশু ও নারীর অপুষ্টি ও রক্তাল্পতা কমার ক্ষেত্রে এই মিশ্র সাফল্য থেকে বোঝা যায়, রাজ্যে রমন সিংহের আমলে রেশন ব্যবস্থার সংস্কারের বেশ কিছু ইতিবাচক ফল হয়েছে, তবে আরও অনেক কাজ বাকি রয়েছে। জঁ দ্রেজ এবং তাঁর তিন সহযোগী প্রাঙ্কুর গুপ্ত, রীতিকা খেরা ও ইসাবেল পিমেন্টা ২০১৬ সালে ছত্তীশগঢ় সহ ছয় রাজ্যে সমীক্ষা চালিয়ে তার ফল বিশ্লেষণ করে বলেন, ''আমরা সমীক্ষার ফল নিয়ে আলোচনাটির উপসংহারে এসে সন্তোষ প্রকাশ করতে পারি। অতীতের সমীক্ষার মতোই ২০১৬ সমীক্ষাতেও দেখা যাচ্ছে, ছত্তীশগঢ়ের রেশনব্যবস্থা পরিচালনার কাজ খুবই ভালোভাবে চলছে। মাসে মাসে ঠিক সময়ে পুরো রেশন বন্টন হতে দেখে আমরা খুবই অভিভূত।''[২০]

ছত্তীশগঢ়ে রেশনব্যবস্থা পরিচালনায় এই সাফল্যে দ্রেজ ও তাঁর সহযোগীদের উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও অপুষ্টির সমস্যাটি বার বার সামনে চলে আসতেই থাকে। ২০১৯ সালে নীতি আয়োগের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী ছত্তীশগঢ়ের ৩৭.৬০ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। নারী ও কিশোরীদের মধ্যে রক্তাল্পতার হার ৪১.৫০ শতাংশ। ছত্তীশগঢ়ের বর্তমান মখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের ভূপেশ বাঘেল নিজেই এ কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন।[২১] জঁ দ্রেজ যদিও ছত্তীশগঢ়ের মধ্যে খুব শীগগিরই বিমারু দেশগুলির গোষ্ঠী (অবিভক্ত বিহার, উত্ত রপ্রদেশ, অবিভক্ত মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানকে সবচেয়ে অনুন্নত ধরা হয়। ছত্তীশগঢ় যেহেতু আগে মধ্যপ্রদেশের অংশ ছিল, তাই ছত্তীশগঢ়কেও বিমারু রাজ্যগুলির মধ্যে ধরা হয়।) থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে বলে আশাবাদী। তাঁর কথায়, ''ছত্তীশগঢ় এখন স্পষ্টতই সমস্যাক্রান্ত রাজ্যগুলির মধ্যে পড়ে না। উপস্থিত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এ কথা বলা যেতেই পারে যে শিশুস্বাস্থ্যের উন্নতির মানদন্ডে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ছত্তীশগঢ় দ্রুত উন্নতি করছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০০০ সালে এই রাজ্য গঠনের সময়েই ছত্তীশগঢ় অন্য বিমারু রাজ্যগুলিকে পিছনে ফেলে সামনে উঠে এসেছিল। সম্ভবত, এতদিনে ফারাকটা আরও বেড়েছে।''[২২]

জেনে রাখা ভালো, শিশু ও নারীদের মধ্যে রক্তাল্পতার প্রাদুর্ভাব দেশের প্রতিটি রাজ্যেই কমবেশি দেখা যায়। মাত্র চারটি রাজ্যের শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় রক্তাল্পতার উপস্থিতি ৫০ শতাংশের নিচে। সেগুলি হল গোয়া (৩৮ শতাংশ), মনিপুর (৪১ শতাংশ), মিজোরাম (৪৪ শতাংশ) এবং কেরল (৪৫ শতাংশ)। এর বিপরীতে বিহারে ৭৮ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে ৭৪ শতাংশ, হরিয়ানায় ৭২ শতাংশ এবং ছত্তীশগঢ়ে ৭১ শতাংশ হারে রক্তাল্পতা রয়েছে। চরম মাত্রার রক্তাল্পতা (৬ শতাংশ) রয়েছে পঞ্জাব ও রাজস্থানে।[২৩] বোঝাই যাচ্ছে, দ্রেজ যতই আশাবাদী হোন না কেন, বিমারু রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হলে ছত্তীশগঢ়কে এখনও অনেক পথ যেতে হবে।

অতি সম্প্রতি বাঘেলের কংগ্রেস সরকার সেখানে এই ব্যাপকহারে অপুষ্টির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। তারা গরিবদের জন্য, বিশেষ করে গোটা রাজ্যের আদিবাসী এলাকাগুলিতে ডিম, ডাল ইত্যাদি প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার জোগানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা শুরু করার আগে সরকার বস্তার,

দান্তেওয়ারা সহ কয়েকটি জেলায় একটি পাইলট প্রজেক্ট করে পরীক্ষা চালায়। পরীক্ষায় ভালো ফল মেলায় এখন তা রাজ্যজুড়ে করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আদিবাসী এলাকায় এই প্রকল্প চালু হলে তা শিশুদের সঙ্গেই মায়েদের রক্তাল্পতা দূর করতেও সাহায্য করবে।[২৪]

এই সব খামতি সত্ত্বেও এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে উন্নত রেশন ব্যবস্থা চালু রাখার মতো বিভিন্ন জনকল্যাণকারী প্রকল্পগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। সাম্প্রতিক অতীতের যোজনা কমিশনের (এখন অস্তিত্ব নেই) প্রাক্তন সদস্যসচিব নরেশ সাকসেনা কেন্দ্রের খাদ্য নিরাপত্তা আইনের অন্যতম রূপকারও। সাকসেনা মনে করেন, ''সস্তায় রেশন ছাড়াও বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী প্রকল্প এমনকি নগদ টাকা বন্টনের মাধ্যমে গরিব মানুষের উপকারই হয়। সেই সঙ্গে তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের জন্য দক্ষতা অর্জন করার দিকেও নজর দেওয়া জরুরী। তার জন্য চাই উন্নত মানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার সুযোগ। মনে রাখতে হবে, এখানে একটার বিকল্প আর একটা নয়, হয় এটা, না হয় ওটা নয়, সবকয়টি সুযোগই দিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, বেশিরভাগ রাজ্যই গরিবদের অবস্থার উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প চায় না। ফলে, পুষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে উপকার হয় না।''[২৫]

সরকারি জনপ্রিয়তাবাদী কাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ঃ

আপাতদৃষ্টিতে রমন সিংহ বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের গরিবের উন্নতির জন্য নেওয়া বিভিন্ন জনমুখী উদ্যোগের সঙ্গে সনাতন বামপন্থী গরিবমুখী কর্মধারার কিছুটা মিল চোখে পড়তে বাধ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই জনপ্রিয়তাবাদী কর্মকান্ড প্রচলিত বামপন্থী আন্দোলনের ধারা থেকে ভিন্ন। বামপন্থীরা শ্রেণীর ভিত্তিতে তাদের জনভিত্তি তৈরি করতে আগ্রহী। বিপরীতে, রমন সিংহ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমনকি অরবিন্দ কেজরিওয়ালরা শ্রেণীবিভাজনকে কার্যত অগ্রাহ্য করে সব শ্রেণীর মানুষকে এক ছাতার তলায় জড়ো করে একটা নির্দিষ্ট আকার বা অবয়বহীন 'জনগণ' তৈরিতে বেশি আগ্রহী। তবে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিকরা প্রভাব বিস্তারের শুরুতেই ২০০৪ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউ পি এ-১ সরকার যে চিরাচরিত ধারার রাজনীতির পথে হেঁটেই তার প্রেক্ষিত তৈরি করে দিয়েছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ওই পাঁচ বছরে মনমোহন সিংহের সরকার এমন কয়েকটি গরিব ও সাধারণ মানুষ কেন্দ্রিক আইন তৈরি করে, যা দেশের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ১৯৯১ সাল থেকে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতেও নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির দর্শন যে ভাবে জাঁকিয়ে বসেছিল, এবার তা কিছুটা হলেও ধাক্কা খায়। তখন ক্ষমতাসীন বিজেপির শাইনিং ইন্ডিয়া ক্যাম্পেনকে ছাপিয়ে বেহাল কৃষির জেরে লক্ষ লক্ষ কৃষকের আত্মহত্যা বড়ো হয়ে দেখা দেয়। ফলে, সাধারণ নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এসে ইউ পি এ-১ সরকার সামাজিক ক্ষেত্রের দিকে নজর ফেরাতে বাধ্য হয়। যার সুফল কাজের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইন (Mahatma Gandhi National Rural Employment Generation Act), যা

১০০ দিনের কাজ নামে বহুল প্রচলিত। এই আইনের হাত ধরে পর পর আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জনমুখী আইন সংসদে পাস হয়। তারমধ্যে তথ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার উল্লেখযোগ্য। খাদ্যের অধিকার আইনে রূপান্তরিত হয় আরও পরে, ২০১২ সালে ইউ পি এ -২ সরকারের আমলে। এ ছাড়া বনজ সম্পদের উপর যে আদিবাসীদের জীবনযাপন নির্ভরশীল, তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে বিশেষ করে তাদের জন্য বনে অধিকার সংক্রান্ত আইন হয়। ছত্তীশগঢ়ে যদিও কেন্দ্রের খাদ্য নিরাপত্তা আইন হওয়ার অনেক আগেই রমন সিংহের উদ্যোগে খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে রেশন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছিল, এবার দেখা গেল অন্য রাজ্যগুলিও ধীরে হলেও জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির পথে পা ফেলছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের অমোঘ নিয়মে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনিবার্য, সেটাই শুরু হল। পরিণতিতে জনপ্রিয়তাবাদী ও জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের সহাবস্থান হতে লাগল।

এই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি কী দক্ষিণপন্থী? আপাতভাবে বলা যেতেই পারে হ্যাঁ, দক্ষিণপন্থী। তার মানে কি জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি মাত্রই দক্ষিণপন্থী হতে বাধ্য? না, সম্ভবত তা নয়। পশ্চিমী দুনিয়ায় আগে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি বলতে প্রধানত যে ধারণা গড়ে উঠেছিল তাতে মনে করা হত যে জনপ্রিয়তাবাদীমাত্রই উগ্র দক্ষিণপন্থী, তারা জাতিদ্বেষী, সংকীর্ণতাবাদী ও ফ্যাসিবাদী চিন্তার ধারকবাহক। কিন্তু আর্নেস্টো ল্যাকলাউ (Ernesto Laclau) ও শাঁতাল মুফ (Chantal Mouffe) এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেন। তাঁদের বক্তব্য, স্পেনের বামঘেঁষা পোদোমেস দল, ফ্রান্সের দক্ষিণপন্থী দল ন্যাশনাল ফ্রন্ট, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বা বিরোধী নেতা উদারপন্থী বার্নি স্যান্ডার্স ও ইংল্যান্ডের জেরেমি করবিন সবাই আসলে জনপ্রিয়তাবাদী। অর্থাৎ, জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী, যে কোনও মোড়কেই আসতে পারে। ল্যাকলাউ ও মুফের জনপ্রিয়তাবাদের তত্ত্ব তৈরিই হয়েছিল গোঁড়া মার্কসবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের চিন্তাধারাকে প্রত্যাখ্যান করে। বরং তাদের চিন্তায় ইতালীয় মার্কশবাদী চিন্তাবিদ আন্তনিও গ্রামশির চিন্তাধারার প্রভাব রয়েছে। গ্রামশির আধিপত্যবাদ (hegemony) এবং ঐতিহাসিক জোট (historical bloc) এর তত্ত্বকে তাঁরা গ্রহণ করে তার উপরে নিজেদের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ল্যাকলাউ মনে করেন, জনপ্রিয়তাবাদ একটি রাজনৈতিক অস্ত্র যা বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী বা মধ্যপন্থীরা সমানভাবে ব্যবহার করতে পারে। এই ধারার তাত্ত্বিকরা জনপ্রিয়তাবাদকে প্রধানত একটি রণনীতি হিসাবে দেখে থাকেন, যা কিনা 'ক্ষমতাশীলদের' বিরুদ্ধে 'জনগণ'কে সংঘবদ্ধ করে তাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। এই 'জনগণ' মোটেই কোনও নির্দিষ্ট একটি শ্রেণী বা একাধিক শ্রেণীর স্বার্থের মিলের কারণে জোটগঠন করে তৈরি হয়নি। বরং এটা সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের একটি নির্দিষ্ট অবয়বহীন জোট, যাদের মধ্যে স্বার্থসংঘাতের সম্ভাবনা থাকতেই পারে। 'ক্ষমতাশীল' বলতে এখানে সমাজের সেই অংশের কথা বলা হচ্ছে, যারা সমাজের বাকি অংশের ('জনগণ') উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে। জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির মূল

কথাই এটা, শ্রেণীবিভাজনের ঊর্দ্ধে উঠে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে নিয়ে ক্ষমতার আধিপত্যের বিরুদ্ধে জনগণকে সংঘবদ্ধ করে তোলা।

কিন্তু ভারতের প্রেক্ষিতে সমস্যাটা একটু ভিন্ন। এখানে পশ্চিমী দুনিয়ার ধ্যানধারণার মাপকাঠিতে জনপ্রিয়তাবাদকে বুঝতে গেলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। এ দেশে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি পশ্চিমী দুনিয়ার বাঁধা ছক অনুযায়ী আত্মপ্রকাশ করে নি। বরং বলা যায়, এখানে পশ্চিমী দুনিয়ার জনপ্রিয়তাবাদ ও এখানকার রাজনীতির মিশ্রণ ঘটছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই ধরা যাক। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ধারার বামবিরোধী আন্দোলনের রাজনীতি করার পরে মমতা পরের দিকে আরও বৃহত্তর জনসমর্থন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। সে জন্য বামপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে বামপন্থী কর্মী ও সমর্থকদেরও তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান জানান। এভাবেই তিনি পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে 'জনগণ' তৈরি করেন। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরে কিন্তু মমতা তাঁর যাবতীয় জনপ্রিয় ও কল্যাণকর প্রকল্পের কাজ সরকারি আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে পরিচালনা করতে থাকেন। একই কথা দিল্লিতে কেজরিওয়ালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু রমন সিংহের বিষয়টা একটু আলাদা। ২০০৩ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে এনে বি জে পি রমন সিংহকে ছত্তীশগঢ়ে বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিতে বলে। নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে বি জে পি ক্ষমতায় আসে। রমন সিংহ মুখ্যমন্ত্রী হন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে রমন সিংহ নিজের ও দলের জনভিত্তি মজবুত করার প্রথম ধাপ হিসাবে একের পর এক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি ও প্রকল্প শুরু করেন, যার প্রথমটিই ছিল রেশনব্যবস্থার আমূল সংস্কার। এটা ঠিক বেশিরভাগ প্রকল্প রূপায়ণে তিনিও সরকারি প্রশাসনের আমলাতন্ত্রকেই ব্যবহার করেছিলেন। তবে, রেশনব্যবস্থার সংস্কার করতে তিনি মুখ্যত সাধারণ মানুষের উপর নির্ভর করেন। তাঁর আগে কংগ্রেসের অজিত জোগীর আমলে রেশনব্যবস্থা পুরোপুরি বেসরকারি রেশন ডিলারদের হাতে ছিল। রমন সিংহ তা বাতিল করে গ্রাম পঞ্চায়েত, মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী, আদিবাসীদের নিয়ে তৈরি বনসুরক্ষা সমিতি এবং গ্রামের বিভিন্ন অংশের মানুষকে রেশন বন্টন ব্যবস্থা পরিচালনায় নিয়ে এলেন। এ কাজে নিযুক্ত সরকারি আমলাদের পাশ কাটিয়ে তিনি গ্রামের সাধারণ মানুষকে গোটা ব্যবস্থার উপর নজরদারি চালানোর কাজে যুক্ত করে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন। এ ভাবে রেশন ডিলার ও একশ্রেণীর আমলাদের মধ্যে গড়ে ওঠা অশুভ আঁতাতকে সাময়িকভাবে হলেও ভেঙে দেওয়ায় চুরি কমে, গ্রহীতারা ন্যায্য পরিমাণে রেশন পেতে শুরু করায় রমন সিংহ বিপুল জনপ্রিয়তা পান, গ্রামের গরিব মানুষেরা রমন সিংহকে 'চওর ওয়ালা বাবা' (ছত্তীশগঢ়ী ভাষায় এর অর্থ, যিনি চাল দেন) বলে ডাকতে শুরু করে।

এই ঘটনা পরম্পরা আমাদের সেই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়; ভারতে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিকে আমরা কী ভাবে দেখব? জনপ্রিয়তাবাদের পশ্চিমী ধ্যানধারণার কথা মাথায় রেখেও যদি আমরা সরকারি প্রশাসনের মধ্য দিয়ে এই রাজনীতির আত্মপ্রকাশকে খতিয়ে

দেখার চেষ্টা না করি, তা হলে, বোধহয় বোঝার কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রণবীর সমাদ্দারের মতে, এটা হতে পারে যে ভারতসহ উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশগুলির ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিকে বুঝতে হল, সরকারি প্রশাসনের মধ্য দিয়ে এই যে রাজনীতির আবির্ভাব ঘটছে, তাকেও বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। একমাত্র তাহলেই ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়া এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশগুলির জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির চরিত্রকে সার্বিকভাবে বোঝা সম্ভব হবে। শাঁতাল মুফ মনে করেন, 'জনগণ' ও তার 'শত্রু'র মধ্যে পার্থক্যরেখা নির্দিষ্ট করতেই হবে, কারণ সব রাজনীতির লড়াইয়ের চরিত্রই সংঘর্ষমূলক। মুফ যাকে 'agonistic' বলছেন।[২৮] এই 'agonistic' লক্ষণ কখনও বিদেশীদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ (xenophobia) ছড়ানোর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশি, কখনও বা রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ পায়। আবার কখনও নকশালপন্থীদের চিহ্নিত করে দেশের অভ্যন্তরে সবচেয়ে বড় শত্রু হিসাবে।

রমন সিংহ ও নকশালপন্থী সমস্যা ঃ

রমন সিংহ যে ২০০৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত পর পর একগুচ্ছ জনহিতকারী প্রকল্প নিয়েছিলেন, তা কি শুধুই নিস্বার্থ জনসেবা ছিল? তা হলে ২০০৫ সালে তাঁরই উদ্যোগে 'সালওয়া জুডুম' (ছত্তীশগঢ়ীতে যার অর্থ, শান্তি অভিযান এবং শোধন অভিযান) কেন তৈরি করা হল? বাস্তবে, এই সালওয়া জুডুম একটি সশস্ত্র ভাড়াটে বাহিনী, যার কাজ নিরাপত্তা বাহিনীর সমান্তরালে নকশালপন্থীদের (নামান্তরে, মাওবাদীদের) খতম করা। সরকারি মদতে অস্ত্রসজ্জিত এই বাহিনীর হাতে অনেক হত্যাকান্ড ও অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশ্যে আসার পরে যে ব্যাপক প্রতিবাদ হয়, তার জেরে সুপ্রিম কোর্ট ২০১১ সালে সালওয়া জুডুমকে নিষিদ্ধ করে সরকারকে অবিলম্বে সব অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করতে বলে। এরা নিষিদ্ধ হলেও তারপরেও সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে এরকম ছোটবড় সশস্ত্র ভাড়াটে বাহিনী ছত্তীশগঢ়ে সক্রিয়। সালওয়া জুডুম থাকাকালীন প্রধানত বস্তার জেলায় কয়েক লক্ষ আদিবাসীকে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র নিরাপত্তা বাহিনীর নিয়ন্ত্রনাধীন এলাকায় থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল। এটা করার পিছনে সরকারের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল, নকশালপন্থীদের থেকে আদিবাসীদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। শুধু এদের নাগাল এড়াতে অন্তত ৫০০০ আদিবাসী পরিবার বস্তার থেকে পালিয়ে প্রতিবেশী রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশে (এখন সেই এলাকা নতুন রাজ্য তেলেঙ্গানার অন্তর্গত) আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। এন সি সাকসেনার মন্তব্য, মধ্য ভারতের সমাজের যাবতীয় বঞ্চিত অবহেলিত মানুষের মধ্যে আদিবাসীদের অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। এর প্রধান কারণ, সরকারের আদিবাসীবিরোধী বনসম্পদনীতি, ব্যাপকহারে ভিটেছাড়া করা ও আদিবাসী এলাকার উন্নয়নের কাজে অবহেলা করা। সাকসেনার মতে, ''আদিবাসীরা তাদের জীবননির্বাহের জন্য বনজঙ্গল ও বনজ উপজের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হলেও তথ্য পরিসংখ্যাণ বলছে, গত ৭০ বছর ধরে আদিবাসীরা অরণ্যের উপর অধিকার ক্রমশই হারিয়ে চলেছে। ১৯৫২ সালে তৈরি সরকারি অরণ্যনীতি, বিভিন্ন ধরণের বৃক্ষ ও গুল্মের সহাবস্থানে স্বাভাবিক যে অরণ্য থাকে, তার বদলে সামাজিক বনসৃজনের নামে

নির্দিষ্ট কয়েক ধরণের বৃক্ষরোপণ, খনিজসম্পদ ব্যবহারের তাগিদে বনাঞ্চলের বিশাল অংশ শিল্পসংস্থার হাতে তুলে দেওয়া, এ সবের কারণে অরণ্যের উপর আদিবাসীদের অধিকার দ্রুত কমছে। তার সঙ্গে সরকারি কর্তাদের ও ঠিকাদারদের শোষণ ও অত্যাচার তো রয়েছেই। ওড়িশার রায়গড়াতে তো একবার কিছু আদিবাসী মহিলাকে বাড়িতে ঝাঁটা রাখার দায়ে জেল খাটতে পর্যন্ত হয়েছিল।"[২৯] সাকসেনা এটাও বলেন যে মধ্যভারত খনিজ ও অরণ্য সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও সেখানকার আদিবাসীরা শিল্পায়নের কারণে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ভিটেছাড়া হয়েছেন। তাঁর দাবি, স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন বৃহৎ প্রকল্প ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল তৈরির কারণে অন্তত ৮৫ লক্ষ মানুষ ভিটে ছাড়া হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৫৫ শতাংশই আদিবাসী, যদিও জনসংখ্যার মাত্র ৮ শতাংশ মানুষ আদিবাসী। এ সবের জেরে আদিবাসভদের এমনিতেই ভঙ্গুর আর্থসামাজিক অবস্থা আরও ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে। অসংখ্য আদিবাসী এখন জমিহারা হয়ে জীবননির্বাহ করতে গিয়ে সঙ্কটের সম্মুখীন। অনেকে বংশপরম্পরায় দাসশ্রমিকে পরিণত।[৩০]

ছত্তীশগঢ় এই মধ্যভারতেরই অন্তর্গত। আদিবাসীরা এখানে জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ। ওড়িশা, তেলেঙ্গানা ও মহারাষ্ট্র সংলগ্ন বস্তার জেলায় নকশালপন্থীরা মবচেয়ে বেশি সক্রিয়। ২০১১ সালের জনগণণা অনুযায়ী গোটা ছত্তীশগঢ়ে আদিবাসীরা জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ হলেও বস্তারে আদিবাসীরা ৭০ শতাংশ। এখন ছত্তীশগঢ়ে বিশেষ করে বস্তারে, একদিকে আধা সামরিক বাহিনী ও পুলিশ, অন্যদিকে নকশালপন্থীরা, এই দুইয়ের মধ্যে ফাঁদে বন্দী। যুযুধান দুই পক্ষই হিংসার প্রয়োগ করছে, আর আদিবাসীরা দুদিক থেকেই মার খাচ্ছে। এর একটা অন্য চিত্রও রয়েছে। বস্তারের মতো এলাকা যেহেতু খনিজ সম্পদে ধনী, তাই সেখানে খনি চালাতে ও শিল্পস্থাপনে আগ্রহী। নকশালপন্থীরা শিল্পকর্তাদের কাছ থেকে নিয়মিত জোর করে তোলা আদায় করছে। পাশাপাশি, এটাও সত্য যে নকশালপন্থীরা সড়ক নির্মাণ, স্কুল বা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মতো সামাজিক পরিকাঠামো তৈরির কাজে বাধা দিয়ে চলেছে, যাতে করে তারা আদিবাসীদের বঞ্চনার অভিযোগকে জিইয়ে রেখে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে পারে। ফলে, নিজেদের তারা আদিবাসীদের মুখপাত্র বলে দাবি করলেও তার অন্তসারশূণ্যতাই ফুটিয়ে তোলে।[৩১]

নকশাল সমস্যার মোকাবিলায় দ্বিমুখী নীতি ঃ

ক্ষমতায় আসার পরে রমন সিংহের ধারণা ছিল, নকশাল আন্দোলনকে শীঘ্রই দমন করে ফেলা যাবে, নিতান্তই তা না হলে তাকে দাবিয়ে স্তিমিত করে দেওয়া যাবে। এটা দমনপীড়নের মাধ্যমেই করা যাবে বলে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু কয়েক বছর টানা কড়া হাতে মোকাবিলার চেষ্টায় তেমন লাভ না হওয়ায় উপদ্রুত রাজ্যগুলি এবং কেন্দ্রীয় সরকার বিকল্প রাস্তার সন্ধান শুরু করে। সে জন্য বিশেষজ্ঞদের জড়ো করে তাদের এই নকশাল সমস্যা খতিয়ে দেখতে বলা হয়। ২০০৮ সালে ওই বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী যোজনা কমিশনের (এখন অবলুপ্ত) কাছে একটি দীর্ঘ রিপোর্ট[৩২] জমা দেয়। তাতে আদিবাসী জনজীবনে নেমে আসা আঘাতে

বিপর্যয় ও তাদের জমি হারানোকেই নকশাল সমস্যার মূল বলে চিহ্নিত করা হয়। রিপোর্টে আদিবাসীদের সমাজের একপাশে প্রান্তিক অবস্থানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে তারা ধারাবাহিকভাবে জমি হারিয়ে চলেছে। এই প্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, শুধুই নিরাপত্তাকেন্দ্রিক মনোভাব নিয়ে নকশালপন্থী আন্দোলনের মোকাবিলা করা যাবে না। সশস্ত্র নকশালপন্থীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ব্যবস্থার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করেও রিপোর্টে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, আদিবাসী জীবনের সার্বিক উন্নয়ন করার সঙ্গেই তাদের জমির নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিতে পারলে নকশালপন্থীদের কাছ থেকে আদিবাসীদের সরিয়ে এনে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে।

রমন সিংহ তাঁর কাজকর্মের ধারায় অন্য সব নকশাল উপদ্রুত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের তুলনায় অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছেন। সরকারের তরফে বিকল্প উপায় নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করার অনেক আগেই তিনি অনুন্নত অঞ্চলে, বিশেষ করে আদিবাসী এলাকায় উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করেছিলেন। পরে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ অনুযায়ী তিনি ছত্তীশগঢ়ে নকশালদের বিরুদ্ধে দুমুখো রণকৌশল নিতে চেষ্টা করেছিলেন। ২০১২ সালে মুম্বইতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে রমন সিংহ বলেন, ''নকশালপন্থীদের সঙ্গে আলোচনার রাস্তা আমরা কখনই বন্ধ করিনি। এটা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। কারণ, একমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই এই সমস্যা মেটানো সম্ভব, দুই তরফের মধ্যে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা করে মিটবে না।'' তিনি আরও বলেন, ''আমরা নকশালপন্থীদের হৃদয় জয় করতে চাই। আমরা সেখানে (বস্তার জেলায়) রেশন ব্যবস্থা মজবুত করতে চেষ্টা চালাচ্ছি, যে সব সড়কসেতু ওরা ভেঙ্গে দিয়েছে, তা নতুন করে বানাচ্ছি।''[৩৩]

এভাবেই তিনি বস্তার, সরগুজা ও কাঁকেরে (তিনটিই উপদ্রুত জেলা) উন্নয়নের মাধ্যমে সেখানকার মানুষের মন জয়ের চেষ্টা শুরু করেন। বস্তারে রেশন সরবরাহ ব্যবস্থায় গতি আনা শুরু হয়, জেলাসদরের সঙ্গে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে পাকা রাস্তা তৈরি হতে লাগল। রমন সিংহের জনপ্রিয়তাবাদী আন্দোলনের 'শত্রু' খুঁজে পেতেও অসুবিধা হল না। পূর্বতন দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস জমানা এবং নকশালপন্থীরা তো হাতের কাছেই মজুত। এই দুই ঘোষিত শত্রুর বিরুদ্ধে রমন সিংহ তাঁর 'জনগন'কে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নের কাজ করে চললেন।

বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর পরামর্শের পথে হেঁটে কেন্দ্রের ইউ পি এ -২ সরকারও ২০১২ সালে নকশাল-উপদ্রুত রাজ্যগুলির জন্য Integrated Action Prigranne (IAP)[৩৪] শুরু করল। এই IAP প্রকল্পের আওতায় দেশের ১০টি নকশাল উপদ্রুত রাজ্যের ৬০টি জেলার সামাজিক পরিকাঠামো তৈরির জন্য ২০১০-১১ অর্থবর্ষে প্রতিটি জেলার জন্য ২৫ কোটি টাকা করে অর্থ বরাদ্দ হল। পরে জেলার সংখ্যা বাড়িয়ে ৮৮ করা হল। তার মধ্যে ছত্তীশগঢ়েরই ১৪ টি জেলা। পরের বছর থেকে বরাদ্ধ বাড়িয়ে জেলা প্রতি ৩০

কোটি টাকা করা হয়। ২০১৩ সালে প্রকল্পের নাম বদলে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সাহায্য (Additional Central Assistance বা ACA)[৩৫] করা হয়। সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল, ওই সব জেলায় সামাজিক পরিকাঠামো গড়া হবে এবং সরকারি পরিষেবার মান উন্নত করা হবে।

সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিবিধ কর্মসূচি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর দমন অভিযান যুগপৎ চালিয়ে যাওয়ার পরেও দেখা গেল নকশাল সমস্যার বিশেষ সুরাহা হচ্ছে না। এই সময় থেকে রমন সিংহের কথাবার্তায় হতাশার সুর ধরা পড়তে লাগলো। তিনি বললেন, ''দেশের সংবিধান আমাদের নিজেদের জনগনের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী ব্যবহারের অনুমোদন দেয় না। আমারও এতে মনের সায় নেই। তর্কের খাতিরে বলতেই পারি, সেনাবাহিমী নামালে মাত্র চার ঘন্টার মধ্যে পুরো সমস্যাটা মিটিয়ে ফেলা সম্ভব। কিন্তু সেটা কখনই করা উচিত হবে না।''[৩৬] বস্তার সহ নকশাল প্রভাবিত এলাকার উন্নয়নের সমস্যা নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি তাঁর আসল হতাশা ও মনোবাসনা ফাঁস করে দেন। তাঁর দাবি, কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউ পি এ ১ সরকার পরিবেশ ও আদিবাসীদের সংস্কৃতিকে ধরে রাখার দোহাই দিয়ে ওইসব এলাকায় উন্নয়ন করতে দেয়নি।[৩৭] মনে রাখতে হবে, এই ধারার সমালোচনা নয়া অর্থনীতির প্রবক্তাদের মুখে বার বার শোনা যায়। এই উন্নয়নের দোহাই দিয়েই কর্পোরেট দুনিয়া মধ্যভারতের বিপুল খনিজ ভান্ডার নিষ্কাশন ও আহরণ করতে সেখানে প্রবেশ করতে মরিয়া। ঠিক এই কারণেই বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী তাদের সুপারিশে বিশেষ করে আদিবাসী জীবনের সার্বিক উন্নয়ন করার কথা বলেছিল।

নকশাল সমস্যা নিয়ে রমন সিংহ সরকারের নীতিগত অবস্থান ঠিক কী ছিল, তা বোঝার জন্য এব্যাপারে সরকারি প্রয়োজনীয় সরকারি নথি না পাওয়ায় রমন সিংহের জনপ্রিয়তাবাদী উদ্যোগের সঙ্গে নকশালদের মোকাবিলার রণকৌশলের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কিনা তা সুনিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। তা সত্ত্বেও এটুকু বোধহয় বলা যেতেই পারে যে তাঁর জনপ্রিয়তাবাদকে আঁকড়ে ধরার পিছনে আদিবাসীদের মন জয় করে নকশালপন্থীদের কোনঠাসা করার ইচ্ছে একটা অন্যতম কারণ হতেই পারে। ১৯১৮ সালে নির্বাচনে বি জে পির শোচনীয় পরাজয়ের পর ছত্তীশগঢ়ের কংগ্রেসের ভূপেশ বাঘেল মুখ্যমন্ত্রী হন। স্থানীয় এক হিন্দি সাপ্তাহিককে দেওয়া খোলামেলা সাক্ষাৎকারে বাঘেল বলেন, তাঁর সরকার বিশ্বাস করে বন্দুক দিয়ে নকশাল সমস্যার সমাধান হবে না। একমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান পাওয়া সম্ভব। তাঁর মতেও সমস্যার মূলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। তিনি বলেন, ''সমস্যার নিরসনের জন্য আমরা এর সঙ্গে জড়িত সব পক্ষের সঙ্গেই আলোচনায় বসব। আমরা বস্তার থেকে শুরু করে সরগুজা সর্বত্র আদিবাসীদের জীবনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করব।''[৩৮]

প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্রের আবহে জনপ্রিয়তাবাদ ঃ

একই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে রমন সিংহ তার জনপ্রিয়তাবাদী কর্মকান্ড নিয়ে এমন একটা দেশের অঙ্গরাজ্যে প্রশাসনিক কর্তা হয়ে বসেছিলেন যে দেশের রাজনীতি সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে আবর্তিত হয়ে থাকে। সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনে জেতার বাধ্যবাধকতা থাকায় ভোটদাতাদের মন জেতার প্রতিযোগিতা অনিবার্য। ক্ষমতায় আধিপত্য বজায় রাখতে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন নিজের পক্ষে আনতে পারা জরুরি। পর পর তিন বার বিধানসভা নির্বাচনে জেতার পরে রমন সিংহের দল ২০১৮ সালে কংগ্রেসের কাছে শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হয়। তার আগে নির্বাচনী প্রচারে নেমে কংগ্রেস রমন সিংহের জনপ্রিয়তাবাদী কাজকর্মের প্রভাবকে দুর্বল করতে পাল্টা জনমোহিনী প্রতিশ্রুতি দিতে শুরু করে। দেশের অন্য রাজ্যের মতোই ছত্তীশগঢ়েও কৃষিসঙ্কট বিরাট ছায়া ফেলেছিল। কংগ্রেস সেখানে ক্ষমতায় এলে যাবতীয় কৃষি ঋণ মকুবের প্রতিশ্রুতি দিল। রমন সিংহ তখন রাজ্যের ৫৫ লক্ষ মহিলাকে বিনামূল্যে মোবাইল দেওয়ার কথা বলছিলেন। ভোটের ফলে দেখা গেল, ঋণ মকুবের হাতছানি অনায়াসে মোবাইল ফোনকে হারিয়ে দিল। তবে ভোটের প্রচারে নকশাল সমস্যা কখনই তেমন ভাবে আলোচিত হয়নি, কারণটাও স্পষ্ট। কি কংগ্রেস কি বি জে পি, উভয়েই সচেতন যে তারা কেউই নকশাল সমস্যার মোকাবিলায় সাফল্য পায়নি। ১৫ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকার পরে সরকারে এসে বাঘেলের কংগ্রেস সরকার প্রথমেই রাজ্যের ১৬.৬৫ লক্ষ চাষির স্বল্পমেয়াদী ঋণ মকুব করে। পরের ছয় মাসের মধ্যেই সরকারের কাজেকর্মে স্পষ্ট হয়ে যায় যে রমন সিংহের জনপ্রিয়তাবাদী পথ থেকে সরে আসার কোনও ইচ্ছা ভূপেশ বাঘেলের নেই। বরং প্রতিযোগিতায় নেমে তারা আরও বেশি বেশি করে জনপ্রিয়তাবাদী পথে হাঁটতে আগ্রহী। যেমন, কংগ্রেস সরকার ঘোষণা করল যে উন্নয়নের কাজে জমি অধিগ্রহণ করতে হলে সরকার সে জন্য চাষিকে জমির চার গুণ ক্ষতিপূরণ দেবে। এর আগে রমন সিংহের আমলে জমির দ্বিগুণ দাম দেওয়া হত। রমন সিংহ ক্ষমতায় থাকার শেষ বছর ২০১৮ সালে ছত্তীশগঢ় ধানের জন্য সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ছিল কুইন্টাল প্রতি ১৭৫০ টাকা, তার সঙ্গে ৩০০ টাকা বোনাস মিলিয়ে মোট ২০৫০ টাকা। বাঘেল সরকার তা বাড়িয়ে করল কুইন্টাল প্রতি ২৫০০ টাকা। তা ছাড়া ২০১৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি বাঘেল সরকার আর একটি 'সিঙ্গুর কান্ড' ঘটাল। অর্থাৎ, যে ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসে বাম আমলে সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো কারখানার চাষিদের কাছ থেকে অধিগৃহীত জমি চাষিদেরই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, বাঘেল সরকারও সে ভাবেই টাটার ইস্পাত প্রকল্পের জন্য রমন সিংহের আমলে অধিগৃহীত জমি চাষিদের ফেরৎ দিল। ২০০৫ সালে চিত্রকূট বিধানসভা এলাকার ২৫০০ একর চাষের জমি টাটাদের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত চাষি পরিবারদের এক -তৃতীয়াংশই তাতে অখুশি ছিল। বাঘেল সরকার একতরফাভাবে টাটাদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে চাষিদের জমি ফেরায়।[৩৯] সম্প্রতি এক সরকারি বিজ্ঞাপনে[৪০]

বাঘেল সরকারের দাবি এ পর্যন্ত তারা রাজ্যের মোট ১৮ লক্ষ পাঁচ হাজার কৃষকের ৮৮১৮ কোটি টাকা ঋণ মকুব করেছে। সেচ কর মকুব করেছে ২০৭ কোটি টাকার। জঙ্গল থেকে তেন্ডু পাতা (বিড়ি তৈরির অন্যতম উপাদান) সংগ্রহ করা আদিবাসীদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ রোজগারের অঙ্গ। রমন সিংহ ক্ষমতায় থাকাকালীন তেন্ডু পাতা সংগ্রহে জঙ্গলে যারা যায়, সেই সব আদিবাসীদের জুতো বিতরণ করত, এবার বাঘেল সরকার তাদের সরাসরি আর্থিক উৎসাহ দিল, প্রতি বস্তার ভর্তি পাতা সংগ্রহের মজুরি ৪০০০ টাকা। রেশনেও খাদ্যশস্যের পরিমাণ আরও বাড়ল, এবার বি পি এল পরিবারে ষষ্ঠ সদস্য থাকলে অতিরিক্ত সাত কেজি চাল দেওয়া শুরু হল। এ পি এল পরিবারের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাল মিলবে ১০ টাকা কেজি দরে। কৃষি জমি কেনাবেচার পথ সুগম করতে পাঁচ ডেসিমেলের কম পরিমান জমির কেনেবেচার উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল। সরকার দাবি করল হাজার হাজার শূন্য পদে নিয়োগ শুরু হবে। সে জন্য আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় তিনটি 'কনিষ্ঠ কর্মচারী চয়ন বোর্ড' গঠন হল।

এই পথে হেঁটেই পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যাশ্রী রূপশ্রী, সবুজসাথী ইত্যাদি প্রকল্প করেন, সরকারি ব্যয়ে ইমামদের ভাতা দেন, দূর্গাপূজার সংগঠকদের টাকা দেন, ক্লাবে ক্লাবে টাকা দেন। দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল মহিলাদের বিনা টিকিটে মেট্রোয় চড়ার ব্যবস্থা করেন। এ ভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের আবহে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় হওয়ার যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষই যে উপকৃত হচ্ছে, তা অস্বীকার করা যায় না। এই ইতিবাচক দিকটি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। আরও লক্ষ্যণীয়, জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লড়াইয়ে প্রচলিত ধারার রাজনীতিতেও বদল আসতে শুরু করছে। কেন্দ্র বা রাজ্য, যে কোনও সরকারই এখন সমাজের উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করার চাইতে স্বল্প মেয়াদী জনমোহিনী প্রকল্পের রূপায়ণে বেশি আগ্রহী। সমষ্টির চাইতে সেখানে ব্যক্তি নাগরিককে কিছু 'পাইয়ে দেওয়া', এমনকি নগদ টাকা পর্যন্ত, তাতেই জোর পড়ছে বেশি।

তবে ছত্তীশগড়ে দৃশ্যতই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির ব্যাটনের হাত বদল হয়েছে, এখন তা রমন সিংহের হাত থেকে ভূপেশ বাঘেলের হাতে।

অনুবাদক ঃ মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

Notes

1. Partha Chatterjee, Populism Pius, 3 June, 2019 https://www.theindiaforum.in/article/populism-plus
2. An Evaluation of the Finance of Chhattisgarh, 13th Finance Commission
3. Chhattisgarh: Economic and Human Development Indicators, UNDP https://www.undp.org/content/dam/india/docs/chhattisgarh_factsheet.pdf
4. Jean Dreze, Chhattisgarh shows the way, The Hindu, 13 November, 2010; Also one may see Raghav Puri, Reforming Public Distribution System: Lessons from Chhattisgarh, EPW. 4 February, 2012
5. N C Saxena, in conversation with the author via email, 26 July, 2019
6. Power of Populism, Frontline, Vol. 26, Issue 08, April 11-24, 2009
7. The details of budget estimates as per gender budget document, provision of fund as per Appropriation Account and actual expenditure in respect of 23 schemes for category (1) above are given in Appendix 1.6 (14th Finance Commission Report)
8. Ibid.
9. C & AG Report on State Finance for FY 2011
10. C & AG Report on State Finance for FY- 2016
11. Raman Singh completes 13 year as CM in Naxal-hit Chhattisgarh, Business Line, 13 December, 2016
12. Chhattisgarh PDS scam: Congress demands CM Raman Singh's resignation, Economic Times, 4 July, 2015
13. Business Today, 24 April, 2018 https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/up-bihar-chhattisgarh-keeping-india-backward-niti-aayog-ceo-amitabh-kant/story/275483.html
14. Jean Dreze, In conversation with the author via email, 16 October, 2019

15. NFHS-3, Table 10.13, pp.-290

16. Ibid.

17. NFHS-4, Table 10.13, pp.294 & Table 10.21.1, pp.-334

18. NFHS-4, pp.20

19. POSHAN: District Nutritional Profile, Chhattisgarh, May, 2018

20. Jean Dreze and others, Casting the Net: India's Public Distribution System after the Food Security Act, EPW, February 9, 2019

21. Malnutrition is bigger than Maoists, Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel, India Today, 19 August, 2019

22. Jean Dreze & Reetika Khera, Regional Patterns of Human and Child Development in India, EPW, 20 November, 2012, Vol.XLVII No.39

23. NFHS-4, Table 10-13

24. Chhattisgarh nutrition boost, The Telegraph, 18 October, 2019

25. N C Saxena, in conversation with the author via email, 26 July, 2019

26. John B Judis, Rethinking Populism, Dissent Magazine, Fall 2018

27. Ranabir Samaddar, in his opening remarks at the CRG conference on Populism and Populist Politics in South Asia, 31 August, 2019

28. Chantal Mouffe, For a Left Populism, Verso, 2018

29. N C Saxena, in conversation with the author via email, 26 July, 2019

30. ibid

31. N Sundar, Bastar, Maoism and Salwa Judum, EPW, 22 July, 2006

32. Development Challenges in Extremist Affected Areas: Report of an Expert Group to Planning Commission, 2008

33. Naxalism can be resolved through dialogue: Raman Singh, The Hindu, 7 August, 2012

34. Chhattisgarh's 4 more districts get IAP status, Pioneer, 4 August, 2013

35. Government of India, Ministry of Home Affairs, PIB, 4 March, 2015
36. https://indianexpress.com/article/india/india-others/army-can-solve-naxal-issue-in-four-hours-but-my-heart-wont-allow-it-says-raman-singh/
37. ibid
38. Chhattisgarh Jan-Mon (Hindi), 28 February-06 March, 2019
39. ibid
40. The advertisement by the Chhattisgarh government was carried in Outlook magazine and some other newspapers in October-November, 2019

গোর্খা পরিচয় রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থী হস্তক্ষেপ

কপিল তামাং

ভূমিকা ঃ

জাতীয়তাবাদ বা পরিচয় রাজনীতির দক্ষিণপন্থী রাজনীতির দিকে এগিয়ে চলার একটি সম্ভাবনা থাকে যেহেতু সেখানে একটি 'আমরা-ওরা' বিষয়ের প্রশ্নচিহ্ন থেকে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা শাসিত ও অত্যাচারিত সংখ্যালঘুদের একঘরে করে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া তাই দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকে উঠে দাঁড়ানোর বিরাট সুযোগ করে দেয় । চিরকালীন অত্যাচার ও ভেদাভেদ থেকে মুক্তি পাওয়ার যে কাল্পনিক বাস্তবতার স্বপ্ন এবং সমকালীন সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যে ন্যায্য অধিকার তা চিরকালই গোখ র্া পরিচয় রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ দাবী হয়ে থেকেছে। এই আন্দোলন শুরু হয় প্রায় একশো বছর পূর্বে এবং নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর ১৯৮০-র দশকের পরবর্তী সময় থেকে এই গোর্খা পরিচয় রাজনীতিতে এক দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন চোখে পড়ে যা জাতিকেন্দ্রিক ও দক্ষিণপন্থী প্রবৃত্তির সূচনা করে। দক্ষিণপন্থী রাজনীতির উত্থানের সুবাদে জাতীয় রাজনীতির যে সাম্প্রতিক পরিবর্তন তা গোর্খা পরিচয় রাজনীতিকে ব্যাপক পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। গোর্খা পরিচয় রাজনীতির ঐতিহাসিক ঘটনাবলি এবং কী ভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় ও কী কী কারণে দক্ষিণপন্থী রাজনীতি তার উপর হস্তক্ষেপ করে সেটি এই প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের মতন বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত জনসমষ্টির দেশে জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন বার বার উপস্থাপিত হয়। ইতিহাস জুড়ে ভারতবর্ষ জাতীয়তাবাদের নানান ধরনের লড়াইয়ের সাক্ষী থেকেছে , পূর্বে আসাম এবং নাগাল্যান্ড থেকে শুরু করে উত্তরের আজাদ (স্বাধীন) কাশ্মীর, পশ্চিমের খালিস্তান আন্দোলন, দক্ষিণের তামিল ইলম এবং তেলেঙ্গানা আন্দোলন ইত্যাদি, যা ভারতীয় শাসনব্যবস্থা দ্বারা অবদমিত, ক্ষতিগ্রস্ত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। শুধু ভারতবর্ষ নয়, সারা বিশ্বেই এই জাতীয়তাবাদী ভাবনা প্রাসঙ্গিক, যা আরও তাত্ত্বিক ভাবনাচিন্তা এবং বৃহত্তর সমাজগত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে ভাবা উচিত।

ধনতন্ত্রের উত্থানের ফলে এবং আধুনিক জাতিরাষ্ট্র গঠনের পর থেকে জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গ উঠে আসে। আধুনিক সমাজের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বৈধতা হল জাতীয়তাবাদ। একটি দেশকে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠা করা দরকার যাতে সে সকল প্রকার দেশবাসীকে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। ইতিহাসে দেখা গেছে যে এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সমস্ত রাজ্য ও সাম্রাজ্যকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে (ও' লিয়ারি, ১৯৯৭)। ''জাতীয়তাবাদ..... কেবলই একটি জাতিগত বা উপজাতিগত বিষয় নয়। এটির পাঁচটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে একটি স্থিতিশীল চলমান সম্প্রদায়, একটি সর্বজনীন ভাষা, একটি স্বতন্ত্র রাজ্যক্ষেত্র, অর্থনৈতিক সংযোগ এবং একটি সমষ্টিগত চরিত্র। নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক শর্তের ভিত্তিতে জাতি হিসাবে এটি একটি যথার্থ রাজনৈতিক রূপধারণ করে এবং এই রূপ একটি বিশেষ যুগ, পুঁজিবাদের উত্থান ও সামন্তপ্রথার অধীনে উত্থানকারী বুর্জোয়াদের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকে" (স্তালিন, ১৯৩০)। পূর্বে সামাজিক ভূমিকাগুলি মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হত। সামাজিক স্তরে সাংস্কৃতিক ভাষাসম্বন্ধীয় আদান-প্রদানে অগ্রাধিকার ছিল না কিন্তু এখন আধুনিকতার ফলে সামাজিক ভূমিকাগুলি আরও বেশি মুক্ত ও পরিবর্তনশীল হয়ে উঠেছে এবং উন্নত মেলবন্ধনের জন্য একটি সাধারণ ভাষা ও একটি সাধারণ সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয়তাবাদ হল সংস্কৃতির ভিত্তিতে মানুষের বিভাজন (ও'লিয়ারি, ১৯৯৭)। সাংস্কৃতিক পরিচিতি ইতিহাসের মূলে অবস্থিত। অতীতের বিবরণের মধ্যে আমরা যেভাবে নিজেদের উপস্থাপনা করি সেই অনুযায়ী বিভিন্ন পরিচিতিকে আমরা নাম দিয়ে থাকি। যার ফলে উপস্থাপনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে স্বশাসনকে কেন্দ্র করে সর্বদাই একটি পরিচিতিকেন্দ্রিক রাজনীতি এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি জড়িয়ে থাকে। একটি আধিপত্যবাদী সংস্কৃতি বা জাতীয়তাবাদ বা সমজাতি, যা ভিন্নতাকে অস্বীকার করে মানুষকে সমতা থেকে বঞ্চিত করে রাখে তা প্রতিহত করাই হল স্বশাসনের অর্থ। অর্থাৎ পরিচিতিকেন্দ্রিক রাজনীতি হল একটি ভিন্নতামূলক রাজনীতি এবং স্বশাসন-মূলক রাজনীতির সমন্বয় (হল, ১৯৯৭)।

দক্ষিণপন্থী রাজনীতির সূচনা হয় 'আলাদা করে দেওয়ার' প্রবণতা থেকে। সাম্প্রতিক সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে 'আমরা-ওরা' মানসিকতা। অতএব, এটির সমাধানই হল অন্য সব সমস্যার সমাধানের সূত্রপাত। ইতিহাসে প্রমাণিত সঙ্কটের সময় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতার পার্থ্যকের ফলে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি দক্ষিণপন্থী রাজনীতির পথ অনুসরণ করে। বিংশ শতাব্দীতে ইতালিতে ফ্যাসিবাদ এবং জার্মানিতে নাৎসিবাদের উত্থানই তার যথেষ্ট প্রমাণ। ইউরোপ এবং ভারতবর্ষে প্রায় একই সময়ে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক মতবাদের জন্ম হয়। এটি ইউরোপিয়ান ফ্যাসিবাদ দ্বারা প্রভাবিত। ১৯২৫ সালে কে বি হেডগেওয়ার নাগপুরে 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক' (RSS) নামক একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। সাংস্কৃতিক সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও এটি ভারতীয় রাজনীতিকে ব্যাপক পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। তাদের মূল উদ্দেশ্য হল একটি

হিন্দু রাষ্ট্র তৈরি করে উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রতিষ্ঠা করা, যার তত্ত্বাবধানে প্রতিটি দেশবাসী হিন্দু মতবাদকে অনুসরণ করে জীবনযাপন করবে। দেশ চরম সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ার ফলে আর এস এস জাতীয় সংগঠন আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদের ধ্বংস ভারতীয় ইতিহাসের এক অন্যতম পাশবিক ও বর্বরোচিত সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার দৃষ্টান্ত। ইতিহাসে ধারাবাহিকভাবে আর এস এস জাতীয় সংস্থাকে তৎকালীন শাসক সরকার বহুবার বেআইনী ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যার ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের কার্যক্রমকে বহুবার পরিবর্তন করেছে। তারা গোপনে অতি দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে এসেছে যা ২০১৪ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP) পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে নির্বাচনে জয়লাভের পরে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের পিছনে আর এস এস সহ আরও অনেক হিন্দু দক্ষিণপন্থী মনোভাবাপন্ন শক্তির হাত ছিল। নির্বাচনের পরে তারা হিন্দুত্ব মতবাদ সম্পর্কে মুক্ত প্রচার শুরু করে। সারা দেশ জুড়ে, বিশেষত উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদের আঞ্চলিক রাজনীতি কিভাবে আর এস এস জাতীয় শক্তির দ্বারা প্রভাবিত ও হস্তগত হয় একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

পৃথক রাজ্যাধিকারের জন্য গোর্খা জাতীয়তাবাদের আন্দোলন প্রায় ১০০ বছরেরও বেশি পুরনো। গোর্খা সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে গোর্খা পরিচিতিকেন্দ্রিক স্বীকৃত একটি স্বশাসিত প্রশাসন ও রাজ্যই তাদের পরিচয় সংকটকে দূর করতে সক্ষম হবে। প্রধানত সমাজের উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষই এই পৃথক রাজ্যাধিকারের দাবিকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। একদিকে তাদের কাছে পরিচিতির প্রশ্ন সর্বাগ্রে প্রাধান্য পায়, অন্যদিকে শ্রমজীবি মানুষের কাছে পৃথক রাজ্য এবং তার ফলে উন্নতি, উন্নয়নের সুযোগ এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন প্রাধান্য পায়। যার ফলে গোর্খা সম্প্রদায়ের সমস্ত সমস্যার সমাধান হল 'গোর্খাল্যান্ড' নামক তাদের এক পৃথক রাজ্যের কাল্পনিক বাস্তবতার স্বপ্ন। চুক্তির দাবি পেশ থেকে শুরু করে তীব্র বিরোধিতা সহ জাতীয় দলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধার মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের যাত্রা চলে এসেছে। এই যাত্রার মধ্য দিয়ে আন্দোলনটি আরও বেশি জাতিকেন্দ্রিক ও দক্ষিণপন্থী মনোভাব গ্রহণ করে এবং অবশেষে জাতীয় দক্ষিণপন্থী দল ও আর এস এস জাতীয় দক্ষিণপন্থী মনোভাবাপন্ন শক্তির উদ্দেশ্যকে স্বার্থক করে তোলে।

গোর্খা পরিচিতি আন্দোলনের ইতিহাস ঃ

পূর্বে উল্লেখিত গোর্খা পরিচিতি আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘ সময় ধরে চলে এসেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা কালেই এবং স্বাধীনতার পর এক আধুনিক দেশ গঠনের সময় থেকেই একটি বিশেষ রাজ্য বা দেশের অধিকারভুক্ত হওয়ার প্রশ্ন মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। গোর্খা পরিচিতি আন্দোলনকে উপলব্ধি করতে হলে সেই অঞ্চলের ইতিহাস, আন্দোলনটির ইতিহাস এবং সেই আন্দোলনের যাত্রাকালে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে তা বোঝা দরকার।

দার্জিলিং-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ

পূর্বে দার্জিলিং সিকিম রাজ্যের অংশ ছিল। ১৭৯০ সালে নেপালের পৃথ্বীনারায়ণ শাহ সিকিম আক্রমণ করেন এবং তিস্তা থেকে নেপাল সাম্রাজ্যের সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল অধিকার করেন। পরবর্তীকালে ১৮১৪-র অ্যাংলো-নেপাল যুদ্ধের সময় সিকিমের সাহায্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাহ রাজবংশকে পরাজিত করে। ১৮১৫ সালের 'সুগলি' সন্ধি-চুক্তির সময় মেচি থেকে তিস্তা পর্যন্ত অঞ্চল ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চলে যায়। ১৮১৭ সালে আরও একটি চুক্তির ভিত্তিতে যে শর্তে এই অঞ্চলটি সিকিমের তত্ত্বাবধানে চলে আসে তা হল - যে কোনো বিতর্কের সময় ব্রিটিশ সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে এবং তিব্বত, ভুটান ও নেপালের মধ্যে উন্নত বাণিজ্যের জন্য এই অঞ্চলটিকে একটি নিরপেক্ষ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। প্রায় দশ বছর পর সিকিম এবং নেপালের মধ্যে একটি বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার ফলে ব্রিটিশ সরকার এই বিবাদ সমাধানের উদ্দেশ্যে ক্যাপ্টেন জি.এ লয়েড ও জে.ডব্লিউ গ্রান্টকে নিযুক্ত করে। সেখানকার জলবায়ুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ১৮২৯ সালে এই এলাকায় তাঁরা একটি স্বাস্থ্যনিবাস তৈরি করার প্রস্তাব দেন। ১৮৪৯ সালে এই পুরো অঞ্চলটি ব্রিটিশ সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং ১৮৬৫-র অ্যাংলো-ভুটান যুদ্ধের সময় কালিম্পং সহ ডুয়ার্স অঞ্চলও ব্রিটিশদের অধীনে চলে আসে। ১৮৬০-এর প্রথম দিক থেকেই দার্জিলিং শহরটি গড়ে ওঠা শুরু হয় এবং পরবর্তী কালে সেটি একটি জেলায় পরিণত হয় যেখানে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির আইন লজ্জা ছিল না। ধীরে ধীরে মানুষের বসবাস শুরু হতে থাকে এবং তার সাথে চা-বাগান ও পরে সৈন্যশিবির তৈরি হয়। ফলে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাবশত বহির্রাজ্যের মানুষও এখানে আসতে শুরু করে। ১৮৭৪ সালে দার্জিলিং তার পূর্ব নির্ধারিত জেলা স্থানে পরিণত হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় যদিও দার্জিলিংকে বিহারের ভাগলপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল, ১৯১৯ সালে তাকে আবার বাংলার অংশ হিসাবে যুক্ত করা হয়।

শতবর্ষ পুরনো আন্দোলন ঃ

আন্দোলনের প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব ঃ

পুলিশ, সৈন্য, ধনী ব্যবসায়ী এবং সম্পন্ন ভুটিয়াদের মতো উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষের দলই বাংলায় সর্বপ্রথম একটি পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থার দাবি তোলে। 'হিলমেন'স অ্যাসোসিয়েশন' নামে পরিচিত এই দল ১৯০৭ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাদের স্মারকলিপি পেশ করে। ১৯১৯ সালে যখন দার্জিলিং বঙ্গ প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন তারা দার্জিলিং এবং ডুয়ার্সকে বাংলা থেকে বহিষ্কার করার দাবি রাখে। 'ব্যাকওয়ার্ড ট্র্যাক' নামটি খারিজ করার জন্য তারা এডউইন মন্টেগুর কাছে আবেদন করে এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে দার্জিলিং ও ডুয়ার্স সংযুক্ত একটি বহির্ভূত অঞ্চল তৈরি করার দরখাস্ত করে। 'দার্জিলিং প্লান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন' এবং 'ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর সহযোগিতাও তাদের সঙ্গে ছিল। ১৯৪১ সালে তাদের ভাঙ্গনের আগে পর্যন্ত হিলমেন'স অ্যাসোসিয়েশন নিজেদের

পৃথক মাতৃভূমির জন্য দাবিসনদ পেশ করতে থাকে। বাংলা থেকে আলাদা হওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তৎকালীন সময়ের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন তার অংশ হওয়ার আগ্রহ তারা কখনোই দেখায়নি। আরও এক দল মানুষ, প্রধাণত দার্জিলিংয়ের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে এই দাবির অন্য এক রূপ তুলে ধরে। এরা হল সেই জনসংখ্যা যারা কলকাতায় পড়াশোনা বা চাকরির উদ্দেশ্যে এসেছিল। ১৯০৬ সালে গোর্খা জনসমষ্টির দেশাত্মবোধক ভাবনা প্রসূত 'গোর্খা সাথী' নামক পত্রিকা তারা প্রকাশ করা শুরু করে। ডঃ পরশমণি প্রধান, শ্রী ধরণীধর সারমান, প্রভৃতি আরও অনেকে নেপালি ভাষা ও সাহিত্যকে উৎকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে 'নেপালি সাহিত্য সম্মেলন' প্রতিষ্ঠা করেন। তারা মনে করতেন বাংলা থেকে আলাদা হলে গোর্খা সম্প্রদায় আরও পিছিয়ে পড়বে, তাই তারা এর সমর্থক ছিলেন না। ১৯২০ সালে বাংলার মধ্যেই স্বশাসনের জন্য তারা দাবি রাখেন। দলবাহাদুর গিরির মতো দার্জিলিং-এর অভিজ্ঞ নেতাও এর অংশীদার হয়েছিলেন এবং চা-বাগানের কর্মীদের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তার করেছিলেন। পরবর্তী কালে ১৯২৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পর গান্ধীজি শোক প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৪১ সালে 'অল ইন্ডিয়া গোর্খা লিগ' (গোর্খা লিগ) প্রতিষ্ঠা হয়, যাদের উদ্দেশ্য ছিল-সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে গোর্খাদের স্বীকৃতি আদায়, প্রাদেশিক বিধানসভায় তাদের প্রতিনিধিত্ব এবং ব্রিটিশ সরকারের অধীনে বন্দী সমস্ত গোর্খাদের মুক্ত করা। এই একই বছরে 'গোর্খাস্থান' ভাবনার সূচনাও করে গোর্খা লিগ।

আন্দোলনের স্বাধীনতা পরবর্তী পর্ব ঃ

১৯৪৩-এর মন্বন্তরের সময় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে উদ্ভূত একটি বিপুল সমাজিক অর্থনৈতিক সংকটের ফলে বাংলা এবং দার্জিলিংকে একটি কঠিন সময়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সম্প্রতি গঠিত গোর্খা লিগ বা অভিজ্ঞ জাতীয় কংগ্রেস কেউই এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ড্রাইভারদের সংগঠনের নেতা রতনলাল ব্রাহ্মণ ওরফে 'মাইলা বাজে' গুদাম থেকে লুঠ করা শস্যদানা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করছিলেন এবং ওঁর সাহায্যেই কমিউনিস্ট পার্টি এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে। শিলিগুড়ি থেকে কমিউনিস্ট পার্টির এক সদস্যের সান্নিধ্যে আসার পর তিনি কমিউনিস্ট মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। সুশীল চ্যাটার্জি, রতনলাল ব্রাহ্মণ, গণেশলাল সুব্বা, ভদ্রবাহাদুর হামাল এবং চারু মজুমদারদের নিয়ে একটি জেলা সমিতি তৈরি করা হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং নেপালিভাষীদের হয়ে ১৯৪৭ সালে রতনলাল ব্রাহ্মণ এবং গণেশলাল সুব্বা সংসদে 'গোর্খাস্থান'-এর দাবিসনদ পেশ করেন, তাঁদের দাবি ছিল নেপাল, দার্জিলিং জেলা এবং সিকিম মিলিয়ে গোর্খাদের জন্য এক স্বাধীন রাজ্যকে 'গোর্খাস্থান' নামে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। পরবর্তী কালে সেই দাবি খারিজ করা হয় এবং কমিউনিস্ট পার্টির দার্জিলিং জেলার সম্পাদক গণেশলাল সুব্বাকে তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। পার্টি এও উল্লেখ করে যে দাবিসনদটি কোনো জাতীয় বা জেলা কমিটি থেকে পাশ করানো হয়নি। তারপরে বিভিন্ন প্রতিনিধি সরকার বা সরকারি আধিকারিকদের নিকট

গোর্খাদের জন্য এক পৃথক রাজ্যাধিকারের দাবিসনদ বা আবেদন পেশ করে কিন্তু প্রত্যেকটিই উপেক্ষিত বা খারিজ হয়ে যায়।

১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি আইন অনুসারে বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। কমিউনিস্ট পার্টির বি বি হামাল নেপালি ভাষাকে পার্বত্য অঞ্চলের সরকারি ভাষা ঘোষণা করার দাবি তোলেন এবং গোর্খা লিগের এন বি গুরুলাল গুরুং তা সমর্থন করেন। ফলে নেপালি ভাষাকে পার্বত্য অঞ্চলের সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু সেই একই বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাঠক্রম থেকে নেপালি ভাষাকে সরিয়ে দেওয়া হয়, যার প্রতিক্রিয়ায় নেপালি ভাষাকে রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'অখিল ভারতীয় নেপালি ভাষা মান্যতা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর থেকেই ভাষা আন্দোলনের শুরু। প্রায় দশ বছরের সংগ্রামের পর ১৯৭৩ সালে ভাষা আইন (১৯৬১)-কে সংশোধিত করে বাংলার সাথে নেপালি ভাষাকেও সরকারি ভাষা হিসাবে গণ্য করা হয়।

১৯৮০ সালে সুবাস ঘিসিং, 'গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট' বা জি এন এল এফের প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর থেকেই আন্দোলনের মুখ ঘুরে যায়। ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য যে ভাষা আন্দোলন তখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল তা গোর্খা পরিচিতি আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে। ১৯৮৬-র পর আন্দোলনটি এক তীব্র রূপ ধারণ করে। ১৯৮৬-র জুলাই মাসে গোটা জেলা ''ইন্দো-নেপাল চুক্তিপত্র'' (১৯৫০) পোড়ানোর ঘটনায় অংশগ্রহণ করে, এর প্রত্যুত্তরে প্রশাসন তাদের উপর গুলি চালায়, যার ফলে ১৩ জন নিহত হয়। পৃথক রাজ্যাধিকারের জন্য এই বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন সুবাস ঘিসিং। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে এই বিক্ষোভ বজায় থাকে। ১৯৮৭ সালে ন্যাশনাল হাইওয়ে ৩১A অবরোধ করে প্রায় ৪০ দিনের ধর্মঘট হয়েছিল। আধাসামরিক বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয় এবং সরকারি নথি অনুযায়ী ১২০০ সাধারণ মানুষ ও ৪৪-জন পুলিশকর্মীর মৃত্যু ছাড়াও আরও অনেক মানুষ এই বিক্ষোভে প্রাণ হারায়। প্রায় দেড়শো কোটি টাকার সম্পত্তির ক্ষতিও হয়। শেষমেষ 'দার্জিলিং গোর্খা কাউন্সিল' নামক একটি স্বশাসিত প্রশাসনিক সংস্থার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এই আন্দোলনের সমাপ্তি হয়। ১৯৯২ সালে ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম ধারায় নেপালি ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০০৭ সাল পর্যন্ত আন্দোলনটি স্থগিত থাকে। ২০০৭ সালে সুবাস ঘিসিংয়ের প্রাক্তন সহযোগী বিমল গুরুং-এর নেতৃত্বে 'গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা' (GJM) নামে একটি নতুন দল গঠিত হয়। প্রথমদিকে জি এন এল এফ-এর ষষ্ঠ ধারায় দার্জিলিংকে অন্তর্ভুক্ত করার বিল প্রস্তাবের বিরোধিতায় এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। পরবর্তী কালে এটি একটি পৃথক রাজ্যাধিকারের আন্দোলনে বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে। এইবার এই আন্দোলনের তীব্রতা কম থাকলেও ২০১১ সালে পুলিশের হাতে তিনজনের মৃত্যু হয়। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে আরও এক বোঝাপড়ায় এই আন্দোলনের নিষ্পত্তি হয় এবং 'গোর্খাল্যান্ড

টেরিটোরিয়্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' (GTA) নামক আরেকটি প্রশাসনিক চুক্তি সংঘটিত হয়। ২০১৩ সালে তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের পর আন্দোলনটি আবার শুরু হলেও রাজ্যসরকার তা দমিয়ে দেয়। ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক হিসাবে ঘোষণা করেন তখন আন্দোলনটি আবার জেগে ওঠে। প্রায় ২০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয় এবং ১০৫ দিনের অবরোধ চলে যার ফলে ইন্টারনেট ও সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন থাকে। আরও একটি চুক্তি ও নেতৃত্ব বদলের সাথে আন্দোলনটির সমাপ্তি হয়। জি টি এ প্রধান বিনয় তামাং রাজ্যসরকারের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তাদের সমস্ত শর্ত মেনে নেন এবং সরকারের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা তুলে দেন। কিন্তু ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন ও দার্জিলিং বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের পর থেকে রাজনৈতিক চিত্রটি অনেকটাই বদলে যায়। বিনয় তামাং-এর নেতৃত্বে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা দুটি নির্বাচনেই পরাজিত হয় এবং দার্জিলিং গোর্খা রাজনীতিতে সরাসরি ভাবে বি জে পির আবির্ভাব হয়।

আন্দোলনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঃ

দাবিসনদ জমা দেওয়া থেকে শুরু করে তীব্র বিক্ষোভ ও নিজেদের দাবির জন্য জাতীয় পার্টির সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব-এর মাধ্যমে আন্দোলনটির রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে। এই যাত্রায় আন্দোলনটি আরও দক্ষিণপন্থী মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এবং জাতীয় দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলি এর সঙ্গে আরও বেশি করে যুক্ত হতে থাকে।

প্রত্যেকটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন দিক থাকে। স্বশাসনের দাবি অনেক সময় জাত বা শ্রেণীবিবাদ, ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক বা সাংস্কৃতিক ভেদাভেদ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। গোর্খা পরিচিতি আন্দোলনের প্রধানত দুটি দিক আছে। একদিকে নিজেদের রাজ্যের বাইরে যে বৈষম্যতার সম্মুখীন হতে হয় তারই ভিত্তিতে উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের পরিচিতির দাবী রাখে। যখন নিজের দেশের চেয়ে অন্য আর এক দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক মিল বেশি পাওয়া যায় তখন সেই দেশের অধিকারগত হওয়ার যুক্তি এক বহিরাগতকে বোঝানো আরও কঠিন হয়ে ওঠে। সুতরাং এক পৃথক রাজ্যের দাবি সেই অধিকারবোধের প্রশ্নকে আরও যথার্থ করে তোলে এবং বৈষম্যতার সমস্যারও সমাধান দেয়। অন্যদিকে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান, আরো বেশি কাজের সুযোগ এবং জীবনযাপনের মানকে উন্নত করার জন্য নিম্নবিত্ত শ্রমজীবি মানুষ নিজেদের পৃথক রাজ্যের দাবি রাখে। প্রধানত উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্বারাই এই আন্দোলনটি পরিচালিত হয়ে এসেছিল।

প্রথমে উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্বারা পরিচালিত হলেও পরবর্তীকালে সমস্ত শ্রমজীবি মানুষও আন্দোলনটিকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করে। 'ভাষা আন্দোলন' শুরু হওয়ার পর আন্দোলনটি আরও বেশি সাংস্কৃতিক ও জাতিকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। জি এন এল এফ নেতা সুবাস ঘিসিং আন্দোলনটিকে আরও জাতিভুক্ত করে দক্ষিণপন্থী রাজনীতির সূচনা করেন যা পরিচিতি আন্দোলনের মর্যাদার সঙ্গে খাপ খায়। এটি আরও তীব্র ও স্বতন্ত্ররূপ

ধারণ করে। পৃথক রাজ্যাধিকার অর্জনে জি এন এল এফ ব্যর্থ হওয়ার পরে এক শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সূচনা করেন বিমল গুরুং এবং তাঁর ভাবনা ছিল যে বি জে পির মতো এক জাতীয় পার্টির পক্ষপাতিত্বের সাহায্যেই এক পৃথক রাজ্য গঠন সম্ভবপর হয়ে উঠবে। ব্যর্থ হলেও এটি বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষত দার্জিলিং-এর আঞ্চলিক রাজনীতিতে যুক্ত হতে সাহায্যেই করে।

ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণপন্থী রাজনীতি ঃ

চরম দক্ষিণপন্থী আদর্শ আবেগের বশে জাতি বা ধর্মকে ব্যবহার করে মূল বিষয় থেকে মানুষের ক্রোধকে এক মিথ্যা শত্রুর দিকে কেন্দ্রীভূত করে এবং এই ছলে আলাদা করার চেষ্টা করে। যে কোনও সঙ্কটের জন্য তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে আরও পীড়িত করে তোলে। এটি পুঁজিবাদকেও সেই সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। যার ফলে তারা সাধারণত এইসব দক্ষিণপন্থী শক্তিদের আর্থিকভাবে সাহায্য করে জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলতে আরও উদ্যোগী হয়। সঙ্কটের সময় দক্ষিণপন্থী আদর্শ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষে প্রধাণত বি জে পি-র সংগঠনের মাধ্যমে দক্ষিণপন্থী মনোভাব এলেও নানা সাংস্কৃতিক সংস্থার মাধ্যমে এই আদর্শ বহুকাল ধরে বিরাজ করছিল। এটি আমরা আগেই জেনেছি যে সঙ্কটের সময় দক্ষিণপন্থী আদর্শ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৮০-র দশকের সঙ্কট এবং ইন্দিরা গান্ধীর আমলে 'জরুরী অবস্থা' জারি থাকার সময় যে অত্যাচার হয়েছিল তার ফলেই আর এস এস-এর সমর্থনে বি জে পি-র উত্থান সম্ভব হয়। পরে রথযাত্রা ও বাবরি মসজিদের ধ্বংস, এই দুই ঘটনা তাদেরকে আরও ক্ষমতা এনে দেয়। কিন্তু একমাত্র ২০১৪-র পরেই দেশের বৃহত্তম ও সবচেয়ে ধনী পার্টি হিসাবে বি জে পি সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। কংগ্রেসের ব্যর্থতা তাদের সাফল্যের একটি কারণ হলেও দেশ যে সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তার জোরেই তারা জনসাধারণের মধ্যে আরও জনপ্রিয় হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। তাদের উচ্চাকাঙ্খী প্রতিশ্রুতি ও 'আচ্ছে দিন' (ভালো সময়), এর আশায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থনের সাথে দেশ তাদের বরণ করেছে। তা সত্ত্বেও তাদের এই জয়লাভকে বোঝা অতো সহজ নয়। তাদের পুরো প্রচারটি বড় বড় কর্পোরেট সংস্থা ও এক চিত্তাকর্ষক নেতার সহায়তায় আরো জোরদার হয়ে উঠেছিল। বামপন্থী পার্টির ব্যর্থতাও বি জে পি-র সাফল্যের পিছনে এক বড় কারণ। শ্রেণী ও জাতির বিষয়কে যথাযথ ভাবে তুলে ধরা, সময়মত দুর্নীতির সনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণ এবং এই ধরনের আরও নানা বিষয়ে তারা ব্যর্থ হওয়ার ফলে বি জে পি-র জয়লাভ সম্ভব হয়। ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই দক্ষিণপন্থী মনোভাবাপন্ন সংস্থাগুলি আরও মুক্তভাবে সারা দেশ জুড়ে দক্ষিণপন্থী হিন্দু আদর্শের প্রচার শুরু করে। যার ফলে ধর্মীয় ঘৃণা ও হিংস্রতা দেশে অনেক বেড়ে গেছে। সাম্প্রতিককালে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অনেক কঠিন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে।

বি জে পি-র যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে নিজেদের আদর্শ ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে তার পরিষ্কার ইঙ্গিত হল এই অঞ্চলে তাদের বিরাট জয়লাভ। এই সব দিকের

আঞ্চলিক পরিচিতি আন্দোলনকে সমর্থন করায় তারা যথেষ্ট নমনীয় এবং তার ফলে তাদের প্রভাবিত করায় তারা যথেষ্ট সফলও , এটির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল অসম ও ত্রিপুরা। বহু বছর ধরে অসমে কংগ্রেসের শাসন বজায় থাকলেও নির্বাচনের সময় 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল' ও 'জাতীয় নাগরিক পঞ্জী'-র মতো স্পর্শকাতর বিষয় তুলে ধরে বি জে পি জয়লাভ করতে সক্ষম হয়। ত্রিপুরায় সি পি এম এর রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও সেখানকার উপজাতি ও বাঙালী জনসংখ্যার মধ্যে যে বৈষম্য তা দূর করতে তারা ব্যর্থ হয়। এটিরই সুযোগ নিয়ে বি জে পি সেখানের নির্বাচনেও জয়লাভ করে। একইভাবে দেশের আরও নানা জায়গায় বি জে পি জয়লাভ করে এবং এর পিছনে প্রধান ভূমিকা পালনে ছিল আর এস এস জাতীয় সাংস্কৃতিক শক্তির সদস্যরা যারা বহুকাল ধরে এইসব অঞ্চলে নিযুক্ত ছিল।

দার্জিলিংয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণপন্থী রাজনীতি ঃ

দেশের অন্যান্য আঞ্চলিক রাজনীতির মতোই দার্জিলিং-এর আঞ্চলিক রাজনীতিও উগ্র জাতীয়তাবাদী চরিত্রে ভরা ছিল। নেতাদের অযোগ্যতা ও দুর্নীতি আন্দোলনটিকে প্রায় জীবাশ্মে পরিণত হওয়ার মুখে ঠেলে দিয়েছিল। রাজনৈতিক নীতি পরিবর্তনের ফলে অন্ধ সমর্থন ও ছোটখাটো স্বার্থের জন্য আপোষই দার্জিলিং-এর রাজনীতির প্রকৃতি হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭-এর আন্দোলনের পরে দার্জিলিং-এর রাজনৈতিক চিত্রে যে পরিবর্তন আসে সেই সময় থেকেই বি জে পি হস্তক্ষেপ করা শুরু করে। এটির কৌশলগত দিক ছিল যে আগের আন্দোলনের তুলনায় এটি আরো শান্তিপূর্ণ। নেতৃত্বের দিক থেকে অনেক শিক্ষিত মানুষ নিযুক্ত ছিলেন এবং তারা কেন্দ্রে জাতীয় পার্টিকে সমর্থন করার পরিকল্পনার দ্বারা পৃথক রাজ্যাধিকারের স্বপ্নপূরণ করতে চেয়েছিলেন। তাই নিজেদের 'দাসত্ব' মোচনের সম্ভাবনার আশায় তারা বি জে পি-কে সমর্থন করেন। ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত এবং এখন ২০১৯-এর নির্বাচনে দার্জিলিং-এর মানুষ বি জে পি-কে প্রার্থীকেই সংসদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করে এই আশায় যে তারা গোর্খাদের স্বপ্নপূরণ করবে যা প্রধানমন্ত্রী মোদী নির্বাচন প্রচারের সময় তাঁর এক ভাষণে উল্লেখও করেছিলেন। এই স্বপ্ন এখনো পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি।

স্বপ্নপূরণ না হলেও এতগুলো বছরে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। পূর্বে বি জে পি দার্জিলিং-এর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করত না। সংসদে দার্জিলিং নির্বাচনক্ষেত্রে প্রতিনিধি থাকলেও সেখানকার আঞ্চলিক রাজনীতিতে তাদের বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না। কিন্তু এইবারে তারা দার্জিলিং-এর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা শুরু করে। দার্জিলিং-এর নির্বাচিত সাংসদ বি জে পি প্রার্থী হলেও উনি গোর্খা জাতির এবং মণিপুরের মানুষ। উনি আর এস এস-এরও সদস্য। রাজ্য নির্বাচনে বি জে পি-এর পার্টি সদস্য সামনে থাকলেও তার পিছনে আঞ্চলিক পার্টির সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। এইরকম ঘটনা দার্জিলিং-এর ইতিহাসে আগে কখনও ঘটেনি। আগে আঞ্চলিক রাজনৈতিক পার্টিই মূল ভূমিকা পালন করত, কিন্তু এখন সেই ধারা বদলে গেছে। এই রীতি যদিও সর্বপ্রথম মমতা ব্যানার্জীর তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি শুরু করে। যে হেতু জাতীয় পার্টিকে সমর্থন করাই দার্জিলিং রাজনীতির ধারা হয়ে

ওঠে সে হেতু পশ্চিমবঙ্গের শাসক পার্টিও দার্জিলিং রাজনীতিতে আগ্রহ দেখানো শুরু করে। ২০১৩-এর পরে আন্দোলনটি যখন স্তিমিত ছিল তখন ধীরে ধীরে তৃণমূল কংগ্রেস দার্জিলিং রাজনীতিতে ঢোকা শুরু করে। যে হেতু বি জে পি-এর লক্ষ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গকে দখল করা সে হেতু এটি স্পষ্টই ছিল যে তারা দার্জিলিং রাজনীতিতে নিযুক্ত হবে এবং এটি তাদের পক্ষে বেশ সহজও ছিল। তাদের অংশগ্রহণের সঙ্গে দক্ষিণপন্থী মনোভাব আরও বিস্তার করা শুরু করে।

আন্দোলনটির জাতিকেন্দ্রিক প্রকৃতি, দার্জিলিং রাজনীতিতে বিরাজমান 'আমরা-ওরা' প্রশ্ন এবং গোর্খা পরিচিতি আন্দোলনের ভিত্তিতে জনসাধারণের মধ্যে দক্ষিণপন্থী মনোভাব বিস্তার করতে সময় লাগে না। যদিও পরোক্ষভাবে সমাজ ও সাধারণ মানুষের কাছে এটি সেভাবে দৃশ্যমান নয়, তা সত্ত্বেও বহিরাগতদের জন্য এক ঘৃণার বস্তু ও উগ্র দেশপ্রেমের উদাহরণ হিসাবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে।

উপসংহার ঃ

এই দক্ষিণপন্থী শক্তি কী ভাবে কাজ করে তা জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই শক্তিগুলি যখন একটি রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় আসে তখন এক ফ্যাসিস্ত শাসন ব্যবস্থার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যখন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ও মৌলিক দক্ষিণপন্থী মনোভাব তাদের উভয়ের শত্রুকে দমন করার আশায় এবং যে কোনও মূল্যেই জাতিকে শুদ্ধ করে একচ্ছত্র করার প্রগাঢ় ইচ্ছার ভিত্তিতে একত্রিত হয়, তখনই ফ্যাসিবাদের উত্থান জোরালো হয়ে ওঠে। তা সে গণতন্ত্রের মুক্ত প্রতিষ্ঠানই হোক বা আইন-কানুনের বদলই হোক, ফ্যাসিজমের সক্রিয়তা যেন এক নির্দিষ্ট মনোভাবের চেয়ে সম্পর্কের অন্তর্জালের মধ্যেই বেশি ফুটে ওঠে (তকোভিল, ২০০০)। সুতরাং সেইসব অন্তর্জালকে বোঝা অত্যন্ত জরুরী যার সাহায্যে তারা জনসাধারণকে প্রভাবিত করে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অর্থনীতির ব্যর্থতা, ধর্ম, জাতি বা জাতিভুক্তির ভিত্তিতে সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব, এইসব শক্তির আবির্ভাবকে জোরালো করে তুলেছে। তাদের আদর্শের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতার সম্পর্কগুলোকে গণ্য করতে হবে। আর এস এস জাতীয় শক্তির কাছে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী ধারা হচ্ছে সবচেয়ে শুদ্ধ ও সঠিক। জনসাধারণের উপর উচ্চশ্রেণীভুক্ত হিন্দু জাতির নেতৃত্ব ও হিন্দু ধারায় জীবনযাপনই হল তাদের মূল লক্ষ্য। এভাবে ভেবে দেখলে সেরকম খারাপ না লাগলেও এটি অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। গণতন্ত্রের মূল ভাবনাই এক্ষেত্রে বিপর্যস্ত হয়। ইতিহাস থেকে এটি আমরা অত্যন্ত কঠিনভাবে শিখেছি। পুঁজিবাদের সঙ্গে এদের সম্পর্ককে বিবেচনা করাও প্রয়োজন। তাদেরকে সমর্থন করে জাতীয় বুর্জোয়া প্রথমে লাভবান হলেও একটি সময়ের পর তাদের নিজেদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ঘটবেই।

এইসব শক্তিগুলি চিরকালই আঞ্চলিক রাজনীতিতে আগ্রহ দেখিয়ে এসেছে। তার সুযোগ নেওয়া এদের পক্ষে অত্যন্তই সহজ। এইরূপ দক্ষিণপন্থী শক্তির অধীনেই গোর্খা পরিচিতি রাজনীতি প্রভাবিত হয়েছে যা এখন আরও স্বচ্ছ ও দৃশ্যমান। একজন বহিরাগত এসে

আমাদের চাকরি, সুযোগ সুবিধা, জমির অধিকার ও পরিচিতি ছিনিয়ে নেবে , এই ধারণা দার্জিলিং-এর মানুষের চেতনাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এখন এটি আরো কঠিন অন্ধকারের দিকে এগোচ্ছে। যে সব সম্পর্ক ও প্রবেশদ্বারের মধ্য দিয়ে এইসব শক্তি কাজ করে তার বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরী। এবং এই কাজটির দায়িত্ব শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই কাঁধে তুলে নিতে হবে যাতে তারা এই ধরণের ভাবনাগুলির শোধন করে বাস্তবকে তুলে ধরতে পারে। চরম সংকটের সময় এইসব শক্তিগুলি অগ্রসর হলেও মানুষ, বিশেষত যারা সমাজিক -রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে থাকে, তাদের পছন্দ ও নির্বাচনের উপরেও এইসব শক্তির বিস্তার নির্ভর করে। শুধু ইতিহাস থেকে শিক্ষা অর্জন করে এইসব শক্তিকে বোঝা বা তার প্রত্যুত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া বদলেছে এবং তার ফলে তাদের অভিমুখেরও পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু অতীতে তারা কী ভাবে সাফল্যলাভ করেছে তা বুঝলে বর্তমানে তাদের মোকাবিলা করা আমাদের পক্ষে আরও সহজ হয়ে উঠবে।

অনুবাদক ঃ বহ্নি সরকার

Reference

1. Chakrabarty, Samik. The demand for Gorkhaland and the Nationality Question English translation from Chintan Patrika. 2013.
2. Dhar, Aatreyee. "Demystified: What is The Right-wing Ideology in India?" Daily hunt, Jan 9, 2019. Accessed on Aug 10, 2019.
3. https://m.dailyhunt.in/news/nepal/english/ed+times-epaper-edtimes/demystified+what+is+the+right+wing+ideology+in+india-newsid-105864848
4. "History: Pre Independence, Post Independence and Darjeeling Today". Retrieved from
5. http://darjeeling.gov.in/darj-hist.html. Accessed on Aug 9, 2019.
6. Majumder, Mahendra. "Gorkhaland movement and the Nationality Question: Looking back through centuries" Published by on behalf of Krantikari Naujawan Sabha, West Bengal State Committee. Oct 2013. pp. 6-7
7. O' Leary, Brendan. On Nature of Nationalism: An Appraisal of Ernest Gellner's writings on Nationalism. British Journal of Political Science Cambridge University Press. 1997 27 (2), pp.191-222.
8. Pandey, Amitabh. "Understanding Right-wing Resurgence in the US and India" The Wire, May 5, 2019. Accessed on Aug 10, 2019.
9. https://thewire.in/politics/understanding-right-wing-resurgence-in-the-us-and-india
10. Paxton, Robert. 2004. The Anatomy of Fascism. New York: Alfred A. Knop (pp. 206-218)
11. Sarkar, Swatahsiddha. The land question and ethnicity in Darjeeling hills.
12. Journal of Rural Social Sciences. 2010. 25(2), pp. 81-121.
13. Stalin, J.V. Marxism and the National Question. Moscow: Prosvesh-cheniye 1913. Accessed on Aug 8, 2019

14. https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1913/03.htm

15. Tocqueville, Alexis. Democracy in America, trans., ed., and with an introduction by Harvey C. Mansfield and Delba Winthrop. Chicago: University of Chicago Press. 2000. p. 662

মা, মাটি, মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির অভ্যন্তরে

শিবাজীপ্রতিম বসু

বিষয় পরিচিতি

জনপ্রিয়তাবাদের (populism) ধারণাটিকে ঘিরে বহু বিভ্রান্তি রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি এখানে আমরা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করতে পারি।

জেন সোরেনসেন (Jen Sorensen) একজন জনপ্রিয় ও পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিন কার্টুনিস্ট ও অলংকরণ-শিল্পী, প্রায়শই তিনি উদারনীতিবাদী (liberal) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন সাম্প্রতিক ঘটনার দিকে নজর দিয়ে থাকেন। জনপ্রিয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর একটি সাম্প্রতিক কার্টুন[১] এরকম ''আমি নিজেকে পপুলিস্ট বলেই মনে করি'', রেস্তঁরায় বসে একটি ছেলে তার উলটো দিকে বসে থাকা মেয়েটিকে বলছে, ''তার মানে কি 'এ ও সি' না নিও-নাৎসি?'', মেয়েটি বুঝে নিতে চাইছে। কাজেই সোরেনসেনের কাছে জনপ্রিয়তাবাদ দু'টি ধরনের প্রতিনিধিত্ব করে। একটির প্রতিভূ মার্কিন কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক-সমাজতন্ত্রী (democratic-socialist) সদস্য আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কোর্টেজ (Alexandria Ocasio-Corte, 'এওসি' নামে জনপ্রিয়), তিনি সামাজিক সংবাদমাধ্যম বা সোশাল মিডিয়ায় রীতিমত প্রভাবসম্পন্ন সক্রিয় কর্মীও বটে এবং তাঁর ট্রাম্প-বিরোধী প্রগতিবাদী (radical) গণতান্ত্রিক মতামতের জন্য পরিচিত। অন্যদিকে জনপ্রিয়তাবাদীদের আরেকটি ধরন নয়া-নাৎসিদের (neo-Nazis) সমতুল্য। হয়তো সোরেনসেনের মাথায় ট্রাম্পের কথাও থেকে থাকবে, কারণ তাঁর আরেকটি কার্টুনে তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনপ্রিয়তাবাদকে তুলনা করেছেন ডেমোক্র্যাট দলের ''প্রগতিশীল'' সেনেট সদস্য এলিজাবেথ ওয়ারেনের (Elizabeth Warren) জনপ্রিয়তাবাদের সঙ্গে, কিংবা অতীতে নির্দল কিন্তু বর্তমানে ডেমোক্র্যাট দলের রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী বার্নি স্যানডার্সের (Bernie Sanders) জনপ্রিয়তাবাদের সঙ্গে। একটু অন্যভাবে বললে, জনপ্রিয় উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে হয় 'ভালো' (উদারনীতিবাদী) জনপ্রিয়তাবাদীদের অস্তিত্ব আছে, আর নয়তো আছেন 'খারাপ' জনপ্রিয়তাবাদীরা (যেমন নয়া-নাৎসিরা/ট্রাম্প)।

সুপরিচিত সমাজবিজ্ঞানী ও ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় লেখক আশুতোষ বর্ষনে (Ashutosh Varshney)-ও তাঁর একটি লেখায়[২] 'জনপ্রিয়তাবাদ' সমস্যার সুরাহা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি এই ধারণাটিকে দেখেছেন (উদারনীতিবাদী) গণতান্ত্রিক রাজনীতির থেকে পৃথক কিছু হিসেবে। তাঁর উদাহরণগুলি এরকম ''জনপ্রিয়তাবাদ ধারণাটির মর্মস্থলে আছে ''জনপ্রিয়'' ও ''জনপ্রিয়তাবাদী''-র মধ্যে পার্থক্য। জওহরলাল নেহরু ও বারাক ওবামা ছিলেন জনপ্রিয়, তাঁরা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন, কিন্তু তাঁরা জনপ্রিয়তাবাদী ছিলেন না।'' বর্ষনে আরও বিশদে বলেছেন ঃ

''তাঁদের (নেহরুর/ওবামার) রাজনৈতিক আচরণের মধ্যে জনপ্রিয়তাবাদের মূলগত ধারণাগুলি অনুপস্থিত ছিল। জনপ্রিয়তাবাদী ধারণায় গণতন্ত্রের প্রাথমিক ভিত্তিই নির্বাচন, এবং প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলি, যথা, সংবাদমাধ্যম, বিচারবিভাগ, গোয়েন্দা সংস্থা র নজরদারি ব্যবস্থার মধ্যেই ওই প্রক্রিয়া চলে। এই প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক সরকারকে এক নির্বাচন থেকে আর এক নির্বাচনের মধ্যে বেঁধে রাখে। জনপ্রিয়তাবাদীদের বিশ্বাস, এদের (তত্ত্বধায়কদের) উচিত নির্বাচনী রায়কে মেনে চলা, আইনকে নয়। কিছু নেতা প্রকৃত অর্থেই জনতার আকাঙ্খার প্রতিনিধিত্ব করেন। আর অন্যেরা হলেন দুর্নীতিগ্রস্ত ও নৈতিকভাবে অসৎ, তাঁদেরকে চালিত করে রাষ্ট্র ও গণ-উন্মাদনা। নেতাদের ক্যারিশমা বস্তুটির স্থান আইনের উপরে; নেতাদের এই জনতার পক্ষ নিয়ে জেহাদ সংবিধানের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'' বর্ষনে যদিও কথাগুলি লিখেছেন নরেন্দ্র মোদী গোত্রের 'জনপ্রিয়তাবাদ' সম্পর্কে, কিন্তু বস্তুত এই বর্ণনায় (উদারনীতিবাদী) দৃষ্টিকোণ থেকে 'জনপ্রিয়তাবাদ'-কে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সন্দেহের রঙে আঁকা হয়েছে, যেমন উল্লেখ করা হয়েছে 'আইন'/'সংবিধান', ''সংবাদমাধ্যম, বিচারবিভাগ, গোয়েন্দা সংস্থা'' ইত্যাদির কথা।

সুতরাং অনেকের কাছেই জনপ্রিয়তাবাদ একটি বহুবিতর্কিত প্রশ্ন। সধারণত এই ধারণাটিকে দেখা হয় এক ধরনের রণনীতিগত পদ্ধতি হিসেবে, যা রাজনীতিকে নৈতিকতাসম্পন্ন, ''সাধারণ'' জনতার সঙ্গে দুরভিসন্ধিপূর্ণ বা দুর্নীতিগ্রস্ত উচ্চবর্গের (elite) যুদ্ধের আকার দেয়। রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা যখন 'জনপ্রিয়' ও 'জনপ্রিয়তাবাদী'-র মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করেন তখন তাঁদেরকে অনেক সময় বিভ্রান্ত বলেও মনে হয়। 'জনপ্রিয়' শব্দটিকে অনেক সময় জনপ্রিয়তা-র সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয় (যেমনটি গুলিয়ে ফেলেছেন বর্ষনে), কিন্তু যা আরও সমস্যার তা হল গণ-আন্দোলন (popular movement) ও জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য টানা, কারণ দুটি অভিধারই কেন্দ্রে আছে 'জনগণ'। প্রতিবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণী থেকে আসা 'জনগণ/জনতা'র স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের উপাদানসমৃদ্ধ গণ-আন্দোলনের সংখ্যা সংগঠিত আন্দোলনের তুলনায় অনেক বেশি। জনগণের কিছু ইস্যু/দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোনও আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রেই গণ-আন্দোলন হয়ে ওঠার পথে যেতে পারে, এমনকি

যখন সেই সমস্ত আন্দোলন প্রাথমিকভাবে বিশেষ কোনও রাজনৈতিক দল/সংগঠনের পতাকার তলায় সংগঠিত হয়, সেক্ষেত্রেও এ কথা সত্যি হতে পারে।[৩] যেমন ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য আন্দোলন সংগঠিত আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও তা কিছুদিনের মধ্যেই পার্টির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল এবং বৃহত্তর জনতাকে নিজের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিল। কিন্তু তাহলে গণ-আন্দোলনের সঙ্গে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির পার্থক্য করা কীভাবে সম্ভব?

ফারাকগুলি চিহ্নিত করার কাজটি বেশ দুরূহ। সাধারণত যে বিষয়গুলি জনগণের কোনও একটি বৃহৎ অংশের জীবনে ছায়াপাত করে সেগুলিই গণ-আন্দোলনের অভিমুখ। এই ধরনের আন্দোলন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গড়ে ওঠে প্রথাগত বিভিন্ন উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিসরে এবং এই জাতীয় আন্দোলনের চূড়ান্ত ফলাফল হতে পারে সরকারের আমূল পরিবর্তন কিংবা মোটামুটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই সরকার বদল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে রাজনীতিকে যখন চিন্তা ও প্রয়োগের রূপ দেওয়া হয় , অর্থাৎ শুধুমাত্র জনপ্রিয়-আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য নয়, সরকার চালানো, দীর্ঘমেয়াদী নীতি নির্ধারণের জন্যও বটে , তখনই এসে পৌঁছয় জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির মুহূর্ত। কাজেই গণ-আন্দোলন যেখানে কিছু বিশেষ দাবি-দাওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সম্ভাবনা গড়ে দেয়, জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির কাজ সেখানে রাজনীতিকে গণ-অংশগ্রহণের চোখ দিয়ে দেখতে উৎসাহিত করা এবং সেই রাজনীতির সঙ্গে মানানসই করে তোলার জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও অনুশীলনগুলিকে ঢেলে সাজাতে উৎসাহিত করাও বটে।

তবে এই জাতীয় ব্যাপক বিভ্রান্তির অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির উত্থানের গতি অব্যাহত। বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্রের উত্তর থেকে দক্ষিণ ভূখণ্ড জুড়ে বহু দেশেই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির ঢেউ সরকার/আন্দোলন হিসেবে দ্রুত হারে ছড়িয়ে পড়ছে এবং তা হচ্ছে অনেকাংশেই রাজনীতির 'প্রথাগত' সন্দর্ভ/অনুশীলন-কে সরিয়ে দিয়ে। দক্ষিণ এশিয়াও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা একগুচ্ছ জনপ্রিয়তাবাদী নেতাকে দেখেছি; এমনকি দেখেছি এই জাতীয় জনপ্রিয়তাবাদী নেতাদের শাসনাধীন রাজ্য। ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে চলেছে ২০১১ সাল থেকে।

বাইরের দুনিয়ায় জনপ্রিয়তাবাদ ঃ

'জনপ্রিয়তাবাদ' শব্দটি যদিও কোনো আঁটোসাটো মতাদর্শকে বোঝায় না এবং যদিও এই শব্দটি বিভিন্ন স্থান ও কালের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন মানুষের কাছে বহু ধরনের (এমনকী পরস্পর-বিরোধী ধরনের) অর্থবাহী, তা সত্ত্বেও এই ধারণাটির কেন্দ্রে আছে একটি বিশ্বাস, সাধারণ নাগরিকদের ইচ্ছাকে সমাজে সুবিধাভোগী উচ্চবর্গের ইচ্ছার উপরে স্থান

পাওয়া উচিত। তাই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি সংজ্ঞাগতভাবেই উচ্চবর্গ-বিরোধী, সুতরাং তা উচ্চবর্গ এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে বিরুদ্ধতার উপর জোর দিতে চায়। বাস্তবের জটিলতাগুলিকে সরলীকৃত করতে গিয়ে ''জনগণ''-এর ধারণাটি হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাসাভাসা ও নমনীয়। 'জনগণ'-এর ধারণাটিকে ব্যবহার করার মাধ্যমে জনপ্রিয়তাবাদীরা কোনও সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বন্টিত একটি পরিচিতির (shared identity) ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করেন এবং একটি সাধারণ উদ্দেশ্যের অভিমুখে সেই গোষ্ঠীগুলির সমাবেশ ঘটান। জনপ্রিয়তাবাদ একটি হাল্কা ওজনের মতাদর্শ, যার সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য বিভিন্ন শক্তিশালী ও ভারিক্কি মতাদর্শ, যেমন জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, এমনকী বামপন্থার বিভিন্ন উপাদান। কাজেই বাম-ডান রাজনৈতিক পরিসর বরাবর বিভিন্ন অকুস্থলেই জনপ্রিয়তাবাদের সন্ধান মিলতে পারে এবং বামপন্থী জনপ্রিয়তাবাদ ও দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদ দুয়েরই অস্তিত্ব আছে।

প্রথম দর্শনে মনে হয় জনপ্রিয়তাবাদ যেন সমাজের একটি অত্যন্ত আদর্শবাদী ছবি দিচ্ছে, যেখানে বঞ্চিত জনতার স্বার্থ দেখা হয়। শাঁতাল ম্যুফে (Chantal Mouffe) ও আর্নেস্তো লাকলাউ (Ernesto Laclau)-এর মতো জনপ্রিয়তাবাদের কোনও কোনও প্রবক্তাদের মতে জনপ্রিয়তাবাদই গণতান্ত্রিক রাজনীতির মর্মবস্তু, সেই গণতান্ত্রিক রাজনীতি, যা নিজেই জনগণের সাধারণ ইচ্ছার (general will) মাধ্যমে সরকার গঠনের কথা বলে এবং যে বিষয়গুলি জনগণের একটি বড় অংশের উপর প্রভাব ফেলছে সেগুলিকে সামনে নিয়ে আসে। লাকলাউ তাঁর 'অন পপুলিস্ট রিজন' (On Populist Reason)[৪] -এ রাজনৈতিক সন্দর্ভে জনপ্রিয়তাবাদের প্রকৃতি, 'জনগণ'-এর মতো জনপ্রিয় আধিপত্যবাদী (hegemonic) গোষ্ঠীর নির্মাণ এবং রাজনীতিতে আবেগের (affect) গুরুত্ব সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। নিজের আগেকার কাজগুলির ভিত্তিতে লাকলাউয়ের অভিমত, জনপ্রিয়তাবাদের ভিত্তি নিহিত আছে ''শূণ্যগর্ভ সংকেত'' (empty signifiers) নির্মাণের মধ্যে অর্থাৎ সেই সমস্ত শব্দ ও ধারণা যেগুলি ন্যায়বিচারের একটি সার্বজনীন ধারণাকে প্রকাশ করে এবং রাজনৈতিক পরিবেশকে প্রতীকী অর্থে গঠন করে। যাঁরা জনপ্রিয়তাবাদকে গণতন্ত্রের পক্ষে ঝুঁকি হিসেবে দেখেন তাঁদের বিপক্ষে লাকলাউয়ের যুক্তি হল, জনপ্রিয়তাবাদ গণতন্ত্রের একটি মর্মবস্তুগত উপাদান।

কিন্তু এই ''শূণ্যগর্ভ সংকেত''-গুলি সত্ত্বেও জনপ্রিয়তাবাদকে কোনো সুসঙ্গত মতাদর্শ বলা যায় না এবং বিশ্বজনীন (universal) জনপ্রিয়তাবাদ বলেও কিছু হয় না। এর শুধু কিছু বাহিরি চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পাওয়া যেতে পারে মাত্র। তাছাড়া জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি মূলত স্থিত (located) রাজনীতি, তা বিভিন্ন ইস্যু/দাবি-দাওয়া, সামাজিক আবহ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির চৌহদ্দিতে বাঁধা। কাজেই বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্রের উত্তর থেকে দক্ষিণ ভূখণ্ডে, মহাদেশভেদে, দেশভেদে এবং একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলভেদেও তার রূপ বিভিন্ন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান ঘটে একুশ শতকের প্রথম দশকে। সে দেশে এই রাজনীতি হাজির হয় অকুপাই আন্দোলনের চেহারায়। অকুপাই আন্দোলনের ভঙ্গিটি জনপ্রিয়তাবাদী। এই আন্দোলনের ধারণায় ''জনগণ''-কে বলা হয়েছিল ''৯৯%'' এবং বাকি ১%-কে বলা হয়েছিল ''উচ্চবর্গ''। আন্দোলনটি ছিল এই উচ্চবর্গেরই প্রতিস্পর্ধা এবং এই আন্দোলনে এই উচ্চবর্গকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উচ্চবর্গ হিসেবেই তুলে ধরা হয়েছিল। অন্যদিকে ২০১৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বার্নি স্যানডার্স ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারে জনপ্রিয়তাবাদী আবেগের ঢেউ উঠেছিল। দুই প্রার্থীই যথাক্রমে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান দলের প্রতিষ্ঠান-বিরোধী মঞ্চ থেকে নির্বাচন লড়ছিলেন।

ইউরোপে বিশ শতকের শেষের দিকে জনপ্রিয়তাবাদী ভাষার ব্যবহার ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, একথা বিশেষ করে সত্যি পশ্চিম ইউরোপের ক্ষেত্রে, সেখানে বিরোধী দলগুলি মাঝেমধ্যেই এই ভাষায় কথা বলছিল। একুশ শতক নাগাদ ইউরোপে জনপ্রিয়তাবাদ আবারও মূলত রাজনৈতিক দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। কট্টর দক্ষিণপন্থী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রসঙ্গেই শব্দটি ব্যবহার করা হতে থাকে, যেমন গেয়র্গ হেইডার (George Haider)-এর ফ্রিডম পার্টি অফ অস্ট্রিয়া (FPÖ) ও ফ্রান্সে জঁ-মারি লা পেন (Jean-Marie LePen)-এর ফ্রন্ট ন্যাশনাল (FN)।

'জনগণ' নামক অবয়বহীন শব্দটির ছদ্মবেশের মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও জনপ্রিয়তাবাদের সমর্থনগত ভিত্তি কিন্তু আসলে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণীর জোট, সেই সমস্ত গোষ্ঠী ও শ্রেণী যারা তাদের পৃথক পৃথক অস্তিত্বে নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে পারে না, কণ্ঠস্বর শোনাতে পারে না এবং নিজেদের অস্তিত্বকে তুলে ধরতে পারে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'জনগণ'-এর এই সমাবেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 'উচ্চবর্গ' এবং/অথবা নাগরিক সমাজের সদস্যদের থেকে তাদের দূরবর্তী অবস্থান , অনেক ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ পরস্পরের বিরোধীও বটে। এই 'জনগণ'-এর মধ্যে আছে ছোট/খুচরো শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক শ্রেণী, পরিষেবা ক্ষেত্রের তলার দিকের অংশ, বিভিন্ন ধরনের শহুরে ও গ্রামীণ 'প্রান্তিক' বর্গ। অনেক ক্ষেত্রেই 'নব্য-উচ্চবর্গ' (neo-elite) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বড় অংশও জনপ্রিয়তাবাদের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে। সাধারণত এই জাতীয় জোটের সদস্যদের বেঁধে রাখে কিছু বিশেষ ইস্যু ও স্লোগান, কোনও আঁটোসাটো মতাদর্শ ও সাংগঠনিক কাঠামো নয়। কাজেই জনপ্রিয়তাবাদী জোটকে কখনোই মাওয়ের নয়া-গণতন্ত্রে (New Democracy) বর্ণিত শ্রেণী-ঐক্যের ধারণার সঙ্গে তুলনা করা চলে না, নয়া-গণতন্ত্রে শ্রমিক শ্রেণীর কৃষক, সর্বহারা শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও পাতি বুর্জোয়ারা একজোট হয়। স্বতঃস্ফূর্ততার উপাদানটি চিরকালই এই জাতীয় জনপ্রিয়তাবাদী জোটের সংজ্ঞা নির্ধারণ করবে এবং তাকে মতাদর্শ-চালিত, সংগঠিত ও ক্যাডার-ভিত্তিক দলগুলির থেকে আলাদা করে দেবে।

ভারতবর্ষে জনপ্রিয়তাবাদ ঃ

বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষ বিভিন্ন ধরনের জনপ্রিয়তাবাদের ক্ষেত্র হয়েছে। বিভিন্ন জনপ্রিয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তি ভারতীয় রাজনীতিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই শক্তিগুলির রাজনৈতিক সম্প্রদায় সংক্রান্ত দর্শন, তাদের নিশানায় আসা সামাজিক গোষ্ঠী, তাদের অনুসৃত নীতি এবং গণতন্ত্রের উপর তাদের অভিঘাত বিভিন্ন ধরনের। ১৯৬০-এর দশকে ভারতবর্ষে কৃষক জনপ্রিয়তাবাদের উত্থান ঘটে। এই মতাদর্শ শ্রেণীগত পার্থক্যকে মুছে দিয়ে গ্রামীণ জনগণ বনাম শহুরে জনতার বিভাজনকে তুলে ধরে। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধ-কেন্দ্রিক যুদ্ধকালীন জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে এই মতাদর্শের চমৎকার মেলবন্ধন ঘটেছিল, আর এক্ষেত্রে জনপ্রিয়তাবাদী স্লোগানটি জুগিয়েছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী (তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী) জয় জওয়ান! জয় কিসান!

শাস্ত্রীর পর এবং দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস জনপ্রিয়তাবাদী ভাবধারাকে নতুন চেহারায় এগিয়ে নিয়ে যায়, বিশেষ করে ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিক থেকে ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে। ''গরিবি হঠাও''-এর মতো জনপ্রিয় স্লোগান উদ্ভাবন করে তিনি ব্যাংক ও কয়লাশিল্পের জাতীয়করণ ঘটান, প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যগুলির উত্তরাধিকারীদের বিশেষ রাজন্যভাতা (privy purse) বিলোপ করেন এবং এর মাধ্যমে শাসক দলের মধ্যে ভাঙন ঘটার পর বামপন্থীদের সমর্থন আদায় করে নেন। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি নাগাদ বহুবিতর্কিত অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর তিনি একগুচ্ছ সুনির্দিষ্টভাবে গরিবমুখী কর্মসূচি চালু করেন, যা ২০-দফা কর্মসূচি (20-point programme) নামে জনপ্রিয়। বস্তুত ''ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া'' দাবি তুলে তিনি সমাজতান্ত্রিক ইস্যুগুলি অন্যদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন।

১৯৮০-র দশক থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি (বি জে পি) ও আর এস এস-পরিচালিত সংঘ পরিবারের (আর এস এস-এর বিভিন্ন গণ সংগঠন) নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্তাল ঢেউ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে মুসলমান ও খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করা হতে থাকে। এই গোষ্ঠীগুলি বৃহৎ হিন্দু পরিচিতিকে অ-মুসলমান/অ-খ্রিস্টান 'সংখ্যাগুরু' সম্প্রদায়গুলির জাতপাতের পরিচিতি, ভাষাগত কিংবা আঞ্চলিক পরিচিতির ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। সংঘ পরিবার সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে আসা 'বেআইনি' মুসলমান 'অনুপ্রবেশকারী'-দের সম্পর্কে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতেও সমর্থ হয়েছে, অভিযোগ করা হয় যে এই 'অনুপ্রবেশকারী'-রা নাকি ভারতবর্ষের জনসংখ্যার চরিত্রই বদলে দেবে। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘর্ষের আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য পূরণেও সংঘ পরিবার সফল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হিন্দু জনপ্রিয়তাবাদী জাতীয়তাবাদের নতুন মুখ। বহু জনপ্রিয়তাবাদী নীতি চালু করার পাশাপাশি তিনি একটি জনপ্রিয় স্লোগানও তুলেছেন ''সব কা সাথ, সব কা বিকাশ'' (সকলের সঙ্গে, সকলের জন্য উন্নয়ন)।

তবে মোদীকে জনপ্রিয়তাবাদী নেতাদের তালিকায় ফেলা যায় কিনা তা এখনও বিতর্কের বিষয়। ক্যাটারিনা কিনভাল (Catarina Kinnval) মোদীর রাজনীতির মধ্যে দেখতে পেয়েছেন ''লিঙ্গ বিভাজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত 'জাতিত্ব', 'ধর্ম' ও 'হিন্দু পৌরুষ'-এর পুনরুদ্ভাবন'', যা ''ভারতীয় সমাজে প্রকট বেশ কিছু তাত্ত্বিক (ontological) নিরাপত্তাহীনতার 'নিরাময়ণ'-এর লক্ষ্যে কিছু প্রশাসনিক অনুশীলনের একটি ভিত্তি নির্মাণ করেছে''। তিনি আরও বলেছেন ঃ

''যদি ধরে নেওয়া যায় যে মোদী-পরিচালিত নতুন সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ স্বদেশে এবং বিদেশে ভারতবর্ষের ভাবমূর্তিকে উন্নত করা এবং তার পরিবর্তন ঘটানো, যেখানে বিশ্বের মঞ্চে ভারতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক করে তোলার প্রচেষ্টায় অন্যতম মূলগত উপাদান হয়ে উঠেছে ভারতের বৈদেশিক নীতি-নির্ধারকদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি, সেক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির আন্তঃসম্পর্ক ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবমূর্তিটি জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, যে রাজনীতিতে ভারতীয় নেতৃত্ব তথা সামগ্রিকভাবে ভারতীয় (বা হিন্দু) জনগণের বিভিন্ন তাত্ত্বিক নিরাপত্তাহীনতার একটি যৌথ প্রতিক্রিয়া হিসেবে হিন্দু জাতীয় পরিচিতিকে আরও তীব্র করে তোলা হচ্ছে।''

তবে অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, যেহেতু মোদীর রাজনীতির শৈলী চরিত্রগতভাবে 'কর্তৃত্ববাদী' (authoritarian), তাই তিনি তাঁর সরকারের প্রথম মেয়াদে কোনো সাংবাদিক সম্মেলনের মুখোমুখি হননি। এমনকী মন্ত্রিসভায় তাঁর অনেক সহকর্মীর পক্ষেও তাঁর সঙ্গে দেখা করা খুব সহজ নয়। এর পাশাপাশি তিনি কর্পোরেট পুঁজির পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং বিনিময়ে তার দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হন। অথচ আপাতদৃষ্টিতে তিনি অনেকগুলি জনপ্রিয়তাবাদী নীতি নিয়েছেন। আশুতোষ বর্ষনে এই বিষয়টির ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ঃ

''মোদীর অর্থনীতি কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের ধরাবাঁধা জনপ্রিয়তাবাদের পথে চলে না, যা অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতি দ্রুততর করার জন্য মূলত বাজার এবং/অথবা বাণিজ্যিক শ্রেণীগুলির উপর ভরসা করে। তাঁর অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে বাজারমুখী উপাদান (নতুন দেউলিয়া আইন, অপ্রত্যক্ষ করের সংস্কার) অবশ্যই আছে এবং তিনি তাঁর বাণিজ্যপন্থী ঝোঁককে গোপন করতেও সমর্থ হননি, কিন্তু এর সঙ্গেই তাঁর অর্থনীতির মধ্যে আছে বিভিন্ন অ-বাজারপন্থী ''জনমুখী'' উপাদান (গরিবদের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, সকলের জন্য আধুনিক শৌচাগার, কৃষির আয় দ্বিগুণ করা, কৃষকদের ঋণ মুকুব)। উপরন্তু তিনি বিমুদ্রাকরণের যুক্তি হিসেবে জনকল্যাণের কথা বলেছেন। জনগণ যে এতে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তা অবশ্য অন্য প্রশ্ন।''

জাতীয় ক্ষেত্রে এই ঝোঁকগুলির পাশাপাশি রাজ্যস্তরেও অপরিচিত বা দুর্নীতিগ্রস্ত জাতীয় উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিচিতিকে জনপ্রিয় করে তোলার মধ্যে দিয়ে

জনপ্রিয়তাবাদী নেতাদের উত্থান ঘটেছে। তামিলনাড়ুর দ্রাবিড় রাজনীতি এর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে তামিলনাড়ুতে জনপ্রিয় রাজনীতির ভাবধারা মূর্ত হয়ে উঠেছে 'আম্মা' নামে জনপ্রিয় প্রয়াত জয়ললিতার মধ্যে দিয়ে। বিভিন্ন সময় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর কৃতিত্বের ঝুলিতে আছে ১৮ টি বড় আকারের জনপ্রিয়তাবাদী প্রকল্প, যেমন তামিলনাড়ুর কয়েকটি জেলায় ব্যাপক হারে প্রচলিত কন্যাভ্রূণ হত্যা ও লিঙ্গ-ভিত্তিক গর্ভপাত রোখার জন্য ''দোলনা শিশু প্রকল্প'' (cradle baby scheme) এবং ব্যাপক হারে ভর্তুকিপ্রাপ্ত বিভিন্ন 'আম্মা' পণ্য, যেমন 'আম্মা ক্যানটিন' (মিল প্রতি ১ টাকা), 'আম্মা ল্যাপটপ' (হাইস্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে ল্যাপটপ) ইত্যাদি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তাবাদ, বামপন্থী উত্তরাধিকার 'মানুষ'-এর ধারণা ঃ

জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির বিভিন্ন সম্ভাবনা পশ্চিমবঙ্গে সবথেকে বেশি করে প্রদর্শিত হয়েছে। কৃষককেন্দ্রিক জনপ্রিয়তাবাদের পুরনো ধারা, বামপন্থীদের নেতৃত্বে রাস্তাঘাটের বিক্ষোভ আন্দোলন, নির্বাচনী হিংসা, গ্রামস্তরে ক্ষমতার সংঘর্ষ, জোরালো ব্যক্তিত্বের দ্বারা চালিত রাজনীতি, বামপন্থী বাগশৈলী, সামাজিক বিক্ষোভ প্রকাশের মুখ হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থান, ছোট ও মাঝারি শহর, রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং শেষত এই রাজনীতির শ্রেণীভিত্তি, অর্থাৎ তুচ্ছ অর্থনৈতিক অবস্থার অসংগঠিত শ্রমিক জনতা ও ছোট উৎপাদকদের মধ্যে এর ভিত্তি, এই সবকিছুই রাজনীতির মূলগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে জনপ্রিয়তাবাদের পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

বামফ্রন্ট ১৯৭৭ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকের ঝোড়ো রাজনৈতিক সংগ্রামের উত্তরাধিকারী হিসেবে এবং ১৯৭৭ সালে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা উঠে যাওয়ার পর রাজ্যে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যও বটে। বামফ্রন্ট শাসনের অবসানের পর ''সমসাময়িক বাংলার ইতিহাস'' লেখার চেষ্টা করতে গিয়ে রণবীর সমাদ্দার (৫) মন্তব্য করেন যে বামফ্রন্ট শাসনের দীর্ঘ আয়ুই তার অবক্ষয়ের অন্যতম উৎস। পার্টি এবং স্বার্থপুষ্ট একটি আমলাতন্ত্রের উপর দীর্ঘদিন নির্ভর করে থাকার পর সরকারি বামপন্থীরা ভুলে গিয়েছিলেন কী ভাবে সমাজের সঙ্গে সংলাপ চালাতে হয়। তাঁদের সংলাপ চালানোর ক্ষমতা যখন সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গেল, সেই সময়েই সমাজের দাবি জানানোর ক্ষমতা চূড়ায় ওঠে। আর ২০১১ সালে যখন বামফ্রন্ট সরকার তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ল তখন সেই শূন্যস্থান পূরণ করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি ও সরকার।

মমতার জন্ম ও বেড়ে ওঠা দক্ষিণ কলকাতার একান্তই নিম্ন-মধ্যবিত্ত এক পরিবারে। তাঁর অল্প বয়সেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তাঁকে বেশ কিছু ছুটকো ছাটকা চাকরি করতে হয়। তা সত্ত্বেও তিনি কলেজে যেতে পেরেছেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের স্নাতক ডিগ্রি সহ বেশ কয়েকটি ডিগ্রি পেতেও সমর্থ হয়েছেন।

স্কুলে পড়ার সময়েই তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দলে যোগ দেন এবং তাঁর দলে ও অন্যান্য বিভিন্ন স্থানীয় রাজনৈতিক সংগঠনে বিভিন্ন পদে থেকেছেন। ১৯৮৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর গোটা দেশের প্রতিটি আনাচকানাচ জুড়ে যে 'সহানুভূতির হাওয়া' (sympathy wave) বইছিল তাতে সওয়ার হয়েই তিনি লোকসভার সদস্য হন; পরের নির্বাচনে তিনি হেরে যান। কিন্তু ১৯৯১ সালের নির্বাচনে আবার দারুণভাবে ফিরে আসেন দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে এবং তারপর থেকে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি এই কেন্দ্র থেকে সব কয়টি নির্বাচনে জেতেন। ১৯৯১ সাল থেকেই কংগ্রেস, বিজেপি-র নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স (ইউপিএ) পরিচালিত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারে তিনি মন্ত্রী পদে থেকেছেন (ভারতীয় রেলওয়ে সহ বিভিন্ন মন্ত্রকে)।

রাজনৈতিকভাবে মমতার বেড়ে ওঠা কংগ্রেস দলের ছাত্র সংগঠনের অন্যতম সক্রিয় কর্মী হিসেবে; এবং ১৯৮৪ সাল থেকে তিনি আপসহীন বামফ্রন্ট-বিরোধী নেত্রী হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন। রাজ্যের যুব কংগ্রেসের প্রধান হিসেবে তিনি শাসক বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে বহু আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন এবং সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত পরিণতি পেয়েছে রাজ্য পুলিশ ও বাম দলগুলির (বিশেষ করে সিপিআইএম) ক্যাডারদের সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্যে। এই জাতীয় সংঘর্ষে তিনি একাধিক বার গুরুতর আহত হয়েছেন। ১৯৯১ সালের ২১ জুলাই তৎকালীন রাজ্য সচিবালয় রাইটার্স বিল্ডিং-এ অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে সংগঠিত এক মিছিলে (''রাইটার্স অভিযান'' নামে পরিচিত) হিংসার ঘটনা ঘটে এবং পুলিশের গুলিতে ১৩ জন যুব কংগ্রেস সদস্যের মৃত্যু হয় ও বেশ কয়েকজন নেতা ও কর্মী আহত হন। এই ঘটনার পর থেকে প্রতি বছর মমতা সেই তারিখটিকে (২১ জুলাই) ''শহিদ দিবস'' হিসেবে পালন করার জন্য এক বিশাল জনসমাবেশের আয়োজন করে থাকেন।

তবে মমতা যে শুধু বামেদের কট্টর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন তা নয়, কংগ্রেসের মধ্যেও তিনি যথেষ্ট বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। কংগ্রেস দলে রাজ্য সভাপতির পদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়িয়ে তিনি জয়ী হতে ব্যর্থ হন। তখন তিনি অভিযোগ করেন যে তাঁর দলের রাজ্য স্তরের প্রবীণ নেতারা অনেকেই বামফ্রন্ট-সিপিআইএম বিরোধিতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আন্তরিক নন এবং তাঁদের অনেকের সঙ্গেই শাসক বামেদের সঙ্গে ''গোপন বোঝাপড়া'' আছে। এই পরাজয়ের পর রাজ্যের কংগ্রেস দল আস্তে আস্তে কিন্তু নিশ্চিত গতিতে ভাঙনের দিকে এগোতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সেই ভাঙন ঘটে ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি। এই দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস (এআইটিসি) প্রতিষ্ঠা করেন। 'তৃণমূল' নামটি থেকেই বোঝা যায় যে গোড়া থেকেই এই দল কংগ্রেসের ''উচ্চবর্গ''-এর বিরুদ্ধে তার ''সাধারণ'' ও ''গণ'' চরিত্রের উপর জোর দিয়েছিল।

বামফ্রন্ট-সি পি এম-এর বিরুদ্ধে প্রধান বিরোধী নেত্রী হিসেবে মমতা বিভিন্ন স্তরের নির্বাচনের সময় এবং তারপরে বেশ কয়েকটি আন্দোলন পরিচালনা করেন, কিন্তু এ আই টি সি প্রথম বড় আকারের সাফল্য পায় ১৯৯৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে। মমতা এই নির্বাচনে বিজেপি-র সঙ্গে জোট করেছিলেন। কিন্তু ২০০১ সালে তিনি বিজেপি-র জোট থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সে বছরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেন, কিন্তু সেই জোট নির্বাচনে সাফল্য পায়নি। এরপর তিনি আবার অটলবিহারী বাজপেয়ী-এর নেতৃত্বাধীন এনডিএ-তে ফিরে যান, মন্ত্রীর পদও পান, কিন্তু ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তাঁর দল শোচনীয় ফল করে এবং একটি মাত্র আসনে (মমতার নিজের দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র) জিততে সমর্থ হয়। তিনি আবার বিজেপি-র সঙ্গ ত্যাগ করে একলা চলার সিদ্ধান্ত নেন এবং ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল মাত্র ৩০ টি আসন পায়।

কিন্তু রাজনৈতিকভাবে মমতার নবজীবন প্রাপ্তি ঘটে ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর, পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণ-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা এবং সেই আন্দোলনের সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার মধ্যে দিয়ে। ২০০৬ সালের নির্বাচনে জেতার ঠিক পরেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার টাটাদের ন্যানো গাড়ির কারখানাকে জমি বরাদ্দ করার জন্য সিঙ্গুরে (কলকাতা থেকে দূরত্ব মোটামুটি ৪০ কিমি) ৯৯৭ একর বহুফসলি জমি অধিগ্রহণ করে। এই অধিগ্রহণের ভিত্তি ছিল ১৮৯৪ সালের ঔপনিবেশিক জমি অধিগ্রহণ আইন (Land Acquisition Act)। অনুরাধা তলোয়ার, মেধা পাটকার, অরুন্ধতী রায়, মহাশ্বেতা দেবীর মতো অনেক সমাজকর্মী এবং অন্য অনেকেই এই ঐতিহাসিক প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে ওঠেন এই আন্দোলনের পিছনে মূল রাজনৈতিক শক্তি। ২০০৬ সালের ৩ ডিসেম্বর বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণ এবং সিঙ্গুর আন্দোলনের তরুণী কর্মী তাপসী মালিকের হত্যার (তাঁকে ধর্ষণও করা হয়) প্রতিবাদে তিনি ২৬ দিনের অনির্দিষ্টকালীন অনশন শুরু করেন। প্রায় এই সময়েই উপকূলবর্তী পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে একটি বিদেশী রাসায়নিক সংস্থার জন্য প্রস্তাবিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Speacial Economic Zone বা SEZ) গড়ার উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়। প্রতিবাদীরা রাস্তা আটকে দেন, পরিখা খোঁড়েন এবং বেশ কয়েকটি সংযোগকারী সেতু ভেঙে দেন, যার ফলে পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা অসম্ভব হয়ে ওঠে। সংকট চরমে ওঠে ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ, সেদিন পুলিশ ও 'অন্যরা' (অভিযোগ করা হয় যে পুলিশের উর্দি পরা পার্টি ক্যাডার) প্রতিবাদীদের উপর গুলি চালালে ১৪ জনের মৃত্যু হয়।

সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম দুই আন্দোলনই গোটা দেশে এবং দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও প্রবল উন্মাদনার সৃষ্টি করে। পশ্চিমবঙ্গে এই দুটি আন্দোলন জলবিভাজিকায় পরিণত হয়।

বামফ্রন্টের বাইরের অনেক ছোটখাটো বাম দল এবং বহু বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষ এই বিষয়ে বামফ্রন্ট, বিশেষত সিপিআইএম-এর কট্টর সমালোচনা করেন এবং বামফ্রন্ট ও সিপিআইএম-এর নৈতিক অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন, কারণ ছোট ও জমিহীন কৃষকদের স্বার্থের জন্য লড়াই করার দীর্ঘ ইতিহাস সিপিআইএম-এর আছে এবং বামফ্রন্টও গোড়ার বছরগুলিতেই 'অপারেশন বর্গা'-র, (মাঝারি ও বড় কৃষকদের জমিতে কাজ করা) ভাগচাষীদেরকে উৎপাদিত ফসলের তিন-চতুর্থাংশ দেওয়ার নীতি, রূপায়ন ঘটিয়েছিল।

এই দুটি আন্দোলন উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনের নতুন নেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তিও গড়ে দেয় এবং তাঁর হাতে তুলে দেয় একান্ত প্রয়োজনীয় একটি মতাদর্শ, কৃষিজমি ('মাটি') এবং কৃষি শ্রমিক সহ সাধারণ জনগণের ('মানুষ') নজিরবিহীন গুরুত্ব। এই সময়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অসামরিক পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষর করা নিয়ে সংসদে বামদের সঙ্গে কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের মতভেদ দানা বাঁধছিল। প্রথম ইউপিএ সরকার দাঁড়িয়েছিল বাম সাংসদদের 'বাইরে থেকে দেওয়া' সমর্থনের উপর, এই সাংসদরা অনেকেই ছিলেন সিপিআইএম-এর সদস্য। বাম সাংসদরা যখন তাঁদের সমর্থন তুলে নিলেন তখন মমতার পক্ষেও রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করা সহজ হয়ে উঠল। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে মমতার এ তৃণমূল কংগ্রেস-র সমর্থন সহ দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার সংসদে আরও বেশি সংখ্যক আসন পেয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসে। মমতা রেলমন্ত্রী হিসেবে ইউপিএ সরকারের অংশ হন। শেষ পর্যন্ত ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে কিছু ছোটখাটো দলের সমর্থন সহ কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস জোট বামফ্রন্টকে শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত করে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন। ২০১৬ সালে কংগ্রেস ও অন্যান্য ছোট দলের সমর্থন ছাড়াই বাম-কংগ্রেস জোট ও বিজেপি-কে পরাস্ত করে তাঁর সরকার আরও বেশি ভোটের ব্যবধানে আবার ক্ষমতায় আসে।

রাজনীতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ঃ

নরওয়ের নৃতত্ত্ববিদ ও লেখক কেনেথ বো নিয়েলসন (Kenneth Bo Nielson) ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সিঙ্গুরে ক্ষেত্র-সমীক্ষা (field work) চালানোর সময় মমতাকে প্রথম দেখেন (মমতা তখন একটি সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন)। তিনি তাঁর প্রথম ধারণার বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাষায় ঃ

''সিঙ্গুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক প্রদর্শন অনেক দিক থেকেই তাঁর রাজনৈতিক শৈলীর প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি একইসঙ্গে একজন অমায়িক, যত্নশীল ও সৌজন্যপূর্ণ নেত্রী এবং একজন আগুনখোর, চাঁচাছোলা ও মারমুখী বক্তা। এর ফলে তিনি ভারতের রাজনৈতিক ভূখণ্ডে একজন বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছেন। তিনি মাঝেমধ্যেই জনমতের মধ্যে বিভাজন ঘটান এবং মানুষ তাঁকে হয় ভালোবাসতে চান, আর নয়তো ঘৃণা করতে চান।''[৬]

এরপর নিয়েলসন ''দুজন আলাদা আলাদা সাংবাদিক''-এর দেওয়া মমতার দুটি বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। প্রথম বিবরণটিতে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে ''রাস্তাঘাটে লড়াকু, লোক-ক্ষ্যাপানো, সাদামাটা জীবনযাপন করা জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিক, থাকেন কলকাতার এক বেহাল দশাগ্রস্ত পাড়ায় দুর্গন্ধযুক্ত খালের ধারে লাল টালির একতলা এক বস্তি গোছের বাড়িতে। তাঁকে দেখা যায় সস্তা, রংচটা, মাঝেমাঝে ছেঁড়াখোঁড়া শাড়িতে।'' আর দ্বিতীয় সাংবাদিকের কাছে ''ভারতবর্ষে যদি কোনো একজন সৎ রাজনৈতিক নেতা থেকে থাকেন যিনি সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করেন এবং যাঁকে ভারতীয় শাসকরা কখনো টাকা ও অন্যান্য জিনিসপত্র দিয়ে ঘুষ দিতে পারেনি, তাহলে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।''

নিয়েলসনের মতে, ''বেশিরভাগ ভারতীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেভাবে বিচার করেন, এই দুটি ক্ষুদে প্রতিকৃতি তারই প্রতিনিধি। কিছু মানুষের কাছে তিনি দীনহীন বক্তৃতাবাগীশ রাজনীতিক; অন্য অনেকের কাছে রাজনীতি নামক নোংরা ও দুর্নীতিগ্রস্ত খেলায় তিনিই একমাত্র সৎ ও পরিশ্রমী রাজনীতিক। সিঙ্গুরের সেদিনের পরিবেশ বিচার করলে একজন বহিরাগতের কাছেও একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে তাঁর মঞ্চের কাছে জড়ো হওয়া গ্রামবাসীরা দ্বিতীয় দলের সদস্য।''

উপরের বিবরণটি থেকে বোঝা যায় কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকের কাছেই একটি প্রহেলিকা, কারণ একটি-দুটি মূলগত বৈশিষ্ট্য দিয়ে তাঁকে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ''লোক-ক্ষ্যাপানো, জনপ্রিয়তাবাদী বক্তৃতাবাগীশ'' এবং ''সৎ ও পরিশ্রমী রাজনীতিক''-এর মতো দুটি আপাতভাবে পরস্পর-বিরোধী ভাবমূর্তি তিনি নিজের মধ্যে ধারণ করেন। কিংবা নিয়েলসনের পর্যবেক্ষণ অনুসরণ করে বলা যায় যে তাঁর মধ্যে ''একইসঙ্গে'' মূর্ত হয়ে ওঠে বিভিন্ন আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য, তিনি একজন অমায়িক, যত্নশীল ও সৌজন্যপূর্ণ নেত্রী, এবং একজন আগুনখোর, চাঁচাছোলা ও মারমুখী বক্তা। তাঁকে অনেক সময়েই একজন অত্যন্ত আবেগপ্রবণ মানুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়, এমন একজন যিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ''নিরাবেগ রাজনৈতিক হিসেব-নিকেশ''[৭] -এর তুলনায় অনেক বেশি নির্ভর করেন তাঁর আবেগের উপর। মমতা নিজেও এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল। ক্ষমতায় আসার এক বছরের মধ্যে এক বক্তৃতায় তিনি তাঁর এই (আবেগপ্রবণতার) গুণটিকে মূল্য দিয়ে বলেন ''অনেক সময় মানুষ বলেন যে আমি খুবই আবেগপ্রবণ। আমার সিদ্ধান্ত আমার আবেগ দ্বারা চালিত হয়। আমি এর উত্তরে তাঁদেরকে বলতে চাই যে একজন মানুষ যদি আবেগপ্রবণ না হয় তা হলে তার বিবেক কখনো পরিষ্কার হয় না''।[৮]

এক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বাঙালি (উচ্চবর্ণ হিন্দু) ইংরাজি শিক্ষিত মানুষদের একটি বড় অংশ মমতার ''অমার্জিত'' উচ্চারণ ও তাঁর নিজস্ব ভাষাভঙ্গি ব্যবহার এবং তাঁর 'নিয়মহীন', 'বিশৃঙ্খল'' ও 'উন্মাদনাগ্রস্ত' রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণ করে এসেছেন এবং এখনও করে থাকেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভদ্রলোক

নামে পরিচিত এই উচ্চবর্ণীয়রা সেই ঔপনিবেশিক শাসনের আমল থেকেই বাংলার রাজনীতিতে কর্তৃত্ব করে এসেছেন। উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণ বা 'রেনেসাঁস' এসেছে এই ভদ্রলোকদের হাত ধরেই। ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটিতে সেই পরম্পরাই বজায় থেকেছে। রাজ্যে নিম্নবর্ণ মানুষরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ রাজ্যের সব ক'জন মুখ্যমন্ত্রীই এসেছেন উচ্চবর্ণীয় ভদ্রলোক সম্প্রদায় থেকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দফতরের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর প্রাক্তন যুগ্ম অধিকর্তা ড. উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বিষয়টিকে বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলে ধরেছেন। স্বয়ং জাতপাতের ইতিহাস নিয়ে কাজ করা একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে বিশ্বাস আউটলুক পত্রিকার এস.এন.এম. আবদি (S.N.M. Abdi)-কে এক সাক্ষাৎকারে (১০ আগস্ট, ২০১২) (৯) বলেছেন ''...অনগ্রসর শ্রেণীগুলি পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ৬৮ শতাংশ এসসি ২৩ শতাংশ, এসটি ছয় শতাংশ আর ওবিসি ৩৯ শতাংশ। ওবিসি-দের মধ্যে ২১.৫ শতাংশ মুসলমান, আর ১৭.৫ শতাংশ অ-মুসলমান। ওবিসি-দের দুটো আলাদা গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে, এ এবং বি। এ গ্রুপটি অপেক্ষাকৃত বড়, আরও বেশি অনগ্রসর এবং মূলত মুসলমান''।

বিশিষ্ট প্রাক্তন আমলা ও লেখক অশোক মিত্রর সঙ্গে সহমত পোষণ করে বিশ্বাস আরও বলেছেন যে ''বাংলায় উচ্চবর্ণের আধিপত্য এতই প্রবল যে নিম্নবর্ণের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করারও সাহস পান না, তাদের এই আধিপত্যকে ঈশ্বরের বিধান হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে। বাংলা থেকে কোনো জগজীবন রাম, রামবিলাস পাসোয়ান, নীতিশ কুমার, লালুপ্রসাদ বা মায়াবতী উঠে আসেননি। উচ্চবর্ণরা, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য, মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশও হবে না, কিন্তু তারাই ৮০ শতাংশের উপর শাসন চালায়। বলিউডের দরজা সমস্ত শ্রেণী ও জাতপাতের জন্য খোলা। কিন্তু টলিউডেও কি তাই? ভণ্ডামির প্রতিযোগিতা হলে বাঙালি ভদ্রলোককে কেউ তাতে হারাতে পারবে না। আনন্দবাজার পত্রিকা-এ পাত্র-পাত্রী চাই-এর বিজ্ঞাপনগুলো দেখেছেন? ক্যালক্যাটা ক্লাবের জাতপাতের গঠন কী? বিনোদন শিল্প বা সাংবাদিকতাতেই বা কী হাল?'' বিশ্বাস আরও জানিয়েছেন ''আজকে যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আছে তার কারণ হল অনগ্রসর শ্রেণিগুলোর আনুগত্য তাদের দিকে ঝুঁকেছে''।

মমতা নিজে উচ্চবর্ণের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি অন-নিম্নবর্ণীয় শ্রেণীগুলির অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী তার ব্যাখ্যাও বোধহয় বিশ্বাসের এই কঠোর সমালোচনার মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর বাম, দক্ষিণ ও মধ্যপন্থী উপাদানসম্পন্ন রাজনীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সাংবাদিক ও লেখক মনোবীণা গুপ্ত।[১০] ২০১১ সালের নির্বাচনের ঠিক আগে মমতা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ ঃ

''তাঁর নতুন আঙ্গিকের রাজনীতিতে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বাণীর সঙ্গে জমি আন্দোলন, মানবাধিকার, এবং গরিবের জন্য ন্যায়বিচার ও উন্নয়নের ভাষার মিশেল ঘটেছে।

তেভাগার জন্য প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার করার পাশাপাশি তিনি রামকৃষ্ণ, সারদা, বিবেকানন্দ, পুরাণ ও গীতা-কেও উদ্ধৃত করেন। ডান ও বামের মধ্যবর্তী সীমানাগুলি এইভাবে সরে যেতে থাকায় এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি দানা বাঁধছে। একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিসরের দুটি বিপরীত মেরুতে, সরলীকৃত অর্থে 'বাম ও ডান' নামে চিহ্নিত, পা রাখা এই বাগভঙ্গির মিশেল জনগণের কল্পনাকে নাড়া দিচ্ছে বলেই মনে হয়, অন্তত এখন, যখন তাঁর জনপ্রিয়তা তাবৎ কালের মধ্যে সর্বোচ্চ।"

দিদি নামে জনপ্রিয় মমতা তাঁর মতাদর্শ ও নীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে ''আমরা মার্কসবাদী কিংবা পুঁজিবাদী নই, আমরা গরিব মানুষের পক্ষে", এক বিদেশী সংবাদপত্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারে[১১] তিনি বলেছেন। ''আমাদের নীতি অত্যন্ত পরিষ্কার যে নীতি জনগণের পক্ষে উপযুক্ত হবে, যে নীতি পরিস্থিতির পক্ষে উপযুক্ত হবে, সেই নীতি আমার রাজ্যের পক্ষে উপযুক্ত হবে।" তিনি তাঁর নীতিকে ''মা মাটি মানুষ"-এর স্বার্থের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন।

তবে তিনি নিজে 'মার্কসবাদী' হিসেবে পরিচিত হতে না চাইলেও অনেক পর্যবেক্ষকের চোখেই তাঁর রাজনীতি ও বিভিন্ন নীতির সঙ্গে বাম রাজনীতির বিস্তর মিল ধরা পড়েছে। গবেষক ও কলাম লিখিয়ে রুদ্রাংশু মুখার্জি এই বিষয়টির উপর চমৎকারভাবে জোর দিয়েছেন। ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জিতে মমতা দ্বিতীয় বারের জন্য ক্ষমতায় আসেন। এই নির্বাচনের পর মুখার্জি তাঁর একটি উত্তর-সম্পাদকীয় নিবন্ধের (১২) উপসংহারে লেখেন ''যতই পরিহাসের মতো শোনাক না কেন, বামদের পোশাক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই পড়েছে। তাঁর শাড়ির পাড় বেশিরভাগ সময়েই নীল হয়। তা স্বচ্ছন্দেই হতে পারে লাল"।

এমনকী প্রশাসক হিসেবেও মমতা কিন্তু তাঁর পুরনো ধরনের রাস্তার রাজনীতির শৈলী ভুলে যাননি। সাম্প্রতিক কালে সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারির তদন্ত চলাকালীন কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনারকে 'জেরা'/'গ্রেপ্তার' করার চেষ্টাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ, সিবিআই ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের চাপান-উতোরের সময় তা স্পষ্ট হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতা শহরের প্রাণকেন্দ্র এসপ্ল্যানেডের মেট্রো চ্যানেলে মমতা ধর্নায় বসেন এবং তারপর ধর্নামঞ্চের পাশের একটি অস্থায়ী অফিস ঘরে ক্যাবিনেট বৈঠক করতে থাকেন। মমতার সমালোচকরা প্রত্যাশিতভাবেই তাঁকে প্রবলভাবে আক্রমণ করেন এবং একজন ''অভিযুক্ত" উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকের প্রতি তাঁর সহানুভূতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে ''নৈতিক" দিকের থেকেও বেশি কিছু জড়িত ছিল, এই নজিরবিহীন পদক্ষেপটি যে বহু সংখ্যক মানুষকে চমকে না দিক, আশ্চর্য করে দিয়েছিল, তার কারণ সরকারি রীতিনীতি ও আচরণবিধি (protocol) সম্পর্কে এর প্রবল অবজ্ঞা। সাম্প্রতিক ইতিহাসে মমতার এই ধর্নার একটি তুলনা পাওয়া

যায়। ২০১৮ সালের জুন মাসে আঁফাঁ তেরিব্ল (enfant terrible) অরবিন্দ কেজরিওয়াল তাঁর আপ সরকারের কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নরের বাসভবন রাজ নিবাসে ধর্নায় বসেন। ২০১৪ সাল থেকে চলে আসা কেজরিওয়ালের জনতা দরবারগুলির সঙ্গেও ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে মমতার রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রকাশ্যে সচিবালয়ের বৈঠক করার কিছুটা মিল পাওয়া যায়।

তবে এই দ্বিতীয় বিষয়টি এখন নিয়মিত ঘটনা হয়ে উঠেছে এবং (বিশেষ করে কলকাতা থেকে দূরবর্তী জেলাগুলিতে) সাধারণ জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও আশার সঞ্চার করেছে, কিন্তু তার সঙ্গেই তা সেই সমস্ত উচ্চপদস্থ আমলাদের পোশাকি মানসিকতায় ধাক্কা দিয়েছে যাঁরা কলকাতা থেকেই বঙ্গ শাসন করতে পছন্দ করেন। সমালোচনায় অবিচল এবং সেই সমালোচনাকে ''উচ্চবর্গীয়'' বলে উড়িয়ে দেওয়া মমতা এই নতুন রীতির মধ্যে কলকাতায় কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার 'বিকেন্দ্রীকরণ' খুঁজে পেয়েছেন, সেই কলকাতা যে শহর ঔপনিবেশিক আমলের গোড়ার মুহূর্ত থেকে ১৯১১ সালে রাজধানী দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় পর্যন্ত ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র ও রাজধানী।

জনপ্রিয় প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশাসনিকতা ও বাঙালিয়ানার রাজনীতি ঃ

গত আট বছরে মমতা একগুচ্ছ জনপ্রিয়তাবাদী কর্মসূচি চালু করেছেন। মিশেল ফুকোর ভাষা ধার করে এই কর্মসূচিগুলিকে বলা যায় 'জৈব-ক্ষমতা' (biopower) ও 'জৈব-রাজনীতি' (biopolitics)-র মাধ্যমে 'প্রশাসনিকতা' (Governmentality)।[১৩] এই প্রকল্পগুলি অন-উচ্চবর্গ জনতার মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও বাম, ডান ও মধ্যপন্থী সব ধরনের ভদ্রলোকেরাই এগুলির কড়া সমালোচনা করেছেন। সমালোচকরা এই প্রকল্পগুলির মধ্যে ''ভাতা দেওয়ার সস্তার রাজনীতি'' ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে কয়েকটির মূল ভিত্তি ১) ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বন্টন (সবুজ সাথী); ২) ছাত্রীদের আর্থিক উৎসাহ দেওয়া, যা তাঁর প্রকল্পগুলির মধ্যে মধ্যে সব থেকে সুপরিচিত (কন্যাশ্রী); ৩) গণবন্টন (public distribution system বা PDS) ব্যবস্থার মাধ্যমে ২ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়া (খাদ্যসাথী); ৪) লোকশিল্পীদের জন্য ভাতা (লোক প্রসার প্রকল্প); ৫) স্থায়ী-অস্থায়ী নির্বিশেষে সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীর জন্য নগদহীন যৌথ স্বাস্থ্য বিমা (স্বাস্থ্যসাথী); ৬) বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছনো মেয়েদের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন দক্ষতা এবং পরিবারকল্যাণ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং বিভিন্ন চালু সরকারি পরিষেবা সম্পর্কে তাদেরকে তথ্য জোগানো (সবলা); ৭) গ্রামের গরিবদের জন্য দারিদ্র-বিরোধী কর্মসূচি, যা মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী সংগঠিত করার মাধ্যমে রূপায়িত (আনন্দধারা); ৮) সর্বোচ্চ খুচরো মূল্যের উপর প্রাক-অনুমোদিত ছাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা গুণমানসম্পন্ন বর্গনামভিত্তিক (generic) ওষুধ, শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দেওয়ার পরিষেবা (ন্যায্য মূল্যের ঔষধালয়); ৯) ৩০ শতাংশ বা ১ লক্ষ টাকা

পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়ার মাধ্যমে বেকার যুবকদের গাড়ি, ছোট ট্রাক ইত্যাদি কিনতে সক্ষম করে তোলা (গতিধারা); ১০) অর্থনৈতিকভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল অংশগুলির মানুষদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা (গীতাঞ্জলি) ইত্যাদি। এই প্রকল্পগুলি ছাড়াও সরকারের নিয়মিত রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন উৎসব আয়োজন করার জন্য পুরনো ধাঁচারযুব সংগঠন বা ক্লাবগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর একটি লক্ষ্য হল কোনও রকম সাম্প্রদায়িক বা এমনকী মতাদর্শগত পক্ষপাতকে বাদ দিয়ে সমন্বয়মূলক (synthetic) ভঙ্গিতে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিয়ানাকে তুলে ধরা এবং তার মাধ্যমে নতুনভাবে এক ''নতুন বাংলা''-র সীমানা নির্দেশ করা, যে বাংলার পুঁজি বাংলার নবজাগরণের উনিশ শতকী ঐতিহ্য, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও স্থানীয় অস্মিতা। এ বিষয়ে জনৈক লেখকের পর্যবেক্ষণ, ''মমতার সঙ্গে জনগণও এসে পৌঁছেছেন এবং তাঁরা এখানে থাকতে এসেছেন এবং বাঙালি বলতে যা বোঝায় তাকে তাঁরা ঢেলে সাজাচ্ছেন। বাঙালি পরিচিতিকে তুলে ধরার বিষয়টিকে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র হিন্দু জনপ্রিয়তাবাদের মোকাবিলা করার কাজেও ব্যবহার করছেন।''

সমন্বয়মূলক বাঙালিয়ানাকে জাহির করার বিষয়টি একটি নতুন মাত্রা পেয়েছে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র চোখ ধাঁধানো উত্থানের পর। সাম্প্রতিক কালে কেন্দ্রের বিজেপি পরিচালিত এনডিএ সরকার জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (National Population Register বা NRC) লাগু করার প্রক্রিয়া নতুনভাবে শুরু করেছে, বিশেষ করে বিজেপি শাসিত অসমে, যার উদ্দেশ্য বাংলাদেশ থেকে আসা ''বেআইনি অভিবাসী''-দের চিহ্নিত ও ''নির্বাসিত'' করা এবং 'নির্বাসন কেন্দ্র'-এ পাঠানো। তার ফলে অসম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বাঙালিরা আতঙ্কের বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছেন, কারণ আসামে ১৯ লক্ষেরও বেশি মানুষকে এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই আতঙ্ক পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের উপরেও ছায়াপাত করেছে, কারণ তাঁরা অনেকেই পূর্ববঙ্গ/পূর্ব পাকিস্তান থেকে এ রাজ্যে এসে বসবাস করতে শুরু করেছেন দেশভাগের (১৯৪৭) পরবর্তী দশকগুলিতে।

এনআরসি নতুন করে চালু হওয়ার সময় থেকেই মমতা এই নীতির কট্টর সমালোচক। তিনি বিষয়টিকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুদিক থেকেই মোকাবিলা করার চেষ্টা করছেন এবং রাজ্যে এনআরসি প্রক্রিয়া রূপায়িত হওয়া সংক্রান্ত মানুষের আতঙ্ককে দূর করার জন্য আশ্বাস দিয়ে চলেছেন, ''বাংলায় এনআরসি হবে না''। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেরায় এক প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি বলেছেন, রাজ্যে এনআরসি রূপায়িত হবে এই আতঙ্কে মানুষ যে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।[১৪] একদিকে বাঙালিদের মধ্যে আতঙ্কজনিত বিকার দূর করার এবং অন্যদিকে রাজ্যে ক্রমশ শক্তি বাড়াতে থাকা বিজেপি-র মোকাবিলা করা ও তাদের সংযত রাখার এই নতুন-খুঁজে-পাওয়া

অস্ত্র হাতে মমতা বিজেপি-র ''বহিষ্কারমূলক'' (exclusionary) রাজনীতির বিরুদ্ধেও ''সমন্বয়মূলক'' বাঙালি সংস্কৃতিকে তুলে ধরছেন। নরম ধরনের পরিচিতি রাজনীতি (soft identity politics)-র এই নতুন চেহারা তাঁর জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিকে নতুন গড়ন দেবে কিনা তা বোঝা যাবে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগের মাসগুলিতে।

মমতার রাজনীতির সীমাবদ্ধতা ঃ

সমালোচকদের মতে মমতার জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির গণ-আবেদন সত্ত্বেও তার মধ্যে নানান সীমাবদ্ধতাও আছে। তাঁর সরকারের প্রথম ৩-৪ বছরের মেয়াদের (যে সময় বামফ্রন্ট-বিরোধী মনোভাব পুরোদস্তুর বজায় ছিল) পর সেগুলি মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। এইসব সীমাবদ্ধতাগুলির মধ্যে কয়েকটি অবশ্য জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির বেশিরভাগ ধারার মধ্যেই দেখা যায়। যেমন ভারতবর্ষের বেশিরভাগ জনপ্রিয় রাজনীতিকের মতোই তাঁর রাজনীতিও একচেটিয়াভাবে নেতা-কেন্দ্রিক। প্রথমত, দলীয় সংগঠনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন তিনি নিজে, বিশ্বাস করেন জনতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগে এবং অন্যান্য আঞ্চলিক/জাতীয় দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার বিষয়েও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী তিনিই। একমাত্র অধিকারী পরিবারের (মূলত শিশির অধিকারী ও এখন তাঁর পুত্র শুভেন্দু অধিকারী) খাসতালুক পূর্ব মেদিনীপুর জেলাকে বাদ দিলে মমতা ও তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস সমার্থক। তার ফলে, দ্বিতীয়ত, তাঁর দলের সংগঠন, যা চরিত্রগতভাবে অপরিকল্পিত (ad hoc), আকস্মিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঘূর্ণির মুখে টিকে থাকার পক্ষে (সংগঠিত বামপন্থীদের মতো) যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। তৃতীয়ত, মতাদর্শের অভাব (কারণ বামপন্থী ও হিন্দু দক্ষিণপন্থীদের আঁটোসাটো মতাদর্শের সামনে মা-মাটি-মানুষ-এর স্লোগানটি ফাঁকা সংকেতের মতোই শোনায় এবং এই স্লোগান বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দিতা ও সংকটের মুখে তাঁর দলের কর্মীদের বেঁধে রাখতে সফল নয়)। চতুর্থত, মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসার পর মমতা জনগণের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওঠার চেষ্টা করলেও প্রকল্প রূপায়ন সুনিশ্চিত করার পদ্ধতি হিসেবে তাঁকে মূলত সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের উপরেই নির্ভর করতে হয়েছে। তার ফলে তিনি তাঁর পুরনো ধরনের রাস্তার রাজনীতি ও মানুষের সঙ্গে সংযোগের থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন।

একেবারে সাম্প্রতিক কালে, বিশেষ করে লোকসভার সাধারণ নির্বাচনে (মে, ২০১৯) বিজেপি রাজ্যে ১৮ টি আসন পাওয়ার এবং রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের উপস্থিতি প্রবলতর হয়ে ওঠার পর মমতার জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং ফাঁকফোকরও আরও বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাঁর দলের সাধারণ কর্মীরা অনেকেই এবং এমনকী বিভিন্ন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও বিধানসভার প্রতিনিধিরা পর্যন্ত সীমা লঙ্ঘন করছেন। এই ধরনের কঠিন পরিস্থিতিতে মমতা এক সাংবাদিক সম্মেলনে

বলেছেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিয়ে দল ও রাজনীতিতে মনোযোগ দিতে চান, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য আর কোনো বিকল্প দেখা যাচ্ছে না। ''আমি চেয়ারে থাকার জন্য আকুল নই, কিন্তু চেয়ারের আমাকে প্রয়োজন'', তিনি জানিয়েছেন। তাঁর জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির সামনে প্রধান দুটি পরীক্ষা—রাজ্যের প্রশাসন চালানো এবং তাঁর দলের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে বিজেপি-র হিন্দু জাতীয়তাবাদের ক্রমশ বাড়তে থাকা বিপদকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করা।

একেবারে হালে তাঁকে প্রশান্ত কিশোরের মতো পেশাদার নির্বাচনী রণনীতি বিশেষজ্ঞের পরামর্শও নিতে দেখা গিয়েছে। হয়তো তাঁরই পরামর্শে তিনি ''দিদিকে বলো'' নামে মানুষের সঙ্গে অনলাইন মাধ্যমে যোগাযোগের একটি কর্মসূচি চালু করেছেন। আপাতভাবে এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল, স্থানীয় স্তরে তাঁর দলের উচ্ছৃঙ্খল প্রতিনিধিদের উপর নজরদারি রাখা এবং তাঁর উন্নয়ন প্রকল্পগুলির ফসল প্রকৃত সুবিধাপ্রাপকদের (beneficiaries) হাতে পৌঁছচ্ছে, নাকি মাঝপথে তার একটি বড় অংশ স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গিয়ে ''কাটমানি'' হিসেবে স্থানীয় নেতাদের পকেট ভরাচ্ছে, তার তত্ত্বাবধান করা। তিনি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনকে অনুরোধ করেছেন, তাঁরা যেন জনগণের মধ্যে সুবিধা বন্টনের জন্য ''কাটমানি'' নেওয়া স্থানীয় নেতাদের কাছ থেকে তাঁদের ক্ষয়ক্ষতি 'পুনরুদ্ধার' করেন। এই পদক্ষেপটি তাঁর পক্ষে অনেকাংশেই ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এর ফলে ক্রমশ শক্তি বাড়াতে থাকা বিজেপি-র পালে আরও বেশি করে হাওয়া লেগেছে। কিন্তু যে প্রশ্ন থেকেই যায় তা হল শুধুমাত্র প্রশাসনিকতাই কি তাঁকে রক্ষা করতে সমর্থ হবে, নাকি তাঁর পক্ষে প্রয়োজন একটি নতুন বাঙালি পরিচিতি রাজনীতির পুনরুদ্ভাবন, যে রাজনীতি হবে অন্তর্ভুক্তির (inclusive) এবং স্পন্দনময়, এবং তা রাজ্যে ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকা হিন্দুত্বের ঢেউকে রুখে দিতে পারবে? কিন্তু আবারও প্রশ্ন, তা যদি করতেই হয় তবে তা কীভাবে? কীভাবে যথেষ্ট কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়ে তাঁর বিভিন্ন জনপ্রিয়তাবাদী কর্মসূচির সঙ্গে একটি আধিপত্য-বিরোধী (counter-hegemonic) বাঙালি পরিচিতির মিশেল ঘটানো যায়? এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্য আমাদের আরও একটু সময়ের প্রয়োজন।

প্রায় সাত বছর আগে যখন মমতার সরকারের মাত্র এক বছর পূর্ণ হয়েছে এবং যখন সবাই তাঁর ''সামাজিক কারিগরি'' বা social engineering (সমাজের তলার দিকের শ্রেণীগুলির বিভিন্ন উপাদানকে এক জায়গায় জড়ো করা)-এর ফলপ্রসূতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সেই সময় রণবীর সমাদ্দার কিছু সতর্কবাণী[১৫] শুনিয়েছিলেন। কথাগুলি আজকের প্রেক্ষিতেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়ঃ

''ক্ষণে ক্ষণে রং বদলানো সংবাদমাধ্যম পরিবেশিত দৈনিক প্রজ্ঞা যা-ই বলুক না কেন, সমাজের নিম্নবর্গীয় শ্রেণিগুলি মমতাকে সময় দেবে। কিন্তু প্রশ্ন হবে তিনি ও তাঁর দল কি

শিক্ষা নেবেন? তাঁরা কি তাঁদের সরকার পরিচালনার প্রত্যক্ষ, আগুনখোর, সংলাপমূলক শৈলীর সঙ্গে অপেক্ষাকৃত সুক্ষ্ম, প্রশাসনিক, অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতিগুলির এবং কী করা প্রয়োজন সে বিষয়ে এক ধরনের রণনীতিগত দৃষ্টিভঙ্গির মেলবন্ধন ঘটাতে সমর্থ হবেন? তাঁরা কি সামাজিক কারিগরির সূত্রপাত ঘটাতে সক্ষম হবেন?

সে সম্ভাবনার বিরুদ্ধে প্রতিকুলতার পাল্লা অনেক বেশি ভারী।"

অনুবাদক ঃ প্রসিত দাস

Reference

1. https://www.dailykos.com/stories/2019/7/2/1868898/-Cartoon-Populism-vs-populism Last accessed on 2 August, 2019.
2. The Indian Express, 23 October, 2017.
3. Sibaji Pratim Basu, "The Chronicle of a Forgotten Movement: West Bengal: 1959 Revisited", in Samir Kumar Das (ed.), India: Democracy and Violence, OUP, New Delhi, 2015.
4. Ernesto Laclau, On Populist Reason, Verso, London, 2018.
5. Ranabir samaddar, The Passive Revolution in West Bengal: 1977-2011, Sage, New Delhi, 2013.
6. Kenneth Bo Nielson, 'Mamata Banerjee: Redefining Female Leadership' in, Arild Englesen Ruud and Geir Heierstad (Eds.) India's Democracies: Diversity, Co-optation, Resistance. Universitetsforlaget, Oslo, 2016.
7. https://www.firstpost.com/india/i-am-an-emotional-person-mamata-banerjee-367262.html Last accessed on 15 July, 2019.
8. Ibid.
9. https://www.outlookindia.com/website/story/bengal-hasnt-produced-a-jagjivan-ram-or-even-a-mayawati/281957 Last accessed on 10 August, 2019.
10. Monobina Gupta, 'The Paradoxical Figure of Mamata' in Kafila, 12 April 2011
11. https://kafila.online/2011/04/21/the-paradoxical-figure-of-mamata-monobina-gupta/ Last accessed on 15 August, 2019.
12. https://www.washingtonpost.com/world/mamata-banerjee-personifies-populist-force-in-indian-politics/2012/05/20/gIQAsWMwdU_story.htmlLast accessed on 7 August 2019.
13. Rudrangshu Mukherjee, "Call of populism: A vote for continuity contains a challenge to change", The Telegraph, 20 May, 2016.
14. ফুকোর প্রকাশিত বইপত্রের মধ্যে এই ধারণাগুলির দেখা মেলে History of Sexuality- র কৃষকায় প্রথম খণ্ডে (The Will to Knowledge: History of Sexuality, Volume I, 1976) "বে Collège de France-এ প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা মালায় মূলত 1975-76, 'Society Must be Defended'; 1977-78, Security,

Territory, Population; এবং 1978-79, The Birth of Biopolitics) ক্ষমতা ও প্রশাসনিকতার বৃহত্তর তত্ত্বায়ন ও উৎস বৃত্তান্তের (genealogy) এর মধ্যে জৈব রাজনীতি ও জৈব ক্ষমতার দেখা পাওয়া যায়।

15. https://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/nrc-wont-happen-in-bengal-mamata/articleshow/71294823.cms Last accessed on 29 September, 2019.

16. Ranabir Samaddar, "West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee deserves a chance", India Toda, May 10, 2012

17. https://www.indiatoday.in/opinion/ranabir-samaddar/story/west-bengal-chief-minister-mamata-banerjee-deserves-a-chance-101699-2012-05-10 Last accessed 10 August, 2019.

কন্যাশ্রী প্রকল্প: জনপ্রিয়তাবাদ ও সরকারকেন্দ্রিক নারীবাদ

রিয়া দে

কেন কন্যাশ্রী প্রকল্পে দৃষ্টিপাত করব?

যে কোনও সরকারি প্রকল্প বা কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করার সময় সেই সরকারি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সরকারের নীতি ও প্রশাসনে নিহিত দৃষ্টিভঙ্গিকে দেখার ও বোঝার চেষ্টা হয়। অর্থাৎ, সরকারের নির্দিষ্ট কোনও প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট মানুষকে চিহ্নিত, শ্রেণীভুক্ত, সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র তার নাগরিকদেরদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং 'জনগণ' রাষ্ট্রের 'নাগরিক' হিসাবে স্বীকৃত হয়। ফলে, যে কোন সরকারের প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সেই সরকারের চরিত্র সম্পর্কেই একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। সে দিক থেকে দেখলে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্প যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। কারণ, ছয় বছর আগে শুরু হওয়া এই প্রকল্প সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে তার বর্তমানের সুসংহত পূর্ণাঙ্গ চেহারা পেয়েছে। আগের তুলনায় এই প্রকল্পের বিস্তার এখন অনেক বেড়েছে, এখন অনেক বেশি সংখ্যায় ছাত্রীরা এই প্রকল্পের সুযোগ পাচ্ছে। পরিণতিতে বাদ পড়ে যাওয়ার সংখ্যাও কমেছে। যে হেতু এই প্রকল্পটি সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই চলছে, তাই এটি নাগরিক সমাজের কাছে, সংবাদপত্র, টেলিভিশনের মাধ্যমে, বিশেষত শহরাঞ্চলে, সবসময় চর্চার বিষয় হয়ে রয়েছে। একদিকে সরকারি প্রশাসনিক উদ্যোগ, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের চাহিদা, দুইয়ে মিলে প্রকল্পটি তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। আবার অন্যদিক থেকে এই প্রকল্প রূপায়ণের যাবতীয় প্রশাসনিক জটিলতা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের উৎসাহী অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে কন্যাশ্রী প্রকল্প একটি সামাজিক সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে উল্লেখ্য, এর নারীবাদী চরিত্রটি। সব মিলিয়ে বর্তমান প্রবন্ধে কন্যাশ্রীর মতো একটি কল্যাণকামী উদ্যোগ কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা দেশের সমসাময়িক কালের জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি এবং সরকারি কাজের নীতি ও কৌশলের অঙ্গ হয়ে ওঠে, তা বোঝার চেষ্টা হবে।

বিশদে আলোচনা শুরু করার আগে কন্যাশ্রী প্রকল্প কী, এবং কীভাবে তা রূপায়িত হয়, তা নিয়ে সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক। এর পরে দেখা হবে, সরকারি উদ্যোগ ও সাধারণ

মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই প্রকল্প বৃহত্তর সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিসরে কী ধরণের ঘাত প্রতিঘাত তৈরি করে, বিশেষ করে, সাধারণ মানুষ কী ভাবে সরকারের কাছে নিজেদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়। তারপর বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের দুটি স্কুলে কন্যাশ্রী প্রকল্প নিয়ে সমীক্ষার ফলাফল আলোচনা করা হবে। প্রবন্ধের শেষ ভাগে কন্যাশ্রীর মতো প্রকল্প কি করে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি ও সরকারের নীতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে ওঠে, সেটাই বোঝার চেষ্টা করা হবে।

কন্যাশ্রী প্রকল্পটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকারের একটি বিশেষ কর্মসূচি, যা মেয়েদের শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতায়ণের লক্ষ্যে রাজ্যের নারী ও সমাজকল্যাণ দফতরের অধীনে রূপায়ণ করা হয়। ২০১৩ সালে এই প্রকল্পের সূচনা। এই প্রকল্পে নাবালিকাদের বিয়ে করা থেকে নিরস্ত করা ও স্কুল-ছুট বন্ধ করার শর্তে ছাত্রীদের বার্ষিক ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আরও একটি লক্ষ্য, বিয়ের নামে নাবালিকাদের নারীপাচারের শিকার হওয়া ঠেকানো। গোড়ায় এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল বিশেষ করে আর্থিক থেকে পিছিয়ে পড়া মেয়েদের জন্য। অভাবের কারণে ও সামাজিক চাপে পড়ে এদের বেশিরভাগেরই অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থাতেই বিয়ে হয়ে যেত। গত বছর থেকে এই প্রকল্পের দরজা সব শ্রেণীর মেয়েদের জন্যই খুলে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই প্রকল্পটি তিনটি ভাগে বিভক্ত ঃ

১. K-১ এই পর্যায়ে ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী ছাত্রীদের বার্ষিক ১০০০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়, যতদিন তারা স্কুলে পড়াশোনা করবে। তবে শর্ত হল যে তারা ততদিন অবিবাহিতা থাকবে এবং স্কুলে একটা নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত হাজির থাকবে।

২. K-২ এই পর্যায়ে ছাত্রীরা ১৮ বছর বয়সে পৌঁছলেই তাদের সরকার থেকে এককালীন ২৫,০০০ টাকা দেওয়া হবে। তবে, শর্ত আগের মতোই তাদের অবিবাহিত থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে।

৩. K-৩ তৃতীয় পর্যায়ে ছাত্রীদের আর অবিবাহিত থাকার দরকার নেই। তারা যদি এতদিন কন্যাশ্রী প্রকল্পের K-২ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত থাকে, এবং কলেজে স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শেষ করে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়তে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তাহলে তারা সরকার থেকে প্রতি মাসে বৃত্তির জন্য স্বামী বিবেকানন্দ মেধা ও আর্থিক ক্ষমতার মাপকাঠিতে বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। সে জন্য তাদের স্নাতক পর্যায়ে গড়ে ন্যূনতম ৪৫ শতাংশ নম্বর পেতে হবে এবং রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি হয়ে থাকতে হবে। কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রী হলে তারা মাসে ২০০০ টাকা বৃত্তি পাবে, আর বিজ্ঞানের ছাত্রী হলে বৃত্তি ২৫০০ টাকা পাবে।

অর্থাৎ, কন্যাশ্রী প্রকল্পে মেয়েদের আর্থিক উৎসাহ দিয়ে নাবালিকা বয়সে বিয়ে থেকে নিরস্ত করে এবং পড়াশোনা চালিয়ে যেতে ও স্কুল-ছুটের সংখ্যায় হ্রাস ঘটিয়ে কার্যত মেয়েদের

ক্ষমতায়ণ ঘটায়। অবশ্য, কন্যাশ্রীর প্রভাবে সত্যি সত্যিই স্কুল-ছুটের সংখ্যা কমছে কি না, বা কমলে কতটা কমছে, তা নিয়ে বিভিন্ন সমীক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ পেয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের সাফল্য সমাজের জনবিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সর্বত্র সমহারে অভিষ্ট সিদ্ধ হচ্ছে কি না, বা না হলে কোথায় ব্যর্থ হচ্ছে, সে সবই খতিয়ে দেখা দরকার। পরের অংশে দেখা হবে, কন্যাশ্রী প্রকল্প নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কী ধরণের প্রচার করা হয়েছে, এবং কী ভাবে কন্যাশ্রী শুধু রাজ্য সরকারেরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হয়ে উঠেছে, তা নয়। একই সঙ্গে তা শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সাফল্য এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলনেরও প্রতীক হয়ে উঠেছে।

কন্যাশ্রী প্রকল্পঃ একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎসব ঃ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কন্যাশ্রী প্রকল্পের কথা ব্যাপক হারে প্রচার করে চলেছে। রাস্তায় রাস্তায় হোর্ডিং, বিলবোর্ড, দেওয়াল লিখন, শহরে রাস্তার মোড়ে কন্যাশ্রীর প্রতীকি মূর্তি তো রয়েছেই, তার সঙ্গে সংবাদপত্র, টিভি, রেডিও এবং অন্যান্য গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপনের লাগাতার প্রচার চলছে, এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং স্কুলের পাঠ্যবইয়ের মধ্যেও কন্যাশ্রী একটি চর্চার বিষয় হয়ে গেছে। এখন ১৪ আগস্ট প্রতি বছর রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কন্যাশ্রী দিবস পালন করা হচ্ছে। ওই দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে অন্য অতিথিদের উপস্থিতিতে কন্যাশ্রী মেয়েদের মধ্যে যারা পড়াশোনা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছে, তাদের পুরস্কৃত করেন। অন্যদিকে, জেলায় জেলায় ব্লকস্তরে বি ডিও-র নেতৃত্বে কন্যাশ্রী দিবস পালন হয়। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা, বিশেষ করে ছাত্রীরা নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। ২০১৯ সালের গোড়ায় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এ ছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় অনেক স্বশাসিত সংগঠন গড়ে উঠেছে। যেমন, 'কন্যাশ্রী সংঘ' বা কন্যাশ্রী কমিটি। এই সংঘের সদস্য মেয়েদের 'কন্যাশ্রী যোদ্ধা' বলে অভিহিত করা হয়। কন্যাশ্রী যোদ্ধারা নিজের নিজের এলাকায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কন্যাশ্রী প্রকল্পের উপযোগিতা সম্পর্কে এলাকার অধিবাসীদের সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করে থাকে। এই অনুষ্ঠানগুলি সংঘটিত করার কাজে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা এবং অশিক্ষক কর্মীরা সাহায্য করেন। এ ধরণের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য একটাই, অভিভাবকদের বুঝিয়ে তাঁদের মেয়েদের স্কুল থেকে মাঝপথে ছাড়িয়ে নিয়ে নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে দেওয়া থেকে বুঝিয়ে নিরস্ত করা। এরকম বেশ কিছু নজির রয়েছে যেখানে কন্যাশ্রী যোদ্ধারা হস্তক্ষেপ করে সাফল্যের সঙ্গে নাবালিকা ছাত্রীর বিয়ে আটকে দিতে পেরেছে, এবং প্রয়োজনে সেইসব ছাত্রীর পুর্বাসনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

কন্যাশ্রী প্রকল্পকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এক বিপুল সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ চলছে। এরই অঙ্গ হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কন্যাশ্রী শীর্ষক গান জনপ্রিয় শিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র গেয়েছেন, যা

বহুল প্রচারিত। পাশাপাশি, সোশ্যাল মিডিয়াতে সাধারণ মানুষই নিজেদের উদ্যোগে এই প্রকল্পের ইতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরে প্রচার করছে। কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুযোগ পেতে হলে যে সরকারি ফর্ম পূরণ করে জমা দেওয়া, এবং তা বছর শেষে পুনর্নবীকরণের জন্য আর একটি ফর্ম জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক, সমাজের দরিদ্র ও অনুন্নত শ্রেণীর মেয়েদের কাছে সেটা একটা সমস্যা বা কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ মানুষই উপযাচক হয়ে এই প্রকল্পের সুযোগ পেতে হলে সরকারি নিয়মকানুন যা যা রয়েছে, কী ভাবে তা মেনে ফর্ম ভর্তি করতে হবে, তা নিয়েও বিশদে জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে অজস্র লেখালেখি করছে। বাঁকুড়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে কন্যাশ্রী নিয়ে একটা বাউল গানের ভিডিও তাদের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার করছে। গোলোকবিহারী মাহাতোর গাওয়া ওই গানে বাবা-মায়ের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে তাঁরা যেন তাঁদের মেয়েদের পড়াশোনা মাঝপথে বন্ধ না করে দেন। মেয়ের বয়স ১৮ না হওয়া পর্যন্ত মেয়ের বিয়ে না দেন। এরকম বহু ভিডিও প্রচার হচ্ছে, সেইসঙ্গে ভেসে আসছে কন্যাশ্রীর উপকারিতা বা সমস্যার দিকগুলির উপর আলোকপাত করে হাজার হাজার মন্তব্য। অনেক মন্তব্যই বাবা-মায়েদের। তাঁরা লিখছেন, পরিবারের অন্য সদস্যরা লিখছেন, জানাচ্ছেন ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে তাঁদের কী কী সমস্যার পড়তে হচ্ছে, যেমন, কিছু 'প্রযুক্তিগত সমস্যা' যা কোনোভাবেই নির্মূল করা যাচ্ছে না, যার ফলে মেয়ে কন্যাশ্রীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় বি ডি ও অফিসেই (ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস) কন্যাশ্রীর যাবতীয় ফর্ম জমা ও পরীক্ষা করা হয়। অভিভাবকরা অনেকেই অভিযোগ করছেন, বি ডি ও অফিসে তাঁদের সমস্যা বোঝাতে গিয়ে তাঁরা সমস্যায় পড়ছেন। মোটামুটিভাবে বলা যায়, কন্যশ্রী প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে ১০০টি ভিডিওর মধ্যে ৩০টিতেই ফর্ম ভর্তি করার পথ বাতলাতে বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। এক একটি ভিডিও গড়ে ২৫০০ থেকে ৪৫০০০ পর্যন্ত মানুষ দেখেছেন। এমনকি কিছু ভিডিওতে এটাও বোঝানো হয়েছে যে কন্যাশ্রী নিয়ে বোর্ডের পরীক্ষায় প্রশ্ন এলে কীভাবে তার উত্তর লিখতে হবে। আরও মজার বিষয়, ২০১৯ ভোটের আগে এই কন্যাশ্রী বৃত্তি প্রাপকদের রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস দলের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করতে দেখা গিয়েছে। তারা দেওয়াল লিখনে কন্যাশ্রী প্রকল্পের 'লোগো' বা প্রতীকের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় প্রতীক এঁকে তৃণমূলের নির্বাচনী স্লোগান লিখেছে। আনন্দবাজার পত্রিকায় কন্যাশ্রী প্রকল্প এবং কন্যাশ্রী যোদ্ধাদের নিয়ে নিয়মিত খবর প্রকাশ করে চলেছে।

বিদ্যালয়ের পরিসর থেকে শুরু করে আশেপাশের এলাকা থেকে সমাজের বৃহত্তর পরিসরে (হোর্ডিং, দেওয়াল লিখন, কলকাতার রাস্তা জুড়ে কন্যাশ্রীর প্রতীকি মূর্তি) কন্যাশ্রী প্রকল্প শহর, আধা শহরে সাধারণ বাঙালি জীবনযাত্রার সাথে মিশে গেছে। খুঁটিয়ে ইউটিউব দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যায় কন্যাশ্রী প্রকল্পের কাজকর্ম কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে প্রভাব বিস্তার করেছে। স্থানীয় পরিসরে

ক্যুইজ প্রতিযোগিতা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক প্রতিযোগিতা এমনকি খেলাধুলো; স্থানীয় এলাকা ভিত্তিক কন্যাশ্রী দিবস পালন অনুষ্ঠান, একদিকে মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সব মিলিয়ে এ সবের মধ্যে দিয়ে সরকারি প্রশাসন ও তার জনপ্রিয় নেত্রীর সঙ্গে সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিসরের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। বিভিন্ন দিক বিচার করে এটা বলা যেতে পারে যে এই কন্যাশ্রী সাংবিধানিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই, মেয়েদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে একটি কল্যাণকর প্রকল্প। তার দৃশ্যতঃ সাংস্কৃতিক অবস্থান এবং বিপুল প্রচার থেকে এটাও বলা যায় যে এই প্রকল্প একই সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করারও একটা কৌশল।

কন্যাশ্রী প্রাপকদের নাম নথিভূক্তকরণের দায়িত্ব বিডিও অফিস এবং প্রতিটি স্কুলকে নোডাল এজেন্সি হিসাবে পালন করতে হয়। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের দুটি স্কুল (বীরভূম জেলার লাভপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং মুর্শিদাবাদ জেলার সতীতারা এন জি এন এস বিদ্যাপীঠ) এর কন্যাশ্রী প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে দেখার সুযোগ হয়েছিল। দুই জায়গাতেই স্কুলের তরফে শুধুমাত্র কন্যাশ্রী প্রকল্পের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একজন করে শিক্ষক ও করণিক নিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁরা ছাত্রীদের নাম এই প্রকল্পের আওতায় নথিভুক্ত করার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। কাজটা যথেষ্ট জটিল ও পরিশ্রমসাধ্য। কারণ, প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট সরকারি ফর্ম পূরণ করাটা গ্রামের গরিব ছাত্রীদের অভিভাবকদের (যাঁরা বেশিরভাগই নিরক্ষর) পক্ষে কঠিন। ফলে, শ'য়ে শ'য়ে ছাত্রীদের ফর্ম পূরণ করে দেওয়ার কাজটা স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদেরই করে দিতে হয়। তারপরে সেই সব ফর্ম বি ডি ও-র সার্ভারে তোলার কাজ রয়েছে। খুব কম সংখ্যক স্কুলেই ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। তারা স্কুল থেকেই বি ডি ও-র সার্ভারে তথ্য জমা দিতে পারে। বেশির ভাগ স্কুলকেই বি ডি ও অফিসে গিয়ে কাজটা সম্পূর্ণ করতে হয়। আরও কাজ রয়েছে। ছাত্রীদের যাবতীয় নথি পরীক্ষা করার সঙ্গেই এটা দেখতে হয় যে কন্যাশ্রীর প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির অত্যাবশকীয় শর্ত তারা পালন করছে কি না। অর্থাৎ, তারা যে অবিবাহিত, এই মর্মে তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটও দেখতে চাওয়া হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত ওই সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে। এই নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ছাত্রীদের সঙ্গে যাঁরা এই কাজটা করছেন, অর্থাৎ, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী সব ছাত্রীদের নাম প্রকল্পে নথিভুক্ত করার আবেদনপত্র ঠিকঠাক পূরণ করার পরে সমগ্র ব্যবস্থার জন্য যিনি নোডাল অফিসার বা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক স্কুলের সেই প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকাকে আবার সব দেখে নিতে হয়। এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে ছাত্রীদের সঙ্গে স্কুলের শিক্ষকদের একটা যোগাযোগের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সরকারের কাজের আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির কারণে যে কোনও উন্নয়নমুখী প্রকল্পের মতোই এখানেও প্রকল্পের উদ্দিষ্ট ছাত্রীদের মধ্যে শ্রেণীভাগ করে কারা সবচেয়ে দুর্বল অংশ তা চিহ্নিত করা

হয়ে যায়। কন্যাশ্রী প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরকারের মতে, যে কোনও পরিবারের একমাত্র কন্যা সন্তান থাকলে তাদের সবচেয়ে দুর্বল বলে মনে করা হচ্ছে। আর এই দুর্বলতার কারণে এই একমাত্র কন্যাসন্তানের নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে হয়ে যাওয়ার বা নারীপাচারকারীদের খপ্পরে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তা হলে কি একমাত্র কন্যাসন্তানকে কেন্দ্র করে সরকারের এই বাড়তি মনোযোগ আসলে ক্ষমতাসীন দলের তরফে শুধুই নারীসমাজকে রাজনৈতিক পরিসরে নিয়ে আসার, বিশেষ করে নিজেদের পক্ষে ভোট ব্যাঙ্ক নির্মাণের কৌশল মাত্র? নাকি. প্রকল্পের আওতায় ছাত্রীদের অর্থসাহায্য করার সুবাদে সমাজের আরও বড় অংশকে, অর্থাৎ শিশুকন্যা বা ছাত্রীসহ সমাজের নিচুতলার অনুন্নত অংশের মানুষদেরও সরকার ও সরকারে ক্ষমতাসীন দলের কাছে টেনে আনার উপায়? কারণ, মনে রাখতে হবে যে গরিব ঘরের ছাত্রীরা অনেকেই কন্যাশ্রী বৃত্তির টাকা দিয়ে পরিবারকে সংসার চালাতে সাহায্য করে থাকে। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের ওই দুই স্কুলে সমীক্ষা চালাতে গিয়ে সেখানকার কন্যাশ্রী-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। তাদের অনেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কথা হয়েছিল, আবার ছাত্রীরা দলবেঁধেও কথা বলেছে। কন্যাশ্রী প্রকল্পের কারণে ছাত্রীদের স্কুল-ছুট কতটা কমছে, সেটা দেখার চাইতেও বেশি আগ্রহ ছিল ছাত্রীরা কন্যাশ্রীর টাকা পেয়ে তা কীভাবে খরচ করে, তা জানার জন্য। ছাত্রীদের জাতপাত, আর্থিক শ্রেণীভিত্তি বা ধর্মীয় পরিচয়ের নিরিখের কারণে কি তাদের বৃত্তির টাকা খরচ বা সঞ্চয়ের কোনও নির্দিষ্ট ধাঁচ দেখা যায়? একই সঙ্গে প্রকল্পের নিয়মকানুন তৈরি থেকে শুরু করে যাবতীয় আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে নিহিত উদ্দেশ্যকেও বোঝার চেষ্টা ছিল।

এই প্রকল্প ও তার প্রক্রিয়াকে ঘিরে যে আখ্যান ও আলোচনার সূচনা হয়েছে, সেটাও যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। যেমন, মুসলমান ছাত্রীদের বিষয়টি। যে মুসলমান ছাত্রীরা কন্যাশ্রীর আওতায় এসেছে, তারা নিজেদের সম্পর্কে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে অনাগ্রহী। বরং, তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে কি না, বা কেউ কেউ গোপনে বিয়ে করে নিয়েও তা গোপন রেখে বৃত্তির টাকা নিয়ে চলেছে কি না, এ সব প্রশ্নের সম্মুখীন হলেই তাদের উদ্বেগ স্পষ্ট হয়ে যায়। হিন্দু নারীর মতো মুসলমান নারীর বিয়ে হলে তা যেহেতু আলাদা করে দেখে বোঝার উপায় নেই তাই এই প্রশ্ন ফিরে ফিরে আসে। মুর্শিদাবাদের সাতিতারা স্কুলের অধ্যক্ষ নিজে পুরুষ এবং মুসলমান। তিনি জোর গলায় দাবি করেন, কোনও মুসলমান ছাত্রী বিবাহিতা কি না তা তিনি এক নজর দেখেই বুঝতে পারেন। এবং সেরকম কিছু দেখলে তিনি নিজেই তাদের কন্যাশ্রী বৃত্তি বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে পারেন। তা সত্ত্বেও ক্লাসে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মুসলমান ছাত্রীদের সঙ্গে অন্যদের একটা চাপা রেষারেষি রয়েছে। অমুসলমান ছাত্রীদের অনেকেরই অভিযোগ, মুসলমান ছাত্রীদের অনেকেই বিয়ের কথা গোপন রেখে কন্যাশ্রীর টাকা নিয়ে চলেছে। তারা K ২-আওতায় এককালীন ২৫,০০০ টাকা নিয়ে বিয়ের খরচ মেটাচ্ছে। মুসলমান ছাত্রীরা অবশ্য তাদের সবাইকে একই ধাঁচের মধ্যে ফেলে দেখার প্রবণতার বিরোধী। তাদের বক্তব্য, তারা বছরে যে ১০০০ টাকা পায়,

তা তাদের পরিবারের ভেঙ্গে পড়া আর্থিক পরিস্থিতিতে কিছুটা হলেও কাজে লাগে। এটা দেখা দরকার, এই মুসলমান ছাত্রীদের মধ্যে কতজন স্কুলের গন্ডি পেরনোর পরে সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে করতে বাধ্য হয়, আর কতজন বেসরকারি নার্সিং শেখার স্কুলে ভর্তি হয়। আর ওই সব নার্সিং স্কুলে ভর্তি করাতে গিয়ে তাদের কতজনের বাবা মা লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার শিকার হয়!

কিন্তু সত্যিই কি এই একমাত্র কন্যাসন্তানের মাপকাঠিতে তাদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে? বর্তমান প্রাবন্ধিক যে দুটি স্কুলে সমীক্ষা চালিয়েছেন, সেখানে দেখা গিয়েছে, দু'জায়গাতেই স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে অন্যভাবে মোকাবিলা করছেন। প্রথমত, তাঁরা সব ছাত্রীকেই কন্যাশ্রীর প্রকল্পের আওতাভুক্ত করছেন। এ ব্যাপারে কে বিবাহিতা, কে অবিবাহিতা, তা দেখা হচ্ছে না। এমনকি তাদের স্কুলে নিয়মিত হাজিরা না থাকলেও কাউকে আটকাচ্ছেন না। স্কুলের অধ্যক্ষের বক্তব্য, তাঁর মতে, স্কুলের সব ছাত্রীকেই কন্যাশ্রীর অধীনে নিয়ে আসাটা জরুরি। যাতে ছাত্রীরা স্কুলছুট না হয়, এবং তারা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে উৎসাহ পায়। এর অন্যতম কারণ, একটি স্কুল প্রাণপণে স্কুল ছুটের হার কমানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, আর অন্য স্কুলটিতে কন্যাশ্রী প্রকল্প শুরু হওয়ার পরে গত পাঁচ বছরে ছাত্রীদের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। সে কারণেই দ্বিতীয় স্কুলটিও কন্যাশ্রীর জন্য নির্বিচারে সব ছাত্রীর নাম নথিভুক্ত করার এই প্রক্রিয়া আরও কঠোরভাবে পোষন করে চলেছে। যদিও এই দুই স্কুলই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত, তা হলেও দুই স্কুলের ছাত্রীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের মধ্যে যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। আর সে কারণেই কন্যাশ্রীর প্রভাব দুই স্কুলের ছাত্রীদের উপর যথেষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হয়েছে। এটাও দেখা গিয়েছে যে একটি স্কুলের ছাত্রীরা কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় সরকার থেকে তাদের কী কী সুবিধা পাওয়ার কথা, এবং তারা কতটা পেয়েছে, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। এ নিয়ে তারা ভালভাবেই আলোচনা করতেও পারে। স্কুলে ছাত্রীদের সংগঠন, ক্লাস মনিটর ও প্রিফেক্ট প্রভৃতি নিয়ে তাদের সংঘবদ্ধ করার যথাযথ কাঠামোও মজুত। ছাত্রীদের মধ্যে মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তদের অধিকাংশই তাদের কন্যাশ্রী বৃত্তির টাকা খরচ না করে ব্যাঙ্কে জমায়। কেউ কেউ জানিয়েছে, তারা বই কিনতে ওই টাকা খরচ করে। গরিব ছাত্রীরা ওই ১০০০ টাকা তাদের সংসারে দেয়। বিশেষ করে মুসলমান ছাত্রীরা এটা করে থাকে কারণ, তাদের বাড়ির ছেলেরা প্রায় সবাই কাজের সূত্রে মুম্বই, চেন্নাই বা উপসাগরীয় দেশগুলিতে চলে যায়। যদিও দুটি স্কুলের কর্তৃপক্ষই দাবি করেন যে কন্যাশ্রী প্রকল্পের কারণে স্কুলে ছাত্রীদের হাজিরা বেড়েছে, তা হলেও ছাত্রীদের পড়াশোনার মানের উন্নতি বা উচ্চশিক্ষার আকাঙ্খা সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে। এই ধরণের যে সব স্কুলের অবস্থান প্রত্যন্ত গ্রামে, যেখানে বেশির ভাগ ছাত্রীই সমাজের দরিদ্র ও অনুন্নত অংশ থেকে এসে থাকে, সেখানে কন্যাশ্রী তাদের স্কুলের পরে উচ্চ শিক্ষার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হচ্ছে। দেখা গিয়েছে, যে সব ছাত্রী স্কুলের পড়া শেষেই বিয়ে

করে ফেলছে না, তাদের বেশির ভাগই হয় নার্সিং শিখতে ভর্তি হচ্ছে, না হলে স্কুলে পড়াচ্ছে। অন্য স্কুলে শুধু ছাত্রীদের হাজিরা বেড়েছে তাই নয়, সেখান থেকে পাস করে অনেক ছাত্রীই কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়তে যাচ্ছে।

কন্যাশ্রী প্রকল্পের সাফল্যকে অবশ্যই অন্য কিছু প্রকল্পের কাজকর্মের সঙ্গে একত্রে মিলিয়ে দেখা দরকার। যেমন সবুজসাথী প্রকল্প, মিড ডে মিল প্রকল্প এবং রূপশ্রী প্রকল্প। সবুজসাথী প্রকল্পে ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া হয়। মিড ডে মিল প্রকল্পে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দুপুরের খাওয়া এবং রূপশ্রীতে প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের বিয়ের জন্য এককালীন ২৫,০০০ টাকা সরকার থেকে দেওয়া হয়। সমীক্ষা চলাকালীন বেশ কয়েকজন ছাত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তারা কন্যাশ্রী K-২ র আওতায় যে ২৫,০০০ টাকা পাবে, তা দিয়ে কী করবে? উত্তরে তারা জানিয়েছিল, ওই ২৫,০০০ টাকার সঙ্গে রূপশ্রীর ২৫,০০০ টাকা যোগ করে তারা নিজেদের বিয়ের খরচ মেটাবে। দুটি স্কুলের অধ্যক্ষেরই বক্তব্য, ২০১৮ সালে শুরু হওয়া রূপশ্রী প্রকল্প কার্যত কন্যাশ্রী প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দিচ্ছে। কারণ, কন্যাশ্রী করাই হয়েছিল মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে না করে উচ্চশিক্ষার জগতে পা রাখার জন্য উৎসাহিত করতে, সেই সঙ্গে নারীপাচারকারীদের ফাঁদে পা দেওয়া এড়াতে। যদিও কিছু ছাত্রী জানিয়েছে, তারা বিয়ে করার পরেও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, ফলে তারা, বিয়ে বা উচ্চশিক্ষা, এই দুইয়ের মধ্যে কোনও একটাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জায়গায় নেই। সেদিক থেকে দেখলে, কন্যাশ্রী K-৩ এই জরুরি চাহিদা পূরণ করছে। ছাত্রীরা বিবাহিতা, না অবিবাহিতা, সেই প্রশ্ন এখানে বিবেচ্য নয়। ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেই ন্যূনতম যোগ্যতামান থাকলে তারা কন্যাশ্রী বৃত্তি পাবে। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, এই প্রকল্প ঘিরে প্রচারের দরুণ মানুষ এখন অনেক সচেতন হয়েছে, তার প্রভাবে স্কুলে ছাত্রীদের হাজিরা বাড়ছে। তাঁদের মতে, ছাত্রীরা স্কুলে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত থাকলে যে ২৫,০০০ টাকা (K-২) দেওয়ার ব্যবস্থা, তা ছাত্রীদের নিয়মিত হাজিরার একটা কারণ। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে সমাজের দরিদ্র ও অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রীরা স্কুলের পড়া শেষে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সেভাবে নিতে পারছে। লাভপুর গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রীদের একটা বড় অংশই স্কুলের পরে বি এড পড়তে ভর্তি হয়, বা নার্সিং শিখতে অনেক টাকা খরচ করে বেসরকারি নার্সিং স্কুলে ভর্তি হয়। স্কুলের অধ্যক্ষার ব্যাখ্যা, এর কারণ উচ্চশিক্ষার কী কী ধরণের সুযোগ রয়েছে, তা থেকে কী ধরণের কাজের বা পেশার সুযোগ তৈরি হতে পারে, সে বিষয়ে তাদের কোনও ধারণাই গড়ে ওঠেনি। সব মিলিয়ে এটা বলা যায় যে কন্যাশ্রী প্রকল্প সব জায়গায় সমানভাবে কার্যকর হচ্ছে না, এবং মেয়েদেরও সর্বত্র সমানভাবে উপকার বা লাভ হচ্ছে না। লাভক্ষতির মধ্যে এই তারতম্যের জন্য অন্য আরও কিছু কারণকেও মাথায় রাখতে হবে। যেমন, কন্যাশ্রী প্রকল্প যে সর্বত্র সমান হারে কাজ

করছে না, সেটা কন্যাশ্রী সঙ্ঘের কাজেই ধরা পড়ে। সমাজের শ্রেণিবিন্যাস, জাতপাত এবং অঞ্চলের তারতম্যের সঙ্গেই কন্যাশ্রী সংঘের সক্রিয়তা বা তুলনামূলক নিষ্ক্রিয়তা প্রতিফলিত হয়। লাভপুর স্কুলের অধ্যক্ষা মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, মুর্শিদাবাদের মতো জেলায় মুসলমান ছাত্রীদের মধ্যে কন্যাশ্রী সঙ্ঘের সক্রিয় উপস্থিতির অন্যতম কারণ, সেখানে সমাজে মুসলমানদের সামাজিক ও আর্থিক প্রতিপত্তি যথেষ্ট। এটা অস্বীকার করা যায় না যে তাদের সামাজিক অবস্থানই কন্যাসন্তানের ক্ষমতায়ণের পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়ায়। কন্যাশ্রীর মতো প্রকল্প তাতে বাড়তি মাত্রা যোগ করে ক্ষমতায়ণের পথে এগিয়ে দেয়।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে কেন কন্যশ্রী প্রকল্পের সাফল্য কতটা পাওয়া গেল বা গেল না, তা নিয়ে এত মাথা ঘামানো হচ্ছে। বিশেষ করে যখন এই প্রকল্পের অভীষ্ট লক্ষ্য কী এবং তা কতটা পূরণ হচ্ছে, তা মেপে দেখার চেষ্টা হচ্ছে। একদিক থেকে দেখলে কোন প্রকল্প কার্যকরী এবং কোনটা নিছক জনপ্রিয়তাবাদ, তা বোঝার এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হতে পারে। কোনও প্রকল্পকে জনপ্রিয়তাবাদী বলে সনাক্ত করার একটা অর্থ এটা হতে পারে যে এর মাধ্যমে কিছু শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। লাকলাউ এটাকেই 'empty signifier' বলে অভিহিত করছেন। সে দিক থেকে দেখলে জনপ্রিয়তাবাদী প্রকল্প সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক হয়ে দাঁড়ায়। এমন একটা কিছু, যা কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা কম, বা সেরকম কোনও উদ্দেশ্যও এর মধ্যে নিহিত ছিল না। অর্থাৎ, ঘোষিত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাই হোক, প্রকৃত লক্ষ্য অন্য কিছু। যেমন, মোদি সরকারের 'বেটি বচাও, বেটা পঢ়াও' আন্দোলনের জন্য বরাদ্দ অর্থের ৫৬ শতাংশই সংবাদ মাধ্যম ও গণ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ করা হয়েছে। আর ২৫ শতাংশেরও কম অর্থ বন্টন করা হয়েছে রাজ্য বা জেলায় জেলায়। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী বরাদ্দের ১৯ শতাংশ অর্থ সরকার খরচই করেনি। এ ধরণের প্রকল্প রূপায়ণে সরকারি ব্যর্থতা সম্পর্কিত এই পরিসংখ্যান এবং তার নামমাত্র কার্যকারিতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে এটি নেহাৎই একটি জনপ্রিয়তাবাদী প্রকল্প, যাকে উপরোল্লিখিত অভিধা অনুযায়ী সনাক্ত করা যায়। যদিও কন্যাশ্রীর ক্ষেত্রে তার বরাদ্দ অর্থের বন্টন সংক্রান্ত তথ্য এবং দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ প্রকল্পের তথ্যের সঙ্গে দেওয়া নেই, কিন্তু তার কতটা ব্যর্থতা, কতটা সাফল্য, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ২০১৯ সালের ১৯ জানুয়ারি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ''সমস্যা সমাধানের জন্য শুধু সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়, বরং তার সঙ্গে সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার, এবং তা ঠিকঠাক পরিকল্পনা করে রূপায়ণ করতে হয়। কন্যাশ্রী প্রকল্পের ক্ষেত্রে মনে হয়, এই সদিচ্ছা ও তার সার্থক রূপায়ণের মধ্যে ফারাকটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, কন্যাশ্রীর আওতায় শর্তাধীনে বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশের মেয়েদের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে রেখে বিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা। অন্তত ৫৭ লক্ষ ছাত্রীকে তার আওতায় আনা গিয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা দিয়ে ছাত্রীদের

নারীপাচারকীদের কবলে পড়া কতটা ঠেকানো যাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।" ওই প্রতিবেদনে আরও প্রশ্ন তোলা হয় কন্যাশ্রী বৃত্তির টাকার পরিমাণ নিয়ে। বছরে ৭৫০ বা ১০০০ টাকা বৃত্তি মেয়েদের প্রয়োজনের পক্ষে কতটা কার্যকরী হতে পারে, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার সঙ্গেই মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, কন্যাশ্রী নিয়ে মাতামাতি সত্ত্বেও মেয়েদের স্বাধিকার, ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষার দিকটি জনসাধারণের কাছে তেমন করে তুলে ধরার কাজটি হয়নি। এসব কারণেই কন্যাশ্রী প্রকল্প যতটা কার্যকরী হতে পারত,তা হচ্ছে না। কোনও প্রকল্পে উদ্দিষ্ট মানুষজনকে (এক্ষেত্রে নারী ও শিশুকন্যা) সনাক্ত বা চিহ্নিত করার পরে তাদের নির্দিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধান করার চেষ্টার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বোঝা যায়, প্রকল্পটি জনপ্রিয়তাবাদী কি না। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত মতাদর্শগত দিকটির কথাও ভুললে চলবে না। অর্থাৎ, এটাও দেখতে হবে যে ওই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সামাজিক ন্যায়, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ক্ষমতায়ন ইত্যাদির বাস্তবায়ন ঘটছে কিনা। সেই সঙ্গে আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে আরও দেখতে হবে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নারীকেন্দ্রিক আদর্শগুলিকে এক সূত্রে গাঁথার কাজটা হচ্ছে কিনা।।

লাকলাউ (Laclau) অবশ্য মতাদর্শের আলোকে জনপ্রিয়তাবাদকে দেখতে নারাজ। তাঁর মতে, জনপ্রিয়তাবাদ কোনও একটি রাজনৈতিক মতাদর্শকে আঁকড়ে থাকে না। বরং, তা একইসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন এবং অনেকসময় পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক চিন্তাকে গ্রহণ করে একসূত্রে গাঁথে। অন্যদিকে, ভিন্নমতানুলম্বীরা জনপ্রিয়তাবাদী নেতাদের কথাবার্তার মধ্যে থাকা অস্পষ্টতা, নানা সময় নানা ধরণের কথা বলার প্রবণতা, তাদের রাজনীতির কলাকৌশলের বৈশিষ্ট্যের জন্য তাদের রাজনীতি-বিরোধী বলে খারিজ করতে আগ্রহী। এই জটিলতার আবর্ত থেকে লাকলাউ জনপ্রিয়তাবাদকে উদ্ধার করতে আগ্রহী। তাঁর মতে, এটাই জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির মূল কথা। এটাই 'জনগণ' নির্মাণ করার প্রক্রিয়া। ভিন্ন ভিন্ন, ও কখনও পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক মতবাদ ও দাবিকে এক সূত্রে গাঁথার পরে সেইসব দাবিকে একত্র করে কোনও রাজনৈতিক শক্তি বা ক্ষমতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার এই বৈশিষ্ট্যই জনপ্রিয়তাবাদকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। অন্যদিক থেকে দেখলে, জনপ্রিয়তাবাদকে যতটা তার আঙ্গিকের মধ্যে দেখা ও বোঝা যায়, তেমনটা তার বিষয়বস্তুর মধ্যে নয়। জনপ্রিয়তাবাদী চিন্তা বা রাজনীতি সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করে দিতে চায়, যার একদিকে থাকে 'জনগণ', অন্যদিকে, লাকলাউ এর ভাষায়, আধিপত্যকামী মতাদর্শ (dominant ideology)। লাকলাউ অবশ্য এই আধিপত্যকামী মতাদর্শকে বোঝাতে গিয়ে কখনও 'dominant bloc', কখনও 'the institutional system' আবার কখনও 'institutionalised other' ও কখনও শুধুই 'power' কথাটি ব্যবহার করেছেন। ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দাবিগুলি যখন কোনও জনপ্রিয়তাবাদী আন্দোলনের অঙ্গ হয়ে ওঠে, তখন তারা তাদের ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে একটা সার্বিক সংহত যৌথ চরিত্র গ্রহণ করে। এটা শুধুই কোনও আধিপত্যবাদী ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ বিরোধিতার

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হয় না। ওই ছড়িয়ে থাকা দাবি (বা প্রতিশ্রুতিগুলি) সমূহ একসূত্রে গাঁথার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সমষ্টির বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। লাকলাউ এটাকেই 'empty signifier' বলে অভিহিত করেছেন। লাকলাউ এর দৃষ্টিতে দেখলে কন্যাশ্রী প্রকল্প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির 'empty signifier' হিসাবে মূর্ত হচ্ছে।

ফলে, এটা দাবি করা যেতেই পারে যে একটি জনপ্রিয়তাবাদী প্রকল্প হিসাবে কন্যাশ্রীকে বুঝতে হলে তার বিষয়বস্তু এবং কী ভাবে তা সরকারি প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে কাজ করে, সে সবে দৃষ্টিপাত করে লাভ নেই। একে বুঝতে হলে নজর ফেরাতে হবে অন্যত্র, সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিসরে তার দৃশ্যমানতায়, কন্যাশ্রীকে বুঝতে হবে জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসাবে। তাই, কন্যাশ্রীকে একটি জনপ্রিয়তাবাদী প্রকল্প হিসাবে ভালো করে বুঝতে হলে একে বৃহত্তর রাজনৈতিক নীতি ও কৌশলের অঙ্গ হিসাবেই দেখা দরকার। একে দেখা দরকার সমাজে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলের নাগরিক সমাজে এই প্রকল্পের প্রবল দৃশ্যমান উপস্থিতির মধ্যে, সংবাদমাধ্যম ও গণমাধ্যমে যা ক্রমশই জনগণের একটা ধারণা গড়ার চেষ্টার মধ্যে প্রতিফলিত, এবং আরও বেশি করে ধরা পড়ে এই প্রকল্পকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তির সঙ্গে সমার্থক করে তোলার চেষ্টায়, যার মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকর্ষণীয় নেতৃত্বকে একই সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও রয়েছে। কন্যাশ্রী প্রকল্পের মধ্য দিয়ে এ ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকারের ভাবমূর্তি নির্মাণ এবং মানুষের কাছে তুলে ধরার প্রচেষ্টায় কন্যাশিশু হয়ে ওঠে সরকারি প্রকল্পে ক্ষমতায়নের উদ্দিষ্ট মানুষ। তারা যে ধীরে ধীরে এই রাজনীতির পরিমন্ডলেও প্রবেশ করে ফেলছে, সে কথা কন্যাশ্রীর বৃত্তি পাওয়া মেয়েদের সাক্ষাৎকার থেকে বেরিয়ে আসে। মমতা শুধুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নন, সরকারে থেকে কন্যাশ্রীর মতো প্রকল্প চালু করেন, এটাই তাঁর পরিচয় নয়। তিনি একই সঙ্গে রাজ্যবাসী, বিশেষ করে কন্যাশ্রী মেয়েদের মায়ের ভূমিকাতেই অবতীর্ণ। সরকারি প্রকল্প কন্যাশ্রী এ ভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকারের এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিচয় হয়ে ওঠে।

অনুবাদক ঃ শুভদীপ ঘোষ

Reference

Laclau, Ernesto. New reflections on the revolutions of our time. Verso. 1990

লেখক পরিচিতি ঃ

রণবীর সমাদ্দার
অধ্যাপক, ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ

অমিত প্রকাশ
অধ্যাপক, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লি

মইদুল ইসলাম
অধ্যাপক, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস্, কলকাতা

মনীশ ঝা
অধ্যাপক, টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস, মুম্বই

সুমনা দাশগুপ্ত
সিনিয়র ভিজিটিং ফেলো, পার্টিসিপেটারি রিসার্চ ইন এশিয়া, দিল্লি

রজত রায়
সাংবাদিক এবং গবেষক, ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ

কপিল তামাং
গবেষক ছাত্র, হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়

শিবাজীপ্রতিম বসু
অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর

রিয়া দে
রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ

Calcutta Research Group

ISBN : 9788177680805